আল্লাহর হক
মানুষের হক
জাবেদ মুহাম্মাদ

আল্লাহর হক
মানুষের হক

জাবেদ মুহাম্মাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব		লেখকের
প্রকাশকাল		রমাদান, ১৪৩৬ আষাঢ়, ১৪২২ জুলাই, ২০১৫
প্রচ্ছদ		জাহাঙ্গীর আলম
মুদ্রণ		আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
বিনিময়	:	দুইশত টাকা মাত্র

Allahr Haq Manusher Haq Written by Jabed Muhammad & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 1st Edition July 2015. Price Taka 2000.00 only.

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে "আল্লাহর হক মানুষের হক" শীর্ষক বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

তরুণ লেখক জাবেদ মুহাম্মাদ মানব জীবনের ক্ষণে ক্ষণে পরস্পরের হক আদায়ে যে অবহেলা বিরাজমান তা অত্যন্ত যৌক্তিক উপায়ে এবং যথাসম্ভব দলীলের ভিত্তিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে তিনি তার আলোচনায় শামিল করে তাদের পারস্পরিক অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তার এই শ্রমকে সার্থক করুন।

দল, মত ও শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সকল মানবগোষ্ঠী এই বই পাঠে নিজেদের পারস্পরিক অধিকার আদায়ে তৎপর হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বইটির কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে তা জানাবার জন্য সম্মানিত পাঠকদেরকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ড. মোহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

ভূমিকা

পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই চলছে। কিন্তু তবু দিনের পর দিন মানবাধিকার হরণ হচ্ছে। তাই তা সংরক্ষণ বা পুনরায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হয়েছেন পৃথিবীর বুকে আসা সকল নবী-রাসূল। এমনিভাবে মানবতা যখন চরম বিপর্যস্ত, মানুষের মনুষ্যত্ববোধ বলতে যখন কোন কিছু ছিল না, পশুর পশুত্ববোধকে রীতিমত হার মানিয়ে মানুষ যখন পৃথিবীর মালিক ও স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হকের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নিজেরাই স্রষ্টা সমতুল্য ক্ষমতা ও শক্তি দাবি করছিল, তখন পৃথিবীর বুকে আগমন ঘটে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর।

তিনি এসে জমিন থেকে সকল প্রকার জাহেলিয়াত উৎখাত করে জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েমের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানবতার হক প্রতিষ্ঠা করলেন। মানুষ পেল তার মূল্যায়ন ও সার্বিক অধিকার। চূড়ান্ত অধিকার ফিরে পেল জালিমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মজলুম মানুষেরা। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক বা অধিকারের কথা। সেই সাথে মানুষকে 'সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ' ঘোষণা করে অন্যান্য সকল প্রাণী মানুষের খেদমতে নিয়োজিত বলে একে অপরের হক প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জন্য তিনি দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে গেলেন। এক. আল-কুরআনুল কারীম ও দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত তথা জীবন ও কর্ম। ঘোষণা করে দিলেন এ দু'টি জিনিস যারা আঁকড়ে ধরবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না, দুনিয়ার জিন্দেগীতে তারা অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। বস্তুতঃ যত দিন বিশ্ববাসী এ দু'টি উপকরণ হাতে নিয়ে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করেছে ততদিন মানুষের মাঝে মানবাধিকার নিয়ে কোন কথা বলা প্রয়োজন হয়নি। অন্যকথায় কোথাও মানবাধিকার হরণ হয়নি। সেই সময়ের বাস্তবতা সামনে রেখে আজও পৃথিবীর কোন জাতির এরূপ বলার সুযোগ নেই যে, সে সময়ে সকল সৃষ্টির হক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

কিন্তু অকস্মাৎ কী কালো অন্ধকার! সময়ের ব্যবধানে যেই মানুষ আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেই চলছে চতুর্দিকে অধিকার হরণের প্রতিযোগিতা। আর এ হক হরণকে ঠেকাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমগ্র বিশ্বে বহু সংগঠন বা সংস্থা; নিয়োজিত হয়েছে পুলিশ, আর্মি, নেভী, বিমান, র‍্যাব, যৌথ বাহিনীসহ আনসার, বিডিআর হিসেবে লক্ষ-লক্ষ অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত কর্মী।

এসব মানবাধিকার সংগঠন ও বিভিন্ন বাহিনীতে নিয়োজিত লক্ষ-লক্ষ কর্মী দ্বারা মানুষের অধিকার কতটুকু প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আর ভবিষ্যতে কতটুকু পাবে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, এটা কর্তৃপক্ষ বা এর সাথে যারা জড়িত তারাই জানেন। তবে একটি কথা অপ্রিয় হলেও সত্য, স্ব-স্ব দেশের জনগণের বহু কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয়ে একের দ্বারা

অন্যের অধিকার হরণ ঠেকাতে যাদের নিয়োজিত করা হয়েছে তারাও অনেক ক্ষেত্রে আজ বিতর্কিত, অধিকার হরণের দায়ে অভিযুক্ত। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র বিশ্বের সকল কিছুর মালিক, তিনি মানুষের কাছে 'ইবাদাত আর সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাস তথা মানবতার কল্যাণ ছাড়া কিছুই চান না। সুতরাং আল্লাহর দেয়া নীতিই হলো সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণকর নীতি। যে নীতির অধীনে সকল সৃষ্ট জীব তার অধিকার পেতে পারে। পক্ষান্তরে মানবতার গড়া যে নীতি তাও নিশ্চয় তাদের কল্যাণে গড়া নীতি অর্থাৎ তাদের স্বার্থ বিরোধী কোন নীতিতো তারা গ্রহণ করবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল না যদি সকল সমস্যা মহান স্রষ্টার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ফায়সালা করা হত। কিন্তু তা না করে মানব রচিত মতবাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষিত নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নিজেদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে যে মানবাধিকার সংগঠন ও ক্ষমতাসীন সরকারের মদদে পরিচালিত বাহিনী গড়ে উঠে তা মানবের হক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কতটুকু তা বোধ হয় আজ এ সংগঠনের ছড়াছড়ি আর বিভিন্ন বাহিনী গঠন ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিই মূল উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়।

এত মানবাধিকার সংগঠন ও অধিকার সংরক্ষণে নানা আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বাহিনীর লক্ষ-লক্ষ অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যখন মানুষের কান্নায় আকাশ-বাতাস প্রকিম্পত, অসহায় নারী-পুরুষ, শিশু মৃত্যুর কোলে পতিত, নারী-পুরুষ অন্যদের খেলার বস্তুতে পরিণত এমনকি সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিও যখন তার বিরোধিতা করছে তখন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মূলত এ সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে ভুক্তভোগী মাত্রই প্রশ্ন করা অবান্তর নয়। কাজেই এ অবস্থা থেকে যদি মুক্তি পেতে হয় তাহলে মানুষকে প্রথমেই তার আপন অবস্থান অর্থাৎ অতীতে কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আছি, ভবিষ্যতে কোথায় যাব এবং সেখানে আদৌ জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে কিনা এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে হবে। আর এ বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে হলে সাধারণ ইতিহাস বা নোবেলবিদদের লেখা নোবেল গ্রন্থ নয়; বিশ্ব মানবতাকে ফিরে আসতে হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান, মানব জাতির পরিচালনার মূল সংবিধান আল-কুরআনুল কারীম এর দিকে, চরিত্র গঠন করতে হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্রের আদলে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার স্রষ্টাকে চিনবে-মানবে, স্রষ্টার হক আদায় করবে, স্রষ্টার বিধান মেনে চলবে।

অন্যথায় মানুষ স্রষ্টাকে ভুলে, স্রষ্টার হক বা অধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে স্রষ্টার সৃষ্টির কাছ থেকে সৃষ্টির হক আদায় করতে যতই চেষ্টা করুক না কেন তা অরণ্যে রোদন বা বৃথা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই হবে না, হতে পারেও না। আর তখন এ কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না; পৃথিবীর বুকে ধর্ম, বর্ণ, মত-পথ নির্বিশেষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামই দিতে পারে।

বইটিতে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার সাথে কেউ-কেউ অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন ও বিষয়

পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন মতও পোষণ করতে পারেন ; কেননা আমরা জানি, একমাত্র ওহীলব্ধ জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞানই শতভাগ নির্ভুল নয়। কাজেই পাঠক ও গবেষকদের কোথাও কোন আলোচনায় ভিন্ন মত থাকলে তা অনুগ্রহপূর্বক জানালে আগামী সংস্করণে বইটিতে সংযুক্ত করে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হবে।

হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ বহুল আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু এ বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের ঘাটতির ফলেই মানব সমাজে আজ প্রচলিত হয়েছে "নিজে বাঁচলে বাপের নাম, আপন চরকায় তেল দাও" এমন সব মানবতা বিরোধী কথাবার্তা– যা মূলতঃ মানুষের মনুষ্যত্ববোধকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সেই সাথে কেউ সুউচ্চ অট্টালিকা আর সুরম্য প্রাসাদ গড়ছে কেউবা তারই পাশে বস্তি গড়ছে। কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ছে কেউবা না খেয়ে মরছে, কেউবা দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড় ভাঙা কঠোর পরিশ্রম করে যা উপার্জন করছে তা সুদের জালে আটকিয়ে কেড়ে নিচ্ছে। অবশ্য এসব কিছু হওয়ার কারণ একটিই মানুষকে পরিচালনার গাইড লাইনস্বরূপ যে আল কোরআন ও আল হাদীস দেয়া হয়েছে তা থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছে। এতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের কী করা উচিত আর কোন্‌টি করা অনুচিত তা যেন মানুষ আজ ভুলেই বসেছে। আর তাই মানুষকে মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের ভিত্তিতে রচিত এ বইটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বইটি রচনায় যারা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে, আমার কলমকে করেছে শাণিত ও গতিশীল তাদের সকলের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দু'আ করছি।

বিশেষ করে এ বইটি দীর্ঘ দু'বছর ধরে সম্পাদনা করে যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি হলেন অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন এবং এ বইয়ের পাঠকদের পক্ষ থেকে আগত সাওয়াব কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর 'আমলনামায় সংযুক্ত করে তাঁকে জান্নাতের নি'আমাত বৃদ্ধি করে দিন।

বইটিতে আমাদের অনিচ্ছাকৃত যেসব ভুল-ত্রুটি থেকে যাবে তা কারো নজর পড়লে অবশ্যই আমাদেরকে অবহিত করবেন বলে আশা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

জাবেদ মুহাম্মাদ
মিরপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
২০১৫ইং

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হক বা অধিকার

"হক" (حق) আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ অংশ, প্রাপ্য, বিশ্বাস, মিথ্যার বিপরীত, প্রকাশ পাওয়া, অধিকার ইত্যাদি। আর পরিভাষায় "হক" বলা হয় অধিকারকে।

আরবি অভিধান ও আল-কুরআনুল কারীমে এ "হক" (حق) শব্দের দু'টো অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। এক. সত্য-সঠিক-নির্ভুল, অভ্রান্ত, ইনসাফ, ন্যায় ও প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ বিষয়। দুই. অধিকার বা পাওনা।

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অভিধানে "হক" শব্দের অর্থ করা হয়েছে ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য স্বত্ব দাবি, প্রকৃত সত্য, যথার্থ ও সংগত ইত্যাদি। এখানে হক বা ন্যায্য অধিকার বলতে দু'টি বিশেষ দিককে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক. স্বত্ব যা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য। দুই. যা অন্যের উপর ধার্য বা অন্য কারো নিকট পাওনা বুঝায়।

মানুষ সামাজিক জীব। তার জাতিগত প্রকৃতিই তাকে স্বজাতির সাথে মিলে মিশে একত্রে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য ব্যক্তির সেবা, পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য ও আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী, শুধু নিজের লালন-পালন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনেই নয় বরং নিজের প্রকৃতিগত যোগ্যতার লালন ও ক্রমবিকাশ এবং তার বাস্তব প্রকাশের জন্যও সে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসে বাধ্য। এই সামাজিক জীবন ব্যক্তির সাথে তার চারপাশে সম্পর্ক ও বন্ধনের একটি প্রশস্ত ও দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি করে। তাই ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে প্রতিবেশী, পাড়া-মহল্লা, শহর-বন্দর, দেশ এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবগোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পর্কের এ শৃঙ্খল যেন ছোট বড় সকল পরিসরে এক অপরের হকের ব্যাপারে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে।

উসূলে ফিকহবিদদের মতে "হক" দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

এক. "হক"-এর প্রথম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর 'হুকুম' বা নির্দেশ। আল্লাহ কর্তৃক মানুষের প্রতি নির্দেশসমূহকে হক বলে।

ফখরুল ইসলাম আল বাযদাবী বলেছেন, আল্লাহর এ নির্দেশসমূহ চার প্রকার। ০১. শুধু আল্লাহ পাকের হক, ০২. শুধু মানুষের হক, ০৩. যার মধ্যে আল্লাহর ও

মানুষের হক যৌথভাবে শামিল কিন্তু আল্লাহর হকের প্রাধান্য থাকে, ০৪. যার মধ্যে উভয়ের হক বিদ্যমান তবে মানুষের হকের প্রাধান্য থাকে।

আলাউদ্দীন বুখারী বলেছেন, "হক" বলতে এমন বিষয়কে বুঝায়, যার অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন বলা হয়, যাদুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, অমুক ব্যক্তির যিম্মায় অমুকের হক প্রতিষ্ঠিত হয় ইত্যাদি। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহর হক সমগ্র পৃথিবীর উপকারের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। আর বান্দার হক, ব্যক্তি বিশেষের উপকারের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন বান্দার সম্পদ অপরের জন্য অন্যায় দখল হারাম হওয়া, এটা ব্যক্তি বিশেষের উপকারের জন্য।

দুই. "হক"-এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ফে'ল বা কাজ অর্থাৎ হক বলতে কাজকে বুঝায়, শুধু নিষেধ বা নির্দেশকে নয়।

তাফতাযানী বলেছেন, "হক"-এর অর্থ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের প্রতি যে সকল নির্দেশ প্রদান করেছেন সে অনুযায়ী কাজ করা।

অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, "হক" বলতে সাধারণত মানুষের অধিকারকে বুঝায়। এই অধিকার মাল-সম্পদ অথবা মাল-সম্পদ ছাড়াও হতে পারে। (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, অধ্যায় : ৫১ অধিকারসমূহ, ধারা-১২৬৩, তৃতীয় ভাগ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০১, ই.ফা)

প্রকৃতপক্ষে হক কথাটি একের সাথে অপরের সংশ্লিষ্ট বিষয়। ফলে স্রষ্টা হিসেবে মানুষের কাছে মহান আল্লাহর যে হক রয়েছে তেমনি মহান আল্লাহ তা'আলার কাছেও মানুষের হক রয়েছে। মানুষের কাছে মহান আল্লাহর হক হলো, মানুষ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দাসত্ব করবে, আল্লাহরই হুকুম বা আদেশ মেনে চলে পৃথিবী পৃষ্ঠে বিচরণ করবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে মানুষের যে হক রয়েছে তা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই ধার্য করে দিয়েছেন।

মানুষের কাছেও রয়েছে মানুষের হক। মানুষ সামাজিক জীব হওয়ার সুবাধে মেধা ও যোগ্যতার ভিন্নতার কারণে এক পেশাজীবি মানুষের কাছে অন্য পেশাজীবি মানুষের রয়েছে হক। এভাবে পারস্পরিক হকের এ প্রাপ্যতা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর দাবি কোনভাবেই মানুষ অগ্রাহ্য করতে পারে না।

এ জন্যেই হক বা অধিকারের সাথে কর্তব্য শব্দটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মূলতঃ

একজনের যা হক বা অধিকার অন্যজনের জন্য তা কর্তব্য। আরেকটু ব্যাখ্যা করে এভাবে বলা যায়, একজনের যা পাওনা অন্যজনের জন্য তা দেনা। আর দেনা মানেই দেয়া– যা কর্তব্য বলেই স্বীকৃত। এভাবে মানুষ স্বত্ব তথা অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধনে বন্দী। ফলে এককভাবে কেউ কারো জন্য শুধু করেই যাবে আর সে শুধু ভোগ করবে কিন্তু কিছু করবে না– এমনটি হতে পারে না। আর যেখানে হবে সেখানে বুঝতে হবে সরাসরি এটি অনৈতিকতা বা স্বেচ্ছাচারিতা বা দুর্নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি আল্লাহর কাছে অপরাধ বলেই গণ্য।

হক-এর শ্রেণি বিভাগ

ইসলামী শারী'আয় হক বা অধিকারকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন : হক প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত।

এক. বাধ্যতামূলক (লাযিম) হক। এ হক বলতে এমন হককে বুঝায় যা শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত।

দুই. হক জায়েয বা যে হক বাধ্যতামূলক নয়। যেমন শারী'আত কর্তৃক ধার্যকৃত কোন মুবাহ বা মুস্তাহাব কাজ, যা পালন করলে নেকী পাওয়া যায় কিন্তু পালন না করলে কোন গুনাহ হয় না অর্থাৎ যা পালন করা বাধ্যতামূলক নয়, তাকে হক জায়েয বলে।

আবার উপকার ও বিশেষ উপকার হিসেবে হক চার শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা :

এক. আল্লাহর হক। আল্লাহর হক যা সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক উপকার রাখে এবং যে উপকারের সাথে কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পৃক্ত নয়, বরং সমগ্র মানুষ সম্পৃক্ত। যেমন বাইতুল্লাহর হুরমাত সমগ্র বিশ্বের জন্য অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের কেবলা হিসেবে তাদের নামায আদায়ের জন্য এবং যেনা বা ব্যভিচার-এর হারামের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিহিত।

দুই. মানুষের হক। যেমন : দিয়াতের হক, ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্ধারিত।

তিন. আল্লাহর হক ও মানুষের হক, তবে আল্লাহর হক প্রাধান্য। যেমন হদ্দে কাযাফ এ আল্লাহর হক রয়েছে এবং মানুষের হকও রয়েছে। তবে কাযাফ এর ক্ষেত্রে মিথ্যা অপবাদদাতাকে শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর হক এবং এর গুরুত্ব এজন্য যে, এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। এটি আল্লাহর হক হওয়ার কারণে কেউ চাইলেও শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না এবং কেউ ইচ্ছা করলে এটি ক্ষমাও করতে পারবে না। কারণ এখানে আল্লাহর হকের প্রাধান্য রয়েছে।

চার. আল্লাহর হক এবং মানুষের হক, তবে মানুষের হক অগ্রগণ্য। যেমন হত্যাকারী হতে কিসাস গ্রহণ করা, এখানে যদিও আল্লাহর হক রয়েছে তবে মানুষের হক অগ্রগণ্য। কেননা হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার অবৈধভাবে হরণ করেছে। এখানে মানুষের হক এজন্য প্রাধান্য পেয়েছে যে, যেহেতু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ হত্যার বিচার চাইতে পারে, আবার ক্ষমাও প্রদর্শন করতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে মানুষের হক-এর প্রাধান্য বিদ্যমান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন

আল্লাহ পবিত্রতম নাম। তিনি স্ব-অস্তিত্বে অস্তিত্ববান বিরাজমান। তিনি সকল গুণের আধার। তিনিই আসমান ও জমিন এবং এতদুভয় এবং এর মধ্যকার বস্তুর সবকিছুর রব। তিনিই মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, আশা-ভরসা, 'ইবাদাত-বন্দেগী, জীবন-মৃত্যু ও হাসি-কান্নার কেন্দ্রবিন্দু। এক কথায় দৃশ্য-অদৃশ্য যত কিছুই এই সৌর জগতে রয়েছে সবকিছুরই স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। এ কথার স্বীকৃতি, মনে-প্রাণে বিশ্বাস, কর্ম ও চিন্তা-চেতনায় তার সফল বাস্তবায়নই হলো সৃষ্টির কাছে তথা মানুষের কাছে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক।

আল্লাহর সত্তা ও অস্তিত্বে বিশ্বাস

পৃথিবীর বুকে যে কোন কিছু ঘটা, যে কোন কাজ করতে চেষ্টা করা এমনকি সকল কিছুর সৃষ্টি তত্ত্বই স্রষ্টার সত্তা ও অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। ফলে আল্লাহতে বিশ্বাস যেমন স্বাভাবিক তেমনি তাঁর সত্তার হক আদায়ও আবশ্যিক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَه وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَه مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম থেকে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।

পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং এতে রূহ (আত্মা) ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট থেকে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই শুকরিয়া প্রকাশ কর।" (সূরা আস-সাজদা, ৩২ : ০৬-০৯)

আসলে সময়ের পরিক্রমায় সর্বকালের প্রায় সকল মানুষই কোন না কোনোভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং আছে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমকেই পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও প্রত্যয় সহকারে আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক বা অধিকার। তাছাড়া ক্ষমতা ও একত্ববাদে সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে হবে। মানুষের বাস্তব কর্মে ঘটাতে হবে এগুলোর প্রতিফলন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ. فَالِقُ الاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ. وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِه نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِه اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِه ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"আল্লাহ বীজ ও দানা দীর্ণকারী। তিনিই জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং তিনিই মৃতকে বের করে আনেন জীবিত হতে। এসব কাজের আসল কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। তাহলে, তোমরা ভ্রান্ত পথে কোথায় যাচ্ছো? তিনিই রাতের আবরণ দীর্ণ করে রঙীন প্রভাতের উন্মেষ ঘটান। তিনিই রাতকে আরামদায়ক বানিয়ে দিয়েছেন। চাঁদ ও সূর্যের উদয় অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মূলতঃ এসবই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ। তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজিকে জলে-স্থলে গভীর অন্ধকারে পথ জানার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্য করো, আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। তিনিই ঐ সত্তা, যিনি একটি মাত্র আত্মা হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে (দুনিয়ায় কিছুদিন) থাকার ব্যবস্থা ও (পরে কবরে) সঁপে দেয়ার বিধান। এই নিদর্শনসমূহ আমি পরিষ্কার করে বর্ণনা করলাম, তাদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন যার সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ গজিয়ে দিয়েছেন

এবং এর দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। তারপর এটা হতে বিভিন্ন শস্য দানা বের করেছেন। খেজুরের মোচা থেকে থোকা থোকা ফল বানিয়েছেন, যা নাকি ভারের চাপে নুইয়ে পড়ছে। আর আঙ্গুর, যয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ফলসমূহ পরস্পরের সদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। এ গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে তখন এদের ফল বের হওয়া এবং পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখো। এসব কিছুতে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিহিত রয়েছে তাদের জন্যে, যারা ঈমান আনবে।" (সূরা আল-আন'আম, ০৬ : ৯৫-৯৯)

যদিও বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের যুগেও এক শ্রেণির উচ্চ শিক্ষিত মানুষ যৌগিক ও মৌলিক পদার্থের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করতে করতে জীবন সায়াহ্নে বস্তুবাদী বা জড় বস্তুর কাছে মাথানত করছে আর বলছে, আল্লাহর আবার হক কী, আল্লাহ বলতে কিছু আছে নাকি? আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহর দেয়া সবকিছু ভোগ করে শুকরিয়ায় মাথানত করে তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পথ চলতে বাধাগ্রস্ত করে, অপবাদ আর অপকৌশলের জালে ঘিরে রাখতে চায়। পৃথিবীতে এই শ্রেণির লোকগুলোই হলো সবচেয়ে হতভাগা ও অজ্ঞ। এদের আকার-আকৃতি মানুষের মত হলেও মহান আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পশুর থেকে নিকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

"এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু সংখ্যক জিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তঃকরণ রয়েছে কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-গবেষণা করে না। তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ শক্তি রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তা থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন।" (সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ১৭৯)

যারা এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে, কিংবা শুধু জন্ম ও মৃত্যুকে মেনে নিয়ে মাঝের জীবনে সবকিছু ভোগ করে আবার নিমকহারামী করে, মেধা ও যোগ্যতার বড়াই করে; মেধা ও যোগ্যতার ভারে স্রষ্টাকে ভুলে থাকে

অথচ একটু স্মৃতিভ্রম হলে যে কেউ তাকে বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন করবে না একথা তারা মনে রাখে না- তারাই এ সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এ জন্যেই মহান স্রষ্টা তাদেরকে পশুর মত বলেছেন।

অন্যদিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সম্পর্কে গাফেল লোকজনকে পশুর চেয়েও গাফেল বলেছেন এ জন্যে যে, দুনিয়ার অঙ্গনে এক শ্রেণির পশুকেও আমরা দেখি তার মনিবের পরিচয় ও মনিবের সাথে আচার-আচরণ সম্পর্কে অবগত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেকেই বাড়িতে কুকুর প্রতিপালন করে থাকেন। বিভিন্ন দেশের সরকারেরও কুকুর বাহিনী রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রের সন্ধানসহ অপরাধীকে সনাক্ত করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বাহিনীকে সহায়তা করে থাকে। বাড়ির কুকুর বাড়িতে পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। গভীর রাতে তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ করে সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। নিকষ কালো অন্ধকারে বাড়ির মনিব বাড়িতে আসার সময় কুকুর তার ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে অনুভব করতে পারে। সে ছুটে গিয়ে তার মনিবকে অভ্যর্থনা জানায় এবং গার্ড অব অনার জানিয়ে মনিবকে বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু যদি কখনো ভুল করে ঘেউ-ঘেউ করেও উঠে আর মনিব যদি ডাক দেয় বা শব্দ করে তখন সে মনিবের শব্দ শুনে মনিবকে চিনে দৌড়ে মনিবের পাশে গিয়ে লেজটা নিচের দিকে নামিয়ে মাথা নত করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। পক্ষান্তরে অপরিচিত কেউ আসলে, কুকুর ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে, আক্রমণ করার জন্য ছুটে যায়। মনিবের বাড়ির কোন কিছুর ক্ষতি হোক সে তার দেহে প্রাণ থাকতে মেনে নিতে চায় না। এ জন্যে কোথাও-কোথাও অমানুষেরা কুকুরকে আগে মেরে তারপর ঐ বাড়িতে চুরি-ডাকাতি করে থাকে বলে শুনা যায়।

বলুন! যেখানে কুকুরের মত একটি প্রাণি তার মনিবকে চিনল, মনিবের উসিলায় খাবার খায় বলে মনিবের হক বা স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে বলে বুঝতে পারল; সেখানে মানুষের মত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তার আপন প্রভু, তার স্রষ্টাকে চিনতে ব্যর্থ হলো, স্রষ্টার হক বা অধিকার আদায়ে গাফেল হলো তখন সে তো পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীব তা তো বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ পশুর যে যোগ্যতা বিদ্যমান, সে যোগ্যতা আল্লাহকে অস্বীকারকারী ঐ মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অতএব ঈমান আনার প্রথম শর্তই হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তথা আল্লাহর হক আদায় করা।

আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলীতে বিশ্বাস

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আরেকটি হক হচ্ছে তাঁর সিফাত ও গুণাবলীতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন এবং এ গুণাবলীর সাথে কাউকে শরীক না করা। বস্তুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণ– যা কার্যকরণ সূত্রে ক্ষমতারই স্বীকৃতি দেয়, সে সম্পর্কে না জানার কারণেই আল্লাহই যে পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা তা মানুষ ভুলে যায়। আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই আল-কুরআনুল কারীমে তার গুণ ও সিফাতসমূহের বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোন কোন নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দোর্দণ্ড ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশ করে। কোন নাম তাঁর প্রতিপালক, জীবিকা দানকারী ও সৃষ্টির যা-যা প্রয়োজন তাদের সকলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী হবার কথা বুঝায়। আবার কোন কোন নাম তিনি যে কারো মুখাপেক্ষী নন, জগতের সকল কিছুই যে তাঁর মুখাপেক্ষী তারও ইঙ্গিত প্রকাশ করে। এমনি করে তাঁর প্রতিটি নামই তাঁর বিশেষ-বিশেষ ক্ষমতার কথা প্রকাশ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

"তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।" (সূরা ত্বা-হা, ২০ : ০৮)

আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে :

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

"তিনি আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকৃতি দান করেন আর সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।" (সূরা আল হাশর, ৫৯ : ২৪)

মূলতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে এগুলোকে জানা, বুঝা, আয়ত্ত করা, এগুলোর দাবি অনুযায়ী আমল ও কর্ম করা, প্রত্যেকের যিন্দেগীতে আল্লাহর সেসব হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং এসব নামে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে তাঁর এসব গুণ ও সিফাতের স্বীকৃতি দেয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আল্লাহরই উত্তম নামসমূহ, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক; যারা তাঁর নাম

বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।" (সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ১৮০)

নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার বিশ্বাস

মানুষের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যতম প্রধান হক বা অধিকার হচ্ছে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে। তারা জীবনের কোন্ চাহিদা পূর্ণ করবে কি না বা করলে কিভাবে করবে, কতটুকু করবে, তার সুষ্ঠু সমাধান আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আল্লাহর বাণী থেকে গ্রহণ করবে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গুণাবলীসহ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার পরে মানুষের জন্য এ অবকাশ আর থাকে না যে, সে অন্য কারো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ ও বিধানের সামনে মাথা নত করবে। আল্লাহর বিধানসমূহকে সে বোঝা বলে মনে করবে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। বরং ঈমানের অনিবার্য দাবিই হলো ঈমান আনয়নকারী পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, শ্রদ্ধার সাথে কোন রকম প্রশ্ন বা যুক্তি-তর্ক ছাড়াই মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালন করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পর একজন মানুষ কোনক্রমেই অন্য কারো বিধানের সামনে, দুনিয়ার অন্য কোন পরাশক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। নিজে স্বয়ং কোন বিধি-বিধান চালু করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। যাবতীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে সে হয়ে পড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মুখাপেক্ষী। আর এটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। যেখানে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্য কোন সৃষ্টিই আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে না, আল্লাহর হুকুম পালনে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করে না, পাহাড়ি ঝর্ণা চলতে যেয়ে কোথাও একটু থেমে থাকে না, সৌরজগতে নিজ নিজ কক্ষপথে গ্রহ-উপগ্রহগুলো গমন করতে যেয়ে কখনো তার গতিপথ পরিবর্তন করে না, আবার পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজও গমন করতে করতে বেশ ক্লান্ত একটু বিশ্রাম বা থেমে থাকার দাবি পেশ করে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে পারবেও না, কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টি; আল্লাহর ইচ্ছাতেই তার চলন শক্তি; তারা সবাই আল্লাহর গোলাম। ঠিক তেমনি মানুষের জন্যও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একই বিধান প্রযোজ্য। মানুষ এ বিধান জীবনের সকল স্তরে মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু তারপরও যে মানুষ তাদের ইচ্ছাশক্তি বা নফসের

বশবর্তী হয়ে পশুত্বের আদলে চলাফেরা ও জীবন ধারণ করে তাদের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَه اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّموتِ وَالاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

"এসব লোক কি আল্লাহর বিধি-বিধানের আনুগত্য ত্যাগ করে অন্য কোন বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য করতে আগ্রহী? অথচ ঐ বিশাল আকাশ আর বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর বিধি-বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আর পরিশেষে তাঁরই দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ৮৩)

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে বলা হয়েছে, এক শ্রেণির জনগোষ্ঠী যাকে প্রকৃতি বা শক্তি মনে করে তার সামনে মাথা নত করছে, সেই শক্তিই মূলতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ-তরুলতাসহ গোটা প্রকৃতিই মহান আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরণ করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ.

"সূর্য ও চন্দ্র একটা হিসাব অনুসরণে বাধ্য এবং তারকা ও বৃক্ষ-তরুলতা সিজদায় অবনত।" (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ০৫-০৬)

اِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّموتِ وَالاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ وَلَئِنْ زَلَتَاۤ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِه اِنَّه كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যেন একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। যদি বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই যে, সে শক্তি তা ধরে রাখবে। অবশ্যই আল্লাহ অসীম ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১)

কাজেই বিষয়টি পরিষ্কার। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আল্লাহর এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে। আল্লাহর সিফাত এবং আল-কুরআনুল কারীমের সার্বিক আলোচনা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর আলোকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ অধিকার আমাদের সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর সেই সাথে আমাদেরকে ঘোষণা দিতে হবে :

اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ لاَشَرِيْكَ لَه ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আমার সালাত, আমার সমস্ত ত্যাগ-কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছুই বিশ্ব-নিখিলের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনই শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম অবনত মস্তকে তা মেনে নিলাম।" (সূরা আল-আন'আম. ০৬ : ১৬২-১৬৩)

এ আলোচনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে ইবাদাত ও খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করা এবং তাঁর সাথে কোন অবস্থাতেই কাউকেও এবং কোন কিছুকেই শরীক না করা অথবা কথাটা এভাবে বলা যায় যে, এক আল্লাহ তা'আলার সমস্ত হুকুম পালন করাই হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার। আর এটা মেনে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সঠিক মর্যাদা।

সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে আত্মনিবেদন

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের উপর এই হক বা অধিকার রাখেন যে, মানুষ কেবল আল্লাহকেই এ বিশ্ব পরিমণ্ডলে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিজেদেরকে একমাত্র তাঁর কাছেই নিবেদন করবে। এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে বড় মনে করা, তার কাছে মাথা নত করা, কিছু চাওয়া, পাথর বা মাটি, বাঁশ, খড় দিয়ে মূর্তি তৈরি করে তার কাছে হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করা, কবর বা কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে সন্তান কামনা করা, ধন-সম্পদ কামনা করা, বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ চাওয়া, রোগ থেকে মুক্তি চাওয়া এক কথায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া অন্য কোন কিছু বা কোন ব্যক্তির কাছে কিছু কামনা করাই হলো আল্লাহর হক বিনষ্ট করা বা হরণ করার শামিল।

মূলত মানুষ যখন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্তা ও অস্তিত্ব, আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তখনই সে অগণিত বস্তু বা দাসের দাসে পরিণত হয়। আর এটাই হচ্ছে তাদের জন্যে শাস্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে যাদেরকে আহ্বান কর, তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা আল-আরাফ, ০৭ : ১৯৪)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَه اِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غفِلُوْنَ.

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং এইগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।" (সূরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ০৫)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে এমন সব শক্তির পূজা-অর্চনা করা, তাদের কাছে মাথা নত করে প্রার্থনা করাতে কোন লাভ নেই। কারণ এসব মূর্তি তাদের প্রার্থনা শোনে না, শোনার ক্ষমতাও রাখে না। আর যদি শুনত বা শুনার, দেখার ও বুঝার মত শক্তি ও চেতনা থাকত, তাহলে বোধ হয় তাদের প্রার্থনা শুনে তাদের কল্যাণ না করে উল্টো তাদের প্রতি রেগে তাদের ধ্বংস ও গজব দিত। কারণ তারা যে মাটি থেকে আদম (আ)কে আল্লাহ সৃষ্টি করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে সম্মানের আসনে আসীন করেছেন সেই মাটি দিয়ে মানুষের রূপ ও আকৃতি তৈরি করছে কিন্তু তাতে জীবন ফুঁকে দিতে পারছে না, অধিকন্তু কয়েক দিন তাদের আস্তানায় রেখে বেশ কাপড়-চোপড় জড়িয়ে স্বর্ণ-গহনা পরিয়ে তাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করে তারপর তারাই আবার এটাকে নিয়ে আছড়ে ফেলে পানিতে ডুবিয়ে আসে। যাকে এত কিছু করল তাকে আবার ডুবিয়ে মারল; বলুন, তার কোন চেতনা, আর শক্তি থাকলে তা কী আদৌ সম্ভব হত! এ জন্যেই বলা যায়, যে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম নয় সে তো আর যাই হোক মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জীবের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। যার ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে বলে দিয়েছেন এভাবে–

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَيَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًامِّنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোন শক্তিকে ডাকবে না, যারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, তোমার কোন ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়। তুমি যদি তাদেরকে ডাক, তাহলে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৬)

সুতরাং আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে, যিনি প্রার্থনা শোনেন, যিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম, যিনি মানুষের প্রতিপালক, যিনি চিরঞ্জীব। মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الْحَيُّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"তিনিই চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা ডাক কেবল তাঁকেই, একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর

জন্য নির্দিষ্ট, যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। (সূরা আল-মুমিন, ৪০ : ৬৫)
মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যাদেরকে ডাকছ, যাদের কাছে দু'আ করছ, তারা কোন জিনিসের মালিক নয়; নয় কোন বস্তুর স্রষ্টা। তারা স্বয়ং আমারই সৃষ্টি। তারা তোমার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়।

বিশ্ব পরিমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الاَرْض ط وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُّحِيْطًا.

"আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আন্-নিসা, ০৪ : ১২৬)

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ لَه مُلْكُ السَّموتِ وَالاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ.

"আপনি কি জানেন না, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীও নেই। (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১০৭)

اِنَّ اللهَ لَه مُلْكُ السَّموتِ وَالاَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহরই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ১১৬)

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لاَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ.

"তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে, তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৩)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّموتِ وَالاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرتٍ م بِاَمْرِه اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبرَكَ اللهُ رَبُّ الْعلَمِيْنَ.

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে এগুলোর একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনি সৃষ্টি করেছেন। জেনে রেখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ মহিমাময়।" (সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ৫৪)

আল্লাহ্ই সকল ক্ষমতার উৎস

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ.

"বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দাও এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ২৬)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَه مِنْ شَيْءٍ فِى السَّموٰتِ وَلاَ فِى الاَرْضِ اِنَّه كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا.

"আল্লাহ এমন নন যে, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪৪)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّموٰتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ.

"আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী আল্লাহ্ যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন; তা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৯)

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ.

"তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৩)

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لاَمُعَقِّبَ لِحُكْمِه.

"আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই।" (সূরা আর্-রাদ, ১৩ : ৪১)

জীবন ও মৃত্যু এবং সন্তান-সন্ততি দেয়া না দেয়া আল্লাহর হাতে

وَاَنَّه هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.

"আর নিশ্চিত তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই জীবন দান করেন।" (সূরা আন্-নাজম, ৫৩ : ৪৪)

هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তিনিই (আল্লাহই) জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৬)

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ.

"আর আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" (সূরা আল-হিজর, ১৫ : ২৩)

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ.

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন একটিও করতে পারে।" (সূরা আর-রূম, ৩০ : ৪০)

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

"তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন, তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" (সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৪৯-৫০)

কাউকে সম্মান দেয়া ও না দেয়া, ক্ষমতা দেয়া এবং কেড়ে নেয়া আল্লাহর এখতিয়ার

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

হে নবী! "বলুন, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা

আপনি ইজ্জত-সম্মান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন, সকল কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয় আপনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ২৬)

আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা

তাওহীদের বিপরীত মতবাদই শিরক। শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা, আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণরাজিতে কাউকে শরীক করে নেয়া, আল্লাহর হকের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা। অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়ে আজও মানুষ জেনে-না জেনে, বুঝে-না বুঝে, জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে, সচেতনে-অবচেতনে আল্লাহর অস্তিত্বে শরীক বানিয়েছে। যার জন্যেই মানুষ মাথা নত করছে বিভিন্ন সৃষ্টির কাছে, সাহায্য কামনা করছে সৃষ্টির কাছে, দাসত্ব আর গোলামী করছে যুগে-যুগে বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর। আর অকপটেই হরণ করে চলছে আল্লাহর হক বা অধিকার।

প্রকৃত অর্থে অনেক ঈমানের দাবিদার শিরকের চোরাবালিতে আটকা পড়ে আছে। কেউ যদি তাদেরকে বলে তোমরা ঈমানের দাবি করছ আবার শিরকের মধ্যে ডুবে আছ, এভাবে শিরক ও ঈমানের পরস্পর বিরোধী দু'টি পথকে আঁকড়ে ধরছো কেন? জবাবে তারা বলে, আমরা শিরক করছি না; তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করছি মাত্র। আমরা তাদের ভক্ত-অনুরক্ত। তারা আরো বলে, আমরা তাদেরকে আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি মনে করে থাকি। আল্লাহ তাদেরকে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। তারা আল্লাহর ইচ্ছায়ই পৃথিবীতে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে থাকেন। তাদের ডাকা আল্লাহকেই ডাকা এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা। তারা আল্লাহর অতি প্রিয় তাই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তারা আমাদের সুপারিশকারী ও উকিল। তাদের সান্নিধ্য পেলে আল্লাহকে পাওয়া যায় এবং তাদেরকে ডাকলে, মানলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হতে থাকবে ইত্যাদি আরো কিছু কথা– যা শিরক। আর তা বলার কারণ হচ্ছে, এসব লোকেরা আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীস পরিত্যাগ করেছে, শারী'আতকে বুদ্ধির নিমিত্তে ওজন করেছে, মিথ্যা কাহিনী ও অলীক বস্তুর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে এবং ভ্রান্ত রীতি-নীতিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করছে। তাদের কাছে যদি আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা জানতে ও বুঝতে পারতো যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মুশরিকরাও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এ ধরনের কথাই বলতো। তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। তাদের

এসব কথাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَيَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّموتِ وَلاَ فِي الاَرْضِ سُبْحنَه وَتَعلى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা করে যা তার ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। (ঐসব জিনিস সম্পর্কে) তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছো যা আসমান ও জমিনে (আছে বলে) তিনি জানেন না (অর্থাৎ যার কোন বাস্তবতা নেই)? তিনি তাদের নির্ধারিত শরীকদের থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮)

সুতরাং অবিশ্বাসীরা যেসব জিনিসের পূজা করে তা একেবারেই অসহায়। তাদের মধ্যে না আছে কারো উপকার করার শক্তি, না আছে ক্ষতি করার ক্ষমতা। এরা আল্লাহর কাছে কারো জন্য সুপারিশ করবে একথা একেবারেই ভ্রান্ত। একথা বানোয়াট। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একথা আল-কুরআনুল কারীমে কোথাও বলেননি। বরং যা বলেছেন তা হলো :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِه اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللهِ زُلْفى اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَاهُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ كذِبٌ كَفَّارٌ.

"আর যারা আল্লাহকে রেখে অন্যদেরকে বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদাত করি শুধু এ কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। মিথ্যাবাদী ও কাফিরদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ০৩)

কাজেই বিষয়টি পরিষ্কার, সমগ্র বিশ্ব পরিমণ্ডলে আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই যে, যদি তাকে মান্য করা হয় তাহলে সে উপকার করবে আর যদি মান্য করা না হয় তাহলে ক্ষতি করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

قُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلاَيُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّهِ قُلْ فَاَنّى تُسْحَرُوْنَ.

"(হে নাবী!) আপনি বলুন, এমন সত্তা কে আছে যার হাতে সব জিনিসের মালিকানা ও ক্ষমতা। তিনিই (আল্লাহ) আশ্রয়দাতা। তার প্রতিপক্ষের কেউ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান থাকে (তাহলে বলো)?

তারা এ জবাবই দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া এমন সত্তা আর কেউ নেই। আপনি বলুন, তারপরও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছো?" (সূরা আল-মুমিনূন, ২৩ : ৮৮-৮৯)

মূলতঃ কাউকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সমকক্ষ মনে করা শুধু শিরকই নয়, বরং যেসব বিষয়কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের সত্তার গুণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন এবং বান্দার জন্য ইবাদাতের নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অন্যদের সামনে যদি তাই করা হয় যেমন : সিজদা, কুরবানী, বিপদের সময় সাহায্যের জন্য ডাকা, সন্তান ও সুখ কামনা করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা, রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অন্যদেরও কিছু অংশ আছে বলে মনে করা হয়, তাহলে তাই শিরক এবং শিরকেরই বিভিন্ন রূপ। সিজদা বা মাথা নত করা কেবল আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্যই নির্দিষ্ট। কুরবানী তাঁর উদ্দেশ্যে করা হয়। তাঁর নামেই মানত করা হয়, বিপদে তাঁকেই ডাকা হয়, তিনিই সর্বত্র সবকিছু দেখেন এবং সব রকম ক্ষমতা ও এখতিয়ার তাঁর দখলে। গায়রুল্লাহর মধ্যে এসব গুণের কোনটা আছে বলে মনে করাই শিরক, যদিও তাকে আল্লাহর চেয়ে ছোট এবং আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টিই মনে করা হয়। এ ব্যাপারে নবী, অলী, মানুষ, জিন, শয়তান সবই সমান। যার সাথেই এ আচরণ করা হবে তা শিরক হবে এবং যে করবে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَه عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ওলামা ও দরবেশকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং সেই সাথে মাসীহ ইবন মারইয়ামকেও। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে– যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ হওয়ার যোগ্য নয়। যিনি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ৩১)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا .

"আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর সামনে দাসরূপে হাজির হবে না। তিনি তাদেরকে হিসাব করে এবং গণনা করে রেখেছেন। সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সামনে হাজির হতে হবে।" (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৩-৯৫)

শিরক আল্লাহর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা

আজকাল কেউ কেউ না বুঝে কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা ও কর্মে আমি এটার মালিক, ঐটার মালিক, উপার্জনক্ষম হলে আমি সকলকে খাওয়াই, আমি এটা করি, আমি তাকে এটা দেই ইত্যাদি বলে থাকে– যা মূলতঃ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই বহিঃপ্রকাশ। অথচ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

"আর আল্লাহ হলেন মহিমান্বিত, যিনি প্রকৃত মালিক। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি রব মহান আরশের।" (সূরা আল-মুমিনূন, ২৩ : ১১৬)

وَهُوَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولٰى وَالاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; আর হুকুমের অধিকার তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭০)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ.

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর। তিনি ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিযক দান করে? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ০৩)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই, মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশেষ রহমত ও বরকতের মাঝে এসব কিছু করার উসিলা মাত্র। সে কথা সুসময়ে অনেকেই ভুলে যায়– যা আল্লাহর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। তাই আল্লাহ বলেন :

وَاِذَا مَسَّ الاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّه مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَه نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِه قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ.

"মানুষকে যখন কোন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রবকে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ঐ দুঃখের কথা ভুলে যায়, যার জন্য সে তাঁকে ডেকেছিল। আর সে অপরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, যাতে তারা তাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। বল, 'কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছু কাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের

অন্যতম।" (সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ০৮)

অথচ এই অবিবেচক মানুষগুলো একবারও চিন্তা করে না যে, মহান আল্লাহর দেয়া অগণিত নিয়ামতের বদৌলতেই তারা এ পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَتُحْصُوْهَا اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮)

শিরক এক বিরাট যুলুম

আল্লাহর নিরঙ্কুশ সত্তা ও তাঁর অবিভাজ্য ইলাহিয়াতের গুণাবলীর সঙ্গে মানুষ যে শিরক করে আসছে এ হচ্ছে এক বিরাট যুলুম, জঘন্য অন্যায় ও অবিচার।

لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

"আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চিত জেনো, শিরক হচ্ছে অতি বড় যুলুম।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৩)

اِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয়, আল্লাহর সাথে শরীক বানানোর যে পাপ তা তিনি ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য যে কোন পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর মিথ্যা।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৪৮)

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَبُرْهَانَ لَه بِه فَاِنَّمَا حِسَابُه عِنْدَ رَبِّه اِنَّه لاَيُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ.

"যারা আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকে, এর সমর্থনে তাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। তাদের হিসাব-নিকাশ হবে আল্লাহর নিকট। এ ধরনের কাফিররা কিছুতেই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে না।" (সূরা আল-মুমিনূন, ২৩ : ১১৭)

জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা

আজকাল কারো কারো মুখে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস বলে কতিপয় কথা শুনা যায়– ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে জনগণের ম্যান্ডেট বা ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতাকে কারো পক্ষে নেয়ার জন্যে এসব কথা তারা বলে থাকে। কিন্তু একথা যে মহান আল্লাহ বিরোধী, আল্লাহর সকল শক্তি ও ক্ষমতার বিপরীত তা তারা বুঝে না। মনে করে ক্ষমতায় বসাতে পারে জনগণ, নামাতে পারে জনগণ। অথচ

আল্লাহ্ বলেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ২৬)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেখানে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন সেখানে কোন ব্যক্তি একথা বলা তো হয় তার দুঃসাহস, না হয় তার অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, না হয় দুনিয়ার মোহে অন্ধ। আর তাই এমন মনে করে যারা ক্ষমতার আসনে আসীন হয় তারা জনগণের হক হরণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না, তাদের দ্বারা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ হয় না। ফলে তাদের উপর আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ীই শাস্তি ও অসম্মান, অপমান নেমে আসে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"বস্তুত সমস্ত শক্তি ও কর্তৃত্বই আল্লাহর। যিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৫)

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ.

"সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৬৫)

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

"আল্লাহই তো জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।" (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৮)

'ইবাদাত তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে সোপর্দ হওয়া

মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ মেনে 'ইবাদাত বা দাসত্ব করবে– এটি মানুষের উপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক বা অধিকার। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল তাঁরই ইবাদাত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ. مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ

يُطْعِمُوْنَ. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

"আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমারই 'ইবাদাত করবে। আমি তো তাদের নিকট কোন রিযক পেতে চাই না, চাই না তারা আমাকে খাওয়াবে। মূলতঃ আল্লাহই তো হচ্ছেন মহারিযকদাতা, সুদৃঢ় শক্তির অধিকারী।" (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬-৫৮)

আল্লাহ তা'আলার আরো ঘোষণা :

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

"তারা তো কেবল এই মর্মেই আদিষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে নির্ভেজাল ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশ করতঃ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও গোলামী করবে।" (সূরা আল-বায়্যিনা, ৯৮ : ০৫)

মূলতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও নীতি-আদর্শগত অসীম নি'আমতের দাতারূপে ঐকান্তিকভাবে মেনে নেয়া যেমন কর্তব্য, তেমনি কর্তব্য আল্লাহকে একমাত্র মাবুদরূপে এবং নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর 'আবদ বা দাসরূপে মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করা। অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনকে তার ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আল্লাহর মর্জি মুতাবিক পরিচালনা করে– সবক্ষেত্রে তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাকেই আল্লাহর 'ইবাদাত বুঝায়। অবশ্য মানুষ যাতে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানতে সক্ষম হয়, হুকুম মানার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় সে জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দয়া করে আমাদের জন্যে নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযার মত চারটি বুনিয়াদী ইবাদাত বাধ্যতামূলক করেছেন। এই বুনিয়াদী ইবাদাতসমূহকে আমরা মুসলিমদের জন্য আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতও বলে থাকি। নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আদায় করতঃ এই 'ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে আমরা সর্বক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম মেনে চলার, 'ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায়ে অনুগত হতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হিসেবে মুসলিম জাতিকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।

০১. আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব। ইসলামী পরিভাষায় তাকে বলা হয় হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক।

০২. আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় হাক্কুল 'ইবাদ বা বান্দার হক।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক আদেশকৃত 'ইবাদাতগুলো এই

উভয় প্রকারের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে। তবে নামায, হজ্জ ও রোযার মধ্যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের দিকটাই প্রধান। আর আল্লাহর জন্যেই যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে সেজন্যে আল্লাহর হকের প্রতি দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধির উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করাটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে যাকাত হাক্কুল 'ইবাদ বা মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রতিই ধনী বা সম্পদশালীদের উদ্বুদ্ধ করে।

সালাত বা নামায

ঈমান আনয়নের পর প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য বাধ্যতামূলক হলো সাবালক বয়স থেকে অবশ্যই সালাত আদায় করা। আর এ সালাত হতে হবে মানুষের জন্যে প্রেরিত আদর্শ প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে এবং যে সময়ে যে-যে সালাত আদায় করেছেন তার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ করার মাধ্যমে। আল্লাহর বাণী আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সালাত আদায়ের তাকিদ দিয়ে মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلّٰى.

"নিশ্চয় সফলতা লাভ করে সে, যে পরিশুদ্ধ হয় এবং যিকর করে তার রবের নাম এবং কায়েম করে সালাত।" (সূরা আল-আলা, ৮৭ : ১৪-১৫)

আবার মানুষের দুর্ভোগ কিসে সে সম্পর্কেও আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

"আর দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা নিজেদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং বিরত থাকে নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে।" (সূরা আল-মাউন, ১০৭ : ০৪-০৭)

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে এ বিশ্ব স্রষ্টা, এ বিশ্বের মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী তার স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যম। আর যারা এ ইবাদাত যথাযথভাবে আদায় করে আল্লাহও তাদের প্রতি রহম করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"আর তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৬)

আসলে এ নামাযই মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত রেখে আদর্শ মানুষ তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সহায়তা করে। পবিত্র কুরআনে

আল্লাহ বলেন :

إِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

"অবশ্য অবশ্যই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, একমাত্র আমারই ইবাদাত কর, সালাত কায়েম করো, আমার যিকরের জন্যে।" (সূরা তো-হা, ২০ : ১৪)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

"সালাত কায়েম করো, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৪৫)

বস্তুত মানুষের মনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যাত, সিফাত ও হুকুম-আহকামের কথা স্মরণ থাকলেই মানুষ আল্লাহর পথে চলতে পারে। এতে আল্লাহর হক যেমন আদায় করা সহজ হয় তেমন আল্লাহর সৃষ্টির প্রতিও দায়িত্ব পালন করার মন-মানসিকতা গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ব্যাপারে মানুষের মন যদি গাফিল হয়ে যায়, তাহলে সে যেমন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তেমনি অপরের প্রতিও হয়ে উঠে দায়িত্ব-কর্তব্যহীন। আর এ সর্বনাশা অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে :

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

"তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পড়াশুনা করছ, তোমাদের কি বিবেক-বুদ্ধি নেই? সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয়ই এটা মস্তবড় কঠিন কাজ, অবশ্য তাদের জন্যে নয় যারা বিনয়ী; যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্যে হাজির হতে হবে, তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ৪৪-৪৬)

অপরদিকে মাসজিদে জামাতে নামায আদায় করার মাধ্যমে সমাজে একতা, ধনী-গরীব, সাদা-কালো নির্বিশেষে সহ-অবস্থানের মানসিকতা, পরস্পর সহনশীলতা ও একে অপরের প্রতি মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার আমল হিসেবে এটা হাক্কুল ইবাদ এর সম্পূরকও বটে।

যাকাত

সালাতের পর দ্বিতীয় বুনিয়াদী ইবাদাত হচ্ছে যাকাত। আল-কুরআনুল কারীমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাত কায়েমের সাথে যাকাত আদায়ের আলোচনা পাশাপাশি এসেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন :

هُدًى وَّبُشْرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"হিদায়াত ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য- যারা কায়েম করে সালাত এবং দেয় যাকাত আর তারাই আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত ঈমান রাখে।" (সূরা আন-নামল, ২৭ : ২-০৩)

কাজেই বলা যায়, যাকাত দান দরিদ্রেদের প্রতি অনুকম্পা নয়। এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ। ফলে এটি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে কোন প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নেয়া আল্লাহর হক। আবার এ যাকাতের অর্থ বা সম্পদ দরিদ্রদের প্রদানে ধনীদের প্রতি আদেশ দেয়ায় তা দরিদ্রের হক বলেও গণ্য। তবে যে কথা না বললেই নয় সেটি হলো, যাকাতদাতা তথা সম্পদশালী ধনবানরা নিজেকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জিত করতে না পারলে আল্লাহর হুকুমের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শনস্বরূপ স্বউপার্জিত অর্থ-সম্পদ কখনও স্বেচ্ছায় অপরের হাতে তুলে দিত না। আর তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন :

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّه مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا.

"তারা আল্লাহর মহব্বতের তাকিদে ইয়াতীম-মিসকীন প্রভৃতিকে খাবার খাওয়ায় আর বলে আমরা তোমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে খাওয়াচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রকারের প্রতিদান আশা করি না। তোমাদের পক্ষ থেকে কোন কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না।" (সূরা আদ-দাহর, ৭৬ : ০৮-০৯)

এরপর নিঃস্বার্থ মন নিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন ও আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারণে যাতে মুসলিমরা এগিয়ে আসে এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা যাকাতের মাধ্যমে একটি বাধ্যতামূলক ও কল্যাণমূলক অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব মুসলিমদের উপর অর্পণ করেছেন। সেই সাথে যাকাতদাতাদের গুনাহসমূহও মিটিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হয়েছে :

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ.

"যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহকে করজে হাসানা দান কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেব।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ১২)

হাজ্জ

হাজ্জ মুসলিমদের জন্য তাওহীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ। এর সমস্ত কার্যক্রম আবর্তিত হয় তাওহীদকে কেন্দ্র করে। আর তাওহীদের সার কথা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের একতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। অতএব এ 'ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক আদায়ের বিষয়টি প্রধান হলেও মানুষের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের ব্যাপারটিও উপেক্ষিত নয়।

তবে হাজ্জ হলো আল-কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত বিভিন্ন আয়াত, দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন সরাসরি চোখে দেখা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে প্রাণ ভরে ডাকার, তাঁর ডাকে সাড়া দেবার এবং তাওবা করে নিজেদেরকে পূতপবিত্র (মানুষের ঋণ ব্যতীত) করার এ এক উত্তম ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَه كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

"সন্দেহ নেই, মানব জাতির সর্বপ্রথম যে ঘরখানা মক্কায় নির্মাণ করা হয় তা অতীব বরকতময় এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্যে হিদায়াতের কেন্দ্রস্থল। সেখানে 'মাকামে ইবরাহীম' আয়াত– একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে বিরাজ করছে। যে কেউ এ ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে। মানুষের মধ্য থেকে যারা পথের খরচ বহন করতে সক্ষম তাদের জন্যে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এই ঘরের হাজ্জ ফারয করা হয়েছে। যারা কুফরী করবে তাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্ববাসীর কারো মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ৯৬-৯৭)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

"আর তোমরা পূর্ণ কর হাজ্জ ও 'উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৯৬)

অবশ্য সামর্থ্য ও আর্থিক সঙ্গতির উপরেই যদিও হাজ্জ আদায়ের হুকুম

আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তবুও সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে পারস্পরিক সৌহার্দ্যও এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। ফলে একে অন্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরকে চেনার এবং আত্ম-সচেতনতার সীমা পেরিয়ে তুলনামূলকভাবে আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এ এক মহাসম্মেলন।

পৃথিবীর বুকে স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে বিশ্বের এক প্রান্তের মুসলিমদের সাথে অন্য প্রান্তের মুসলিম, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত আরব-আজম নির্বিশেষে একাকার হবার তথা আল্লাহ বড়, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এমন মনে করে একমাত্র তাঁর কাছেই মাথা নত করে তাঁর সবকিছুর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করার এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর হতে পারে না।

সাওম বা রোযা

ইসলামের অন্যতম মৌলিক 'ইবাদাত হচ্ছে সাওম। যা বছরে এক মাস সুস্থ-সবল সামর্থ্যবান মুসলিমদের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফারয করেছেন। আর রমাদান মাসেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বের বুকে সকল সৃষ্টির হক সম্বলিত একমাত্র পরিপূর্ণ সংবিধান আল-কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"রামাদান ঐ মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হিদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশপূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা সফরে থাকলে, এ সংখ্যা অন্য সময় পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তিনি চান না। তোমাদেরকে এজন্যই এ নিয়ম দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হিদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সৎপথে পরিচালিত করার জন্য এবং তোমরা শোকর করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৮৫)

মূলত আল-কুরআনুল কারীম নাযিলের মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে রোযা ফারয করেছেন সেই রোযার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন। অপরদিকে কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্যে, কুরআনী অনুশাসন মেনে চলার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকওয়াকে, তাকওয়াভিত্তিক চরিত্রকে শর্ত বানিয়েছেন। অতএব সার্বক্ষণিক 'ইবাদাত তথা আল্লাহর হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য, মুসলিমদেরকে সকলের হক আদায়ে সচেতন করার জন্য আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত 'ইবাদাত। পৃথিবীর বুকে মুসলিমদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি প্রবল বিশ্বাসের চেতনা বৃদ্ধি এবং কুরআনী অনুশাসন মেনে চলার যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা মহাবিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবসম্মত হিদায়াত কোর্সও বটে।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট, সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সিয়াম পালন নিছক আনুষ্ঠানিকতার জন্যে নয় এর মূলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনেক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যও সমগ্র উম্মাহর কল্যাণ বৈ আর কিছু নয়। অর্থাৎ এসব ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল বানাতে এবং তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করার যোগ্য বানাতে চান। আর ঈমানদার বান্দাদের দায়িত্ব যুগপৎভাবে আল্লাহর প্রতি যেমন রয়েছে তেমনি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, সৃষ্টির সেরা মানবজাতির প্রতিও রয়েছে। আর এ উভয়বিধ দায়িত্ব সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি সব সময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণের অধিকারী ও সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে পূত-পবিত্র। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সকল সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর অবশ্যম্ভাবী সদা অস্তিত্বে, 'ইবাদাত-বন্দেগী লাভের অধিকারে, বিশ্ব জাহানের শৃঙ্খলা বিধান ও পরিচালনায় কোন শরীক নেই, সহযোগী নেই। তিনিই অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, রিযকও দেন, আপদ-বিপদ, বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। তিনি কোন দিক বা স্থানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তিনি যা চান তাই হয়, যখন চান তখনই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি

কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর উপর কারো আইন, কারো নির্দেশ চলে না। তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না। কোন কিছু করা তাঁর উপর অবশ্য কর্তব্য নয়। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ব্যতীত যথাযথ কোন নির্দেশদাতা নেই।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! যুগে যুগে কতিপয় মানুষ তাদের স্রষ্টার সাথে পাল্লা দিয়ে কথার মাধ্যমে স্রষ্টার ক্ষমতার সাথে অংশীদারিত্ব দাবি করে বা দুনিয়ার চেয়ারে আসীন হওয়ার সুবাদে নিজেকে আইনদাতা মনে করে দুনিয়ার অঙ্গনে তাদের বিধান বাস্তবায়নের অপচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করেছে। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এসব অপচেষ্টা সমূলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যৎ জাতির জন্য গড়ে দিয়েছেন উপমা ও দৃষ্টান্ত। যাতে আর কেউ অজ্ঞতাবশত এমন দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা না করে সেই অতীত থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে।

আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টায় সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সোচ্চার হতে হবে একসাথে। আর সকলের হকের প্রতি হতে হবে সচেতন, যত্নশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। পাশাপাশি আমাদের এ ফায়সালায় উপনীত হতে হবে এ জমিন কার? কে এ জমিনকে সচল ও সজীব রাখেন? কে সবকিছুর স্রষ্টা? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

"সেই আল্লাহই তোমাদের রব, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁরই 'ইবাদাত কর। আর তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।" (সূরা আল-আন'আম, ০৬ : ১০২)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِه.

"তিনি (আল্লাহ) নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন খুঁটি ব্যতীত; তোমরা তা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার জীবজন্তু। আর আমিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাতে জন্মাই সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। এ আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে তা দেখাও।" (সূরা

লুকমান, ৩১ : ১০-১১)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّموتِ وَالاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنّى يُؤْفَكُوْنَ.

"আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? কে চাঁদ-সূর্য নিয়ন্ত্রণ করে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্।" (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৬১)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

"আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, ভূমি মরে গেলে কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা সঞ্জীবিত করে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা অনুধাবন করে না।" (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৬৩)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহর ভাষায়ই স্পষ্ট হলো এ জমিন আল্লাহর। তিনিই এ জমিনকে সচল ও সজীব রাখেন। তিনিই দুনিয়ার বুকে দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছুর খালিক-স্রষ্টা।

বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধান ও সকলের হক বা অধিকার আদায়ে এ দু'টি গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের জ্ঞানে আমরা যদি জ্ঞানী হয়ে জীবনাদর্শ গঠন করতে পারি তাহলেই একটি সুন্দর বিশ্ব গঠন এবং আখিরাতে মহাপুরস্কার, জান্নাত লাভের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। এ দু'টির জ্ঞান ছাড়া অস্থিতিশীল এ পৃথিবীর বুকে স্থিতিশীলতা আনয়ন অতীতেও সম্ভব হয়নি আর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। তাই এখানে আল-কুরআনুল কারীম ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, মানবতার মুক্তির দূত, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক যাঁর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মতাবলম্বীদেরই অভিযোগ নেই, সেই প্রিয় ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা পেশ করছি।

বিশ্ব স্রষ্টার বাণী আল-কুরআনুল কারীম

পৃথিবীর বুকে যুগে-যুগে নবী ও রাসূলগণের কাছে মানব জাতির হিদায়াত, পথ-প্রদর্শক ও পরিচালনা পদ্ধতির ম্যানুয়াল হিসেবে যত আসমানী কিতাব ও সহীফা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হলো আল-কুরআনুল কারীম, এটি গোটা মানব জাতির মুক্তির মহাসনদ ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চূড়ান্ত বাণী হিসেবে বর্তমান বিশ্বে একমাত্র অবিকৃত মহাগ্রন্থ। মহান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর এই সর্বশেষ কিতাবের মাধ্যমে অতীতের সকল আসমানী কিতাবসমূহের হুকুম-আহকামকে রহিত ঘোষণা করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার (সিলসিলার) পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এই কিতাবের প্রতি ঈমানের ঘোষণার সাথে আমাদেরকে এটাও বিশ্বাস করতে হয় যে, এটাকে মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান, পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন ও শাসন সংবিধানরূপেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করেছেন। যারা এ কিতাবকে তাদের জীবন গঠন ও পরিচালনায় গ্রহণ করে, এ কিতাব তাদের ইহকালীন জীবন ও পরকালীন সাফল্যের গ্যারান্টি দেয়। আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে উভয় জগতে দুর্ভাগ্য বরণের ভীতি প্রদর্শন করে।

পৃথিবীর বুকে এটাই একমাত্র কিতাব যাকে যাবতীয় বিকৃতির হাত থেকে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংস্কার-সংস্করণ তথা সংযোজন-বিয়োজনের হাত থেকে হিফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ স্বয়ং করেছেন। এবার কুরআন প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা,

الـــمّ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبُ لاَرَيْبَ فِيْهِ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰـــهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰـــهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ.

"আলিফ-লাম-মীম। এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি তারা বলে, এটা তো সে [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজে রচনা করেছে? না এটা তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা সৎপথে চলবে।" (সূরা আস্-সাজদা, ৩২ : ০১-০৩)

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَّهْدِىْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর-জ্যোতি এবং স্পষ্টবাদী কিতাব (কুরআন) এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন লোকদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তিনি তাঁর (আল্লাহর) অনুমতিক্রমে তাদেরকে (কুফর ও শিরকের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ১৫-১৬)

فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُـــوْلِـــهِ الـــنَّـــبِىِّ الاُمِّـــىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمٰتِه وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُوْنَ.

"সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।" (সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ১৫৮)

আর এ কুরআনের বাণীতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদিও অতীতে অনেক জাতি-গোষ্ঠী এর প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে। অবশ্য তারা সন্দেহ পোষণ করত এ কারণে যে তারা তখন নৈতিকতা ও মানব জাতির আদর্শ বিরোধী যা-যা করত তার বিরুদ্ধেই তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে কুরআনের ঘোষণা হিসেবে শুনত। তাই তাদের মনে সন্দেহ হত যে, আমরা এখানে যা করছি তা আবার আল্লাহ দেখে কিভাবে! আর আমরাও তো আল্লাহকে দেখি না। আমরা যা করি তা তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই দেখেন। তাই এ কথাগুলো বোধ হয় আল্লাহর নয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা। আর এ সন্দেহ দূরীভূত করার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমেই তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِه مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"তারা (কাফির ও মুশরিকরা) কি বলে, সে (মুহাম্মাদ) নিজে এ (কুরআন) রচনা করেছে? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার ডেকে লও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হূদ, ১১ : ১৩)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِه وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"তারা কি বলে, সে এ কুরআন রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৮)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه.

'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর।' (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৩)

কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ যে তারা গ্রহণ করতে পারবে না তা তো আল্লাহ্ জানেন। আর তাইতো তিনি এও বলে দিয়েছেন :

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

"বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্যে মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৮)

পরিপূর্ণ জীবন বিধান

আল-কুরআনুল কারীমে মানুষের জন্ম-পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন পর্যন্ত সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেশ করা হয়েছে। শুধু প্রয়োজন আল-কুরআন অধ্যয়ন এবং সকল ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা করে জীবনের অসঙ্গতি দূরে ঠেলে পরিপূর্ণ সমাধান গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী সুন্দর জীবন ধারণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُراٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا.

"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে না? এ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি দেখতে পেত।" (সূরা আন্-নিসা, ০৪ : ৮২)

তারপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلاَ يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا.

"(হে রাসূল!) ওরা আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৩৩)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً.

"সত্য ও ইনসাফের দিক দিয়ে আপনার প্রতিপালকের বাণী (কুরআন) সম্পূর্ণ হয়েছে।" (সূরা আল-আন'আম, ০৬ : ১১৫)

পবিত্র কুরআনে সত্যের মূলনীতিসমূহ এবং মানুষ ও সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্য আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানসমূহ পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যিনি সৃষ্টির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ও চাহিদা জানেন তিনিই তো তার

পরিপূর্ণ সমাধান দিতে পারেন। অর্থাৎ যে মানুষ বা ইঞ্জিনিয়ার কোন জিনিস তৈরি করে সেই তো জানে তার সার্ভিস কত দিন হবে এবং সেই অনুযায়ীই তো সে তার ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ হয়তো এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীর কথা ভাববেন যে বিজ্ঞানীরা সব জানে, তাহলে তাদের লক্ষ্য করে বলছি, ধরে নিলাম আপনাদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে যে উন্নত রাষ্ট্রের যন্ত্র ও সুযোগ-সুবিধা নির্ভর ক্ষমতাধর বিজ্ঞানীরা মানুষের পরবর্তী ১০০ বছরের জীবনে কী প্রয়োজন আর কী প্রয়োজন নেই তা বলতে পারে। আচ্ছা বলুন, তাহলে ১০০ বছর পরবর্তী জীবনের কথা কে বলবে? আবার সেই বিজ্ঞানী তো তার নিজের জীবনের সমাধানই দিতে পারছে না। সেই তো কখনো মাথায় কোন পলিসি না আসলে অস্থির পাগলের প্রলাপ বকতে-বকতে মাথাকে আছড়িয়ে মারে। এবার কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের কথা হয়তো কেউ-কেউ ভাবছেন, তাদের লক্ষ্য করে বলছি– মাইক্রোসফটের বিজ্ঞানীদের কাছে আগামী দিনের খুব পাওয়ার ফুল পেন্টিয়াম পাঁচ থেকে শুরু করে মনে করুন পঁচিশ নম্বর ভারসন পর্যন্ত এখনই প্রস্তুত– যা আগামী ১০০ বছরের জনগোষ্ঠীর কম্পিউটারের চাহিদা পূরণ করবে কিন্তু তারপর! আর তাকে কে দিল এ মেধা, চিন্তা ও গবেষণা করার শক্তি-সামর্থ্য। সুতরাং যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করে আসুন মেনে নিই; দুনিয়ার যে সকল সংবিধান আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের ছাঁচে গড়া হয়নি তা কখনো মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে না।

মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও উপদেশ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্যন্ত প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সীমানায় জন্মগ্রহণকারী এক শ্রেণির মানবগোষ্ঠীর মাঝে হক হরণের যে নীরব থেকে সরব প্রতিযোগিতা দেখেছি, যাদের জন্যে এ দেশের অর্থনীতি পিছিয়ে আছে, যাদের জন্যে আরেক শ্রেণি খাবার খেতে না পেয়ে ভাত চুরি করছে, সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করছে, তাদের সকলকে আদর্শমুখী করে একটি কল্যাণময় সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ বর্তমান ও আগামীদেরকে উপহার দিতে আজ আমাদের প্রয়োজন হিদায়াত ও আদর্শ জীবন গঠন। দেশে মূলতঃ আইন আছে, আরো আইন হচ্ছে, দুর্নীতি রোধে দুর্নীতি কমিশন গঠিত হয়েছে, দিন-রাত কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কাজ করছেন কিন্তু ১/১১ পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি আরো বেড়েছে। এতে উদ্বিগ্ন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং হতাশ সবাই। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হতে শুরু করে সকল চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন তাদের অনেকেই একমত

দুর্নীতি তথা হক হরণ ঠেকাতে আজ সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। তার মানে তারা ভাবছেন যারা ঘুষ দিচ্ছেন ও নিচ্ছেন তারা উভয়পক্ষই বুঝি অসচেতন-অসচেতনতার সাথেই এ কাজটি করছেন। আসলে কি তাই। সত্যিই কি তারা অসচেতন! যদি তাই হবে তাহলে যারা অপরের কাছে কিছু দাবি করছেন তারাই বা এত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভুগতে-ভুগতে ভুক্তভোগী হয়ে দিচ্ছেন কেন? প্রশ্ন থাকল ঐ সকল চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীর কাছে!

আবার তাদেরই কেউ-কেউ কখনো বলে থাকেন যে, দুর্নীতি তথা ঘুষ ঠেকাতে, আইন মানাতে, মানুষকে নৈতিকতায় উন্নীত হতে হবে। আচ্ছা বলুন! ঐ নৈতিকতা বলতে তারা কী বুঝাতে চাচ্ছেন? এ নৈতিকতার বোধশক্তি কিভাবে আসবে! নৈতিকতা কী এমন কোন ফল বা তাদের গড়া এমন কোন জল বা পাগলের প্রলাপের কোন বাণী যা পাওয়া যাবে ঐ সমস্ত উপন্যাসের স্তবকে যা যুব সমাজকে হাসাতে জানে, নাচাতে জানে, জীবনবোধ সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে আবছা-আবছা অন্ধকারে বা রমনার বটমূলে চলো না হারিয়ে যাই এই বলে ঘুরাঘুরি করতে করতে অর্জিত হবে, নাকি এমন এক সত্তার বাণী যে বাণীর প্রত্যেক পরতে-পরতে রয়েছে আকর্ষণ।

এ শেষটিই হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী আল-কুরআনুল কারীম। যার মধ্যেই রয়েছে সেই সঞ্জীবনী শক্তি। যারা আজ দুর্নীতি রোধে নৈতিকতাবোধে উন্নীত হওয়ার কথা বলছেন তাদের সাথে আমিও একমত। পৃথিবীর বুকে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারাণ্টি দিতে পারে এ আল-কুরআন। আর তাই তাদের ও বর্তমানদেরকে আহ্বান জানিয়ে অনুরোধ করে বলব সাহস করে কুরআনের কথা বলে ফেলুন, আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসুন, আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়ন করে দুর্নীতি রোধ ও মানবতার কল্যাণকামী আদর্শ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ার লক্ষ্যে আল-কুরআনুল কারীমের হিদায়াত ও উপদেশ বাণীর সাথে একাত্ম হোন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন :

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"(কুরআন) পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য।" (সূরা আন্-নামল, ২৭ : ২)

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

"এবং নিশ্চয়ই এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা আন্-নামল, ২৭ : ৭৭)

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তা পথনির্দেশ ও দয়া-অনুগ্রহ।" (সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ২০৩)

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

"এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।" (সূরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২০)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ.

"এইগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ০২-০৩)

প্রকৃতপক্ষে মানুষকে আদর্শিক সকল কার্যক্রম থেকে পিছিয়ে পড়া থেকে আদর্শ ও একে অপরের কল্যাণমুখী দিকে ধাবিত করতে পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত কিতাব দুনিয়ার বুকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন তার সবগুলোতেই ছিল হিদায়াতের বাণী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সেই সকল কিতাবের ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন :

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ.

"তিনি (আল্লাহ) সত্যসহ তোমার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন, যা এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল ইতোপূর্বে মানব জাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এবং তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ০৩-০৪)

বিশ্ব মানবতার সরল পথের দিশারী

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে চায়, এ জন্যে তাদের মেধা, চিন্তা-চেতনা, জীবন-যৌবন ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে ভূমিকা রাখতে চায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের শান্তির দিকে পরিচালিত করেন। তাদেরকে সরল পথে দিশা দিয়ে ধন্য করেন। তাদের পুরস্কার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এর (কুরআনের) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে (মুক্তির পথে) পরিচালিত করেন।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ১৬)

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"(যারা কুরআনে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী) তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে (মুক্তির পথে) আছে এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা আল-বাকারা ২: ৫ ও সূরা লুকমান, ৩১ : ০৫)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"এই কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো। সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি রহম-দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা আল-আন'আম, ০৬ : ১৫৫)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমার ভাষ্য ধরে বলা যায়, জমিনে আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গেলে হয়তো বা দুনিয়ার অঙ্গনে কেউ-কেউ বিরোধিতা করবে, এতে পদ হারাতে হতে পারে, দুনিয়ার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর হক পরিপূর্ণকরণে কাজ করলে আল্লাহ অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন দুনিয়ার জীবনে না হলেও আখিরাতের জীবনে তো অবশ্যই।

মানব জাতির মুক্তির সনদ

আল-কুরআনই হচ্ছে পথহারা বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ। সুতরাং আমরা যে পথের অপেক্ষায় আছি সেই পথে যাওয়ার জন্যই প্রয়োজন বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ এ আল-কুরআনকে তাদের কাছে উপস্থাপন এবং আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর হক বাস্তবায়ন করে তা বিপথগামীদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা। তবেই তারা জেগে উঠবে, ফিরে আসবে। জীবনবাজী রেখে তারাও একদিন এ সুন্দর কাজে এগিয়ে এসে ভূমিকা পালন করতে চাইবে। কুরআন বলছে :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ.

"যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এ-ই তাদের প্রতিপালক থেকে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ০২)

সকল জ্ঞানের আধার

আল-কুরআনুল কারীম হলো সকল প্রকার অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর অন্ধকারের জগৎ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে আল্লাহর হক যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রধান উপকরণ। একমাত্র কুরআনিক জ্ঞানই মানুষকে আদর্শের সাথে পথ চলতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর বুকে আদর্শ বলতে যা কিছু বুঝায় তার একমাত্র উৎসস্থল হলো আল-কুরআনুল কারীম। এ কুরআনুল কারীমেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَلاَ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নেই এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَطٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ.

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই এবং নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখি নেই যা তোমাদের মত একটি উম্মাত নয়। কিতাবে (কুরআনে) কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ওদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।" (সূরা আল-আন'আম, ০৬ : ৩৮)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ.

"আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি।" (সূরা আর-রূম, ৩০ : ৫৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

"আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করলাম।" (সূরা আন্-নাহল, ১৬ : ৮৯)

সুতরাং কুরআনিক জ্ঞানে আমাদের জ্ঞানী হতে হবে। আল্লাহর হক ও মানুষের হক পরিপূর্ণকরতঃ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ভাণ্ডারের বিকল্প নেই। এ জ্ঞান ভাণ্ডারে সকলকে এগিয়ে এসে জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়ে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যথায় জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষিত

হয়ে অন্যের হক হরণ তথা ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী হওয়া ছাড়া উপায় নেই– যা আজ দেশ-বিদেশে বহু ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আল-কুরআন চিরন্তন, শাশ্বত ও বিশ্বজনীন আলোকবর্তিকা

বিশ্ব স্রষ্টার পক্ষ থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম হচ্ছে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতির জন্যে আলোকবর্তিকা। দুনিয়ার বুকে আল-কুরআনুল কারীমের মত ইঞ্জিল, যাবুর ও তাওরাত ছিল পর্যায়ক্রমে তৎকালীন জাতির জন্য পথ-নির্দেশ সম্বলিত মহাগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের অনুসরণে আজও বিশ্বের বুকে জাতি-গোষ্ঠী বিদ্যমান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হয়, তাদের সেই মূল গ্রন্থগুলো আজ আর অবিকৃত নেই। আর চিরন্তন শাশ্বত ও বিশ্বজনীন তো হওয়ার কথাই না, কারণ যিনি ঐ গ্রন্থগুলোর রচয়িতা তিনিই তো পর্যায়ক্রমে তাওরাতের পর যাবুর পাঠালে তাওরাতকে রহিত ঘোষণা করেন। তারপর যাবুর কিতাবের ভিত্তিতে মানুষের জীবন পরিচালিত হতে থাকলে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ করেন তখন পূর্বের যাবুর কিতাবকে রহিত করেন। এরপর ইঞ্জিল কিতাব অনুসরণ ও অনুকরণে একটি জাতি-গোষ্ঠী পরিচালিত হলে তিনি সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণে সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত আল-কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেন। সেই সাথে ঘোষণা করেন এরপর আর কোন গ্রন্থই পৃথিবীর পৃষ্ঠে কিয়ামাত পর্যন্ত অবতীর্ণ করা হবে না। কাজেই আল্লাহর ঘোষণা অনুসারেই এ কুরআন হলো চিরন্তন, শাশ্বত ও বিশ্বজনীন আলোকবর্তিকা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ.

"এই সম্মানিত কুরআন (চিরস্থায়ীভাবে) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" (সূরা আল-বুরূজ, ৮৫ : ২১-২২)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

"কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন; যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ০১)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ.

"তাঁর বাণী কুরআন অপরিবর্তনীয় চিরন্তন গ্রন্থ।" (সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ২৭)

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ.

"আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল (সংরক্ষিত ফলক)।" (সূরা আর-রাদ, ১৩ : ৩৯)

هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ.

"এ কুরআন বিশ্ব মানবের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১৩৮)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ইবাদাত পালন ও তাঁর বিধান মেনে নেয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আসে আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্যের কথা। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ.

"আর আমি (আল্লাহ্) রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৬৪)

যারা নবী-রাসূলগণের কথা বিশ্বাস করে না এবং তাদের হক আদায় করে না তারাই হবে পথভ্রষ্ট। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِه كُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا.

"কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৩৬)

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সিদ্ধান্ত পরিষ্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِه وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِه وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً اُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে বিশ্বাস করি না এবং এদের মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারাই কাফির এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আমি প্রস্তুত রেখেছি।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৫০-১৫১)

তারপর অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নিজের আনুগত্যের সাথে নাবী-রাসূলের আনুগত্যও ফারয বা অবশ্যই করণীয় বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১৩২)

قُلْ اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ..... وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا.

"বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর..... আর তোমরা তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৪)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَاتُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৩)

উল্লেখিত আয়াতগুলোর বর্ণনা মতে, আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশের সাথেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করার ঘোষণা এসেছে। এ থেকে খুব সহজে বুঝা যায়, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক অভিন্ন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের হক আদায়ে আমাদেরকে হতে হবে সচেতন, যাতে কোন অবস্থায় তাদের নাফরমানী না হয়। কেননা পৃথিবীর বুকে সচ্চরিত্র ও সুন্দরতম আদর্শের একমাত্র অধিকারী ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ রাসূল সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"আপনি (মুহাম্মাদ সা.) অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল-কালাম, ৬৮ : ০৪)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ২১)

প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য শিক্ষক ও মানবতার কল্যাণকামী প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

"তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১৬৪)

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে নেয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ০৭)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৫৯)

জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকে মেনে নেয়ার নির্দেশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দিয়েছেন কারণ তিনি তাঁর ৬৩ বছরের জীবনে এমন কোন কিছু করেননি, যা আল্লাহ বলেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, বলেছেন সবকিছু আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করেছেন এবং বিন্দুমাত্র সংযোজন বিয়োজন বা কেন করব, এখন না করে পরে করব এমন কথা তিনি কখনো বলেননি। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর আনুগত্য তথা হক পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এও জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন কাজ করেননি– যা মানবতার বিপক্ষে বা মানবতার কল্যাণকামী নয়। আর তাই তো তিনি বিশ্বনবী; বিশ্বের সকল মানুষের হক প্রতিষ্ঠাকারী একজন সফল অগ্রনায়ক। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ মেনে নেয়া, তাঁর চরিত্রের রঙে রঙিন হওয়াই হলো তাঁর হক; তাঁর আনুগত্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ.

"যে ব্যক্তি রাসূলের (মুহাম্মাদ) আনুগত্য করল, বস্তুত সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৮০)

মূলতঃ মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী আল-কুরআনুল কারীম হলো থিওরিটিক্যাল বা সংক্ষিপ্ত আকারে ইঙ্গিত হিসেবে উপস্থাপিত। আর তার প্রাকটিক্যাল বা বাস্তব জীবনধর্মী করে বিস্তারিতভাবে বা তার প্রায়োগিক কাজটি করে দেখিয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-কর্ম, চিন্তা-চেতনাই বাস্তব ধর্ম; সমগ্র উম্মাহর জন্য পালনীয়। এতেই রয়েছে শান্তি।

কাজেই একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত হলো শান্তির অগ্রদূত, শান্তি প্রতিষ্ঠার মহানায়ক কিয়ামাত পর্যন্ত যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবেই থাকবেন সেই বিশ্ব শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মেনে নেয়া এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়া ও পরিচালনা করা। তবেই প্রতিষ্ঠা পাবে শান্তি ; দূর হবে জন-মানবের দুর্গতি।

মানুষের নিজের কাছে নিজের দেহ ও মনের হক

পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানুষকে সকল সৃষ্টির সেরা হিসেবে পরিগণিত করেছে। মানুষকে দিয়েছে নিখিল জগতের উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ.

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঠিক করেছেন, তোমার শক্তি-ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন এবং যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেছেন সেভাবেই তিনি গঠন করেছেন।" (সূরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৬-৮)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন; যখন তোমরা বের হলে, তখন এমন অবস্থায় ছিলে যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, অন্তর দিয়েছেন, যেন তোমরা শোকর করো।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৭৮)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الاَرْضِ.

"(হে মানুষ) তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তার সবই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন?" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৬৫)

এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেমন দুনিয়ার সকল কিছু মু'মিনদের অধীন করে দিয়েছেন তেমনি মু'মিনরাও অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশের কাছে করবে শর্তহীনভাবে মাথা নত। মেনে নেবে আল্লাহর দেয়া সকল বিধান; পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবে সকলের হক বা দাবি। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ..... فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِه وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। ...সুতরাং (আল্লাহর সাথে) তোমরা যে বেচাকেনা করেছো, তার জন্যে সুসংবাদ গ্রহণ করো, প্রকৃতপক্ষে এটাই বড় সাফল্য।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ১১১)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

"লোকদের ভেতর এমন লোকও রয়েছে, যে নিজের জানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিক্রি করে দেয়; আল্লাহ তাঁদের প্রতি স্নেহশীল।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২০৭)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَا وَتَقُوْمُ الَّيْلَ، قُلْتُ بَلى يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে 'আবদুল্লাহ্! আমাকে কি এ খবর প্রদান করা হয়নি যে, তুমি রাতভর 'ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং দিনভর সিয়াম পালন কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি এরূপ করো না, বরং সিয়ামও পালন কর, ইফতারও কর, রাত জেগে 'ইবাদাত কর এবং

নিদ্রাও যাও। তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে। (বুখারী, বিয়ে-শাদী, হা. নং-৪৮২৪, ই.ফা)

সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্যে মানুষকে তার নিজের দেহ ও মনের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত। সম্ভবত এ কথায় অনেকেই বিস্মিত হবে যে, মানুষ আর সবাইকে ছেড়ে তার নিজের দেহ ও মনের উপরই অবিচার করে থাকে বেশি। এ কথাটা অবশ্য বিস্ময়কর। শুধু এটুকু বললে হয়তো বা আমিও মানতে চাইতাম না। কিন্তু আজ যখন গবেষণা করছি তখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষ ভালবাসে তার নিজের সত্তাকে সত্য তবে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিনিয়ত করে থাকে বিভিন্ন রকম দুশমনি।

হারাম খাবার বর্জন

যা কিছু মানুষের শরীরের অনিষ্ট সাধন করে, রোগ-শোকে ভোগায় তা না খাওয়া দেহের হক। মানুষ যখন আল্লাহর দেয়া বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা মুতাবিক হালাল ও পরিমাণ মত খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তখনই মানুষের উপর জেঁকে বসেছে নানা রকম রোগ, নানা কষ্ট ও যন্ত্রণা। কেউ-কেউ হয়তো বা বলতে পারেন কেমন? কিভাবে? তাতো বুঝে আসে না। তাই একটু সহজ করে বলছি। দেখুন, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সাগরের গভীরে যত মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী আর মাটির উপরে আফ্রিকার জঙ্গলসহ বাংলাদেশের সুন্দরবনে বসবাসরত সকল প্রাণীর রোগ হয় আর তাদের চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে হয় সিঙ্গাপুরে কেউ কি এমন কথা কখনো শুনেছেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ এ সকল প্রাণীরা তাদের যা-যা খাদ্য খেতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তারা তা-তা খায়; কখনো অন্যায়ভাবে মাছি যেমন মশাকে খায় না তেমনি তিমি হাঙ্গরকে খেতে চায় না; ফলে গলায়ও আটকায় না এবং তাদের বদহজমও হয় না। রোগ-শোকও হয় না। আরেকটু সাজিয়ে যদি বলি তা হবে এমন– তারা সব সময় আল্লাহর হুকুম মেনে চলে বলেই তাদের জন্য কোন চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে হয় না। এবার কেউ হয়তো বলবেন কেন পশু হাসপাতাল আছে না? হ্যাঁ আমিও মানি আছে কিন্তু তাতো আফ্রিকার আর সুন্দরবনের প্রাণী ও বঙ্গোপসাগরের মাছের জন্য নয়; তাতো হলো আমরা যাদেরকে ধরে এনে গৃহে লালন-পালন করছি আর তাদের খাদ্য প্রণালী আমাদের মত করে সাজিয়েছি তাদের জন্যে।

অন্যদিকে মানুষ আজ আল্লাহর বিধানের বাইরে মদ-গাঁজা আফিম, প্রভৃতি মাদকদ্রব্য, শূকরের গোশত, হিংস্র ও বিষাক্ত জানোয়ারের গোশত, নাপাক জীব-জানোয়ারসহ হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে এত বেশি খায় যে খেতে খেতে গলা পর্যন্ত হয়ে যায়, নড়াচড়া করতে পারে না। পরদিন শোনা যায় যে, বেচারা দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ইসলামের ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি– সাহাবায়ে কিরামের (রা) কখনো এমন অসুখ হয়নি। তাদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করতে হয়েছে এমন শুনি না। কিন্তু তাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন দারুল আরকাম নামে এটি শুনি, জানি। কাজেই বলব, আল্লাহর দেয়া বিধানকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অমান্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকার বাইরে চলে দেহের ও মনের হককে হরণ করা এক ধরনের যুলুম। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শ মেনে শারী'আতসম্মত পন্থায় আদর্শিক জীবন যাপন করার লক্ষ্যে দেহ ও মনকে তাদের দাবি পূরণ করে সতেজ ও উৎফুল্ল রাখা আবশ্যক। তবেই আমরা হব সুস্থ-সুন্দর ও নিরোগ মানুষ।

নাফস বা আত্মার হক

আল-কুরআনুল কারীমে নাফস শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কোথাও একবচনে নাফস, কোথাও নুফূস, আবার কোথাও বহুবচনে আনফুস। নাফস শব্দের অর্থ ব্যক্তি, মন, প্রবৃত্তি ও আত্মা ইত্যাদি।

আরবি অভিধানে নাফস শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে 'লিসানুল আরব ও তাজুল আরূস-এ নাফস শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত-জীবনীশক্তি, রক্ত, শরীর, কুদৃষ্টির উপস্থিতি, আত্মা, আত্মম্ভরিতা, ঘৃণা কামনা ইত্যাদি।

নাফস শব্দের আভিধানিক ব্যবহারে যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হলো–

প্রথমতঃ মহান আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত নাফস দ্বারা আত্মা বা জীবনী শক্তি বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের সাথে সম্পর্কিত হলে নাফস ও রূহ একই অর্থে অথবা নাফস দ্বারা মন এবং রূহ দ্বারা প্রাণ বুঝায়।

আল-কুরআনুল কারীমে নাফস শব্দটি আত্মা হিসেবে তিনটি রূপে বিদ্যমান।

০১. নাফসে আম্মারা (نفس امارة) : আম্মারা শব্দের অর্থ প্ররোচক। নাফসে আম্মারা হল ঐ নাফস, যা মানুষকে খারাপ কাজের প্রতি প্ররোচনা দেয় এবং কেউ খারাপ কাজ করে ফেললে সে ব্যথিত না হয়ে বরং আনন্দিত ও উৎফুল্ল

হয়। অর্থাৎ এটি অসৎ কাজের আদেশ দানকারী, প্ররোচনাদাতা আত্মা বা প্রবৃত্তি। মানুষের মনে এবং জীবনে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কু-চিন্তা, কু-ধারণা, কু-কর্ম করার কামনা-বাসনা আসে তা এ নাফসে আম্মারার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত খারাপ পরিবেশ বা খারাপ সংগের সাথে মিশে একটা, দু'টা করে খারাপ কাজ করতে-করতে মানুষ এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলে। এতে শরীর ও দেহের পজিটিভ হক যে উপেক্ষিত হয় শুধু তাই নয় এ নাফসে আম্মারা মানুষকে সকল প্রকার হক আদায় করা থেকে দূরে রেখে অমানুষে পরিণত করে তোলে।

০২. নাফসে লাওয়ামা (نفس لوامة) : নাফসে লাওয়ামার পর্যায়ে নাফস খারাপ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, বরং বিকর্ষিত হয়। যদি নাফসে আম্মারার কারণে কোন খারাপ কাজ করেই ফেলে তখন সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এটি মন্দ কাজের প্রতি তিরস্কারকারী আত্মা। আত্মার এ অংশটি মানুষকে খারাপী থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এখানে লাওয়ামা কথার অর্থই তিরস্কার কারী।

০৩. নাফসে মুতমাইন্না (نفس مطمئنة) : প্রশান্ত আত্মা, ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী আত্মা। এজন্যে নাফসে মুতমাইন্নার দাবি হচ্ছে মানুষের দেহ ও মনকে সকল প্রকার খারাপী তথা অনৈসলামিক কার্যকলাপ, ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত রাখা এবং সব সময় ভাল এবং ইসলাম সমর্থিত কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

মূলতঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকে রূহ বা আত্মার যথাযথ হিফাযত করার লক্ষ্যে নাফসে আম্মারার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়। এ আত্মা সব সময় মানুষকে খারাপের দিকে ধাবিত করতে চায়। এর মধ্যেই পশু সমচরিত্র বিদ্যমান। এখানে মানুষকে প্রতিনিয়ত সৎ চিন্তা-চেতনা দ্বারা অসৎ কর্ম ত্যাগ করার মন-মানসিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করাই হচ্ছে নাফসে মুতমাইন্নার হক বা দাবি। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে নাফসে আম্মারার দাস না হয়ে উত্তম কাজ ও চিন্তার প্রতিফলনের দিকে এগিয়ে আসার লক্ষ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন :

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে, তারপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৭-৩০)

সুস্থ দেহ, সুন্দর মন

সুস্থ শরীর সুন্দর মনের পূর্বশর্ত। শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে কোন কিছুতে মন বসে না, মনোযোগ দেয়া যায় না। কথায় বলে "স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।" একথা প্রমাণিত যে শরীর সুস্থ না হলে কোন কাজই করা যায় না, কোনভাবেই সুখী হওয়া যায় না। অসুস্থ শরীরে আল্লাহর হুকুম তথা 'ইবাদাত করা যায় না। সুতরাং সুস্থ শরীর ও উৎফুল্ল মনের জন্য দেহের নিজস্ব দাবির বাইরে কোন কাজ করা যাবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ঢেকুর তুলল। তিনি বলেন, আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর বন্ধ কর। কেননা দুনিয়াতে যারা বেশি পরিতৃপ্ত হবে, কিয়ামাতের দিন তারাই সবচাইতে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, হা. নং-২৪২০, বিআইসি)

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى لا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلّٰى.

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।" (সূরা আল-আলা, ৯৬ : ১৪-১৫)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।" (সূরা আশ্-শামস, ৯১ : ০৯-১০)

আত্মহত্যা

মানব দেহ; দেহের এই প্রাণ; নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে আমানাত। আমানাত আরবি শব্দ। এর অর্থ কোন বিষয়ে কারো উপর নির্ভর করা বা আস্থা পোষণ করা। এই প্রকার আস্থা ও নির্ভরতার বিষয়টি যেখানেই পাওয়া যাবে, তা-ই আমানাত এর আওতাভুক্ত হবে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে এমন অনেক বিষয় আমানাতের আওতাভুক্ত হয়ে যায়; যার সঙ্গে আমানাতের সম্পৃক্ততার বিষয়টি আমরা ঘুণাক্ষরেও ভাবি না। আর সে তালিকায় শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে আমাদের এ পার্থিব জীবন। মানুষ এ পার্থিব জীবনের হিফাযাতকারী মাত্র। এবার এ হিফাযাত যারা সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে করবে, স্রষ্টার নিয়ম

অনুসারে করবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানাতদার হিসেবে পুরস্কার তথা চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّموتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ ط إِنَّه كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً.

"আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানাত পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হলো কিন্তু মানুষ তা বহন করল, সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭২)

অন্যদিকে মনে রাখতে হবে আমাদের ভ্রু যুগলের নিচে যেই অমূল্য সম্পদ দু'টি চক্ষু স্থাপিত আছে, দু'টি হাত, দু'টি পা দেহের শক্তি-সামর্থ্য কিছুই তো আমার বা দুনিয়ার কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। এগুলো মহান আল্লাহর কাছ থেকেই পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এত সুন্দর করে তৈরি করে যেমন জীবন দিয়েছেন তেমনি জীবন যাপনের পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সময় ও শক্তি-সামর্থ্য কীভাবে ব্যবহার করত হবে তার কিছু নিয়ম-নীতিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমাদের কাছে গচ্ছিত আল্লাহর এই অমূল্য সম্পদগুলোর ব্যবহার আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই করতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা আমানাতদার ও বিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হবো। এবার আত্মহত্যা প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَه يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ.

"যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দেবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিধিয়ে শাস্তি দেবে।" (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, হা. নং-১২৭৪, আ.প্র.)

মানুষের কাছে মানুষের হক (মানবাধিকার)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক

জীবনের ৬৩ টি বছর বিশেষত ২৩ বছরে দুর্ধর্ষ আরব জাতিকে আদর্শ জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত করে তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বে অধিকারহারা মাখলুকের অধিকার সংরক্ষণ এবং প্রতিষ্ঠায়

যে অপরিসীম শ্রম ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন তাঁর বিকল্প আর কেউ নেই। আর পৃথিবীতে আসবেও না।

কাজেই এমন যে নেতা, যে শিক্ষক, যে সেনাপতি, যে নবী ও রাসূল, আমরা আজ কিভাবে তাঁর প্রদর্শিত পথ লঙ্ঘন করতে পারি? আর তারপরও যারা করবে তাদের কি তিনি ক্ষমা করতে পারেন? তাদের কাছে কি তিনি জবাবদিহি চাইতে পারেন না? তাদেরকে কি কাল হাশরের মাঠে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন না একজন শিক্ষক হিসেবে, যে আমি তো তোমাদেরকে এমন শিক্ষা দেইনি অথচ তোমরা কেন এমন পথে চললে? কেন এমনটি করলে? আমি কি তোমাদেরকে কিভাবে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাবে তা বলিনি?

কেন তোমরা আমাকে অপমানিত করলে? তোমরা তো জানতে আমার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহও তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

"আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ– যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৬৯)

مَآ اَصَابَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا. مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

"কল্যাণ যা তোমাদের হয় তা আল্লাহর নিকট থেকে এবং অকল্যাণ যা তোমার হয় তা তোমার নিজের কারণে এবং তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৭৯-৮০)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৯২)

পিতা-মাতার কাছে সন্তানের হক

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম নেয়ামত। নারীদেরকে মায়ের মর্যাদার আসনে আসীন হওয়ার একমাত্র মাধ্যম। আর পুরুষদেরও পিতা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে সমাজে পরিচিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। এ সন্তান পুত্র কি কন্যা তা বিচার্য নয়, এতে মা-বাবার কারোর কোন হাত নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ফায়সালায় হয়ে থাকে। তবে মা-বাবা যদি নেককার তাকওয়াবান, হকের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত ঈমানের অধিকারী হন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে নেককার ও বরকতময় সন্তান লাভ করবেন। যারা হবে আদর্শ সচ্চরিত্রবান নেককার ও তাকওয়াবান।

সন্তানের জন্ম-পূর্ববর্তী হক

❖ মা-বাবা উভয়ে হালাল খাবার খাবেন।
❖ দু'জনেই খুব বেশি-বেশি নেক 'আমল করবেন। আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করবেন।
❖ উত্তম নিয়াত করবেন।
❖ মহিলা ডাক্তার দ্বারা রীতিমত চেকআপ করাবেন।
❖ গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, আত্ম-অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অসুন্দর বা মন্দ কথা বলা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

সন্তানের জন্ম-পরবর্তী হক

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের হক

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে-সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কর্ণ কুহরে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম। তারপর যা করণীয় তা হলো :

নবজাতকের কানে আযানের শব্দমালা উচ্চারণ করা : নবজাতক সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান বলা সুন্নাত।

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফে (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু রাফে) বলেন, ফাতিমা (রা) হাসান ইবন 'আলী (রা)কে প্রসব করলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাসানের কানে নামাযের আযানের

অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল আদাহী, হা. নং-১৪৫৮, বিআইসি)

তাহনীক করা : সামান্য খেজুর বা মধু কিংবা অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে শিশুকে মুখের লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা মুখের ভেতর জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দেয়া এবং কোন বুযুর্গ আলিমকে দিয়ে দু'আ পড়ানো সুন্নাত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيْرًا لَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِيْ فِيْهِ فَلاَكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِيْ فِيْهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা আনসারীর পুত্র 'আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কম্বল গায়ে তাঁর উটের শরীরে তেল মাখছিলেন। তিনি বললেন : তোমার কাছে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাঁকে কয়েকটা খেজুর দিলাম। তিনি সেগুলো মুখে দিয়ে চিবালেন। অতঃপর বাচ্চার মুখে তা দেন। বাচ্চা তা চুষতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আনসারগণ খেজুর পছন্দ করে। তিনি ঐ বাচ্চার নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৪৪৯, বিআইসি)

দুধপান করানো : সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হলো মায়ের দুধ। এটি ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শিশুর যা প্রয়োজন তার সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। আজকাল আমাদের মুহতারামা মায়েরা অনেক খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে শিশুকে এ দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন। অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয় মায়ের দ্বারা সন্তানের হক হরণ। অথচ একটু চিন্তা করা উচিত– মায়ের স্তনে এ দুধ কে দিল? কেন দিল? কেন এ সময়ে দিল? কেন মায়ের স্তনে অন্য সময়ে দুধ আসে না ইত্যাদি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, এমন মায়েদের আচরণে লঙ্ঘিত হচ্ছে :

- ❖ সন্তানের হক।
- ❖ মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার আদেশ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

"যে দুধ পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৩৩)

এবার এর ফলে কী সমস্যা হচ্ছে দেখুন :

এক. মায়েরা আল্লাহর আদালতে আসামী হয়ে যাচ্ছে।

দুই. এতে এ সকল মা সন্তানদের কাছে যেমন মর্যাদা ও সম্মান পাওয়ার কথা তা পায় না।

তিন. মেডিকেল সাইন্স পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যে সমস্ত মা স্তনের দুধ সন্তানদের পান করাতে চান না, তাদের দুধ জমে থাকতে-থাকতে তা একসময় শক্ত হয়ে স্তন ক্যান্সারের দিকে ঝুঁকে যায়। এভাবেই স্তন ক্যান্সারের রোগী দিন-দিন বাড়ছে।

চার. সন্তানদেরকে বুকের দুধ পান না করিয়ে পশুর দুধ বা গুড়োজাত টিনের দুধ পান করানোর ফলে সন্তানদের চিন্তা-চেতনা, অভ্যাস ও কর্মে ঐ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে সন্তানরা মায়ের প্রতি বেশি শ্রদ্ধা-ভালবাসা পোষণ করার চাইতে ঐ পশুজাত প্রাণী বা টিনের কৌটার প্রতি বেশি মহব্বত করে থাকে– যা দুঃখজনক। অবশ্য যে সমস্ত মায়েরা সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় না, সন্তানদের কোলে নিতে চায় না, তাদের কপালে চুমো দেয় না, তাদের সাথে সব সময় সুন্দর করে কথা বলে না, কোথাও কোথাও দেখা যায় সন্তানদেরকে চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে আর কোলে কুকুর, খরগোশ বা ইঁদুরের ছানাকে নিয়ে হাঁটে বা বসে থাকে, এক কথায় তাদের হক পরিপূর্ণ করে না; সে সমস্ত পরিবারের সন্তানেরা তাদের মায়েদেরকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না, মায়ের মর্যাদা দিতে চায় না, তাদের মা-বাবারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে থেকে অপমানিত-লাঞ্ছিত হয়ে জীবন ধারণ করছে।

আশার কথা হচ্ছে, সেই সমস্ত সন্তান আবার মায়েদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা পোষণের জন্য ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটি দিনকে বেছে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কারণ মা বলে কথা। আর সেই দিনটি হলো ১৫ মে মা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এ দিবসটি কতিপয় নামধারী মায়েদের জন্য হয়তো বা সুফল বয়ে এনে থাকে। তবে মূল কথা হলো, আদর্শ সন্তানদের জীবনে আদর্শ মায়ের প্রতি এমন দিবসবদ্ধ ভালবাসা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন আছে কি? আমরা আমাদের মাকে সব সময়ই ভালবাসি; শ্রদ্ধা করি। আর মায়েদের নসীহত

ও দু'আ আমাদের জীবনের জন্য সব সময়ই আদর্শ পথে পরিচালনার পাথেয়, এটিই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পাঁচ. শিশু জন্মের পর পরই পূর্বের বর্ণিত হকগুলো পূর্ণ করে মায়ের স্তন ধৌত করে অযু অবস্থায় বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক এবং পরে বাম দিকের স্তনের দুধ পান করানো উত্তম। আজকাল কোন কোন শিশু সদন, মাতৃসদন ও ক্লিনিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানকে মায়ের থেকে পৃথক রাখা হয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর-পর কোন হকই পরিপূর্ণভাবে পালন করা হয় না, যা একেবারেই অনুচিত।

অন্যদিকে নবজাতক শিশু হারানো, শিশু অদল-বদল (একজনের কন্যা সন্তানকে অন্য জনের পুত্র সন্তানের সাথে বদল, একজনের জীবিত সন্তানকে অন্যের মৃত সন্তানের সাথে বদল– যা অমানুষিক ও অনাদর্শিক) ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা কিছুটা হলেও এতে রহিত হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মাফ করুন, যদি কোন মায়ের বুকে দুধ না থাকে বা মা সন্তান প্রসবে মৃত্যুবরণ করে থাকেন বা বেশি অসুস্থ হয়ে যাওয়াসহ অন্য কোন শরয়ী কারণেই কেবল সন্তানদেরকে অন্য কোন সতী সাধ্বী আদর্শবান মহিলার বুকের দুধ পান করানো যাবে। এখানে আদর্শবান মহিলার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে সে পরবর্তীতে ঐ শিশুর কাছে দুধ মায়ের মর্যাদা পাবার যোগ্য। তাছাড়া দুধের প্রভাবে ঐ মহিলার খাসলত ও চিন্তা-চেতনার প্রভাবও দুধ পানকারী সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত হবে; সে জন্যেই এদিকে খেয়াল রাখার প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ তাকিদ প্রদান করেছেন।

কিন্তু তারপরও দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যবস্থাও যদি না করা যায় তাহলে শিশুকে অন্য পশু যেমন ছাগল ও গাভীর দুধ, টিনজাত গুঁড়োদুধ পান করাবে আর আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে সন্তান আদর্শবান হোক সে জন্যে দু'আ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছু দেখনেওয়ালা এবং রহমত দেনেওয়ালা।

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের হক

সপ্তম দিনে পিতা-মাতার কাছে নবজাতক সন্তানের হক তিনটি। যথা :

০১. উত্তম নাম রাখা : সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক তাদের ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা বাঞ্ছনীয়। এটি পিতা-মাতার কাছে সন্তানের হক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَاءِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ.

কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে– তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও পিতার নামসহ। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে। (আবু দাউদ, হা. নং-৪৮৬৪, ই.ফা)

اَحَبُّ الاَسْمَاءِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় নাম হলো– 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুর রহমান। (আবু দাউদ, আদব, হা. নং-৪৮৬৫, ই.ফা)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসাসূচক নামগুলোর আগে 'আবদ' শব্দ যোগ করে নাম রাখবে। যেমন ঃ আল্লাহ থেকে 'আবদুল্লাহ, আর রাহমান থেকে 'আবদুর রহমান, আর রাহীম থেকে 'আবদুর রাহীম, আল মালিক থেকে 'আবদুল মালিক, আল ওয়াদুদ থেকে 'আবদুল ওয়াদুদ, আল মাজীদ থেকে 'আবদুল মাজীদ, আল কুদ্দুস থেকে 'আবদুল কুদ্দুস, আল হামীদ থেকে 'আবদুল হামীদ, আস-সালাম থেকে 'আবদুস সালাম, আল হাই থেকে 'আবদুল হাই, আল আযীম থেকে 'আবদুল আযীম, আছ ছামাদ থেকে 'আবদুছ ছামাদ, আল জাব্বার থেকে 'আবদুল জাব্বার, আর রউফ থেকে 'আবদুর রউফ, আল খালেক থেকে 'আবদুল খালেক, আল হাদী থেকে 'আবদুল হাদী, আল বারী থেকে 'আবদুল বারী, আল বাকী থেকে 'আবদুল বাকী, আল গাফফার থেকে 'আবদুল গাফফার, আল ওয়াহহাব থেকে 'আবদুল ওয়াহাব, আর রাযযাক থেকে 'আবদুর রাযযাক, আল লতীফ থেকে 'আবদুল লতীফ, আল গফুর থেকে 'আবদুল গফুর, আশ শাকূর থেকে 'আবদুশ শাকূর, আল হাকীম থেকে 'আবদুল হাকীম, আল জলীল থেকে 'আবদুল জলীল এবং আল কারীম থেকে 'আবদুল কারীম নাম রাখা যায়।

পয়গাম্বরদের নামে নাম রাখতে চাইলে সেগুলো হলো : আদম, ইদরীস, সালিহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ, শু'আইব, আইউব, মূসা, হারূন, দাঊদ, সুলাইমান, ইলিয়াস, ইউনুস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পয়গাম্বর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ নবীর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলো রাখা যায়। যেমন ঃ মাহমুদ, আহমাদ, হামেদ, কাসেম, রশীদ, বশীর, হাদ, মুনীর, মুযযাম্মিল, মুদ্দাচ্ছির, শফী, খলীল, হাবীব, মুস্তাফা, মুরতাযা, মুখতার, হাফেয, মনছুর, শহীদ, হাকীম, বুরহান, আযীয, রউফ, রহীম।

সাহাবায়ে কিরামের নাম অনুসারে হতে পারে। যেমন ঃ আনাস, আসলাম, বেলাল, ছাওবান, জাফর, জারীর, হামযা, হুযাইফা, হারেছ, যুবায়ের, সাদ, সায়ীদ, সাহল, তালহা, তারেক, নু'মান, হেলাল।

কন্যা সন্তানের নাম হতে পারে ঃ হাফছা, হালীমা, হামীদা, হাবীবা, হাসিনা, হাজেরা, হুমাইরা, খাদীজা, আছমা, আয়িশা, আমিনা, আনীসা, আরিফা, আযরা, রশীদা, রফীয়া, রাশীদা, রাইহানা, ফারহানা, রুকাইয়া, ফিরোজা, ফরিদা, যায়নাব, যুবায়দা, যাহরা, যিবুন্নেসা, সালমা, সাদিয়া, সলীমা, সওদা, সকীনা, সাফিয়্যা, মাহমূদা, মাইমুনা, মাজেদা, মারইয়াম, মুনিয়া, কারীমা, কাসেমা, কুদসিয়া, জামিলা, জুয়াইরিয়া, ছফিয়্যা, ছাগীরা, ছালেহা, ছাদেকা, ছাবিহা, ছাবেরা, লুবাবা, লুবনা, তাহিরা, তাইয়েবা, উম্মে হাবীবা, উম্মে কুলছুম, উম্মে হানী, উম্মে সালমা, শাকিরা, শাহিদা, শামীমা, ওবায়দা, বিলকিস, বিরজিস, নায়ীমা, নাফীসা, নাছিরা, নাদেরা, নূরুন্নেসা, ফাহমিদা, ফরিদা ইয়াসমীন।[১]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সন্তানের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত করে দিলে নামের দ্বৈতকরণের সমস্যা এড়ানো সম্ভব। যেমন : জারীর মুহাম্মাদ ইবন জাবেদ। জাবীন বিনতে জাবেদ।

০২. মাথার চুল বা কেশ মুণ্ডন : সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে (মুণ্ডন) দেয়া শিশুর হক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِحْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَّنْتُهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا اَوْبَعْضَ دِرْهَمٍ.

'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেন : হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা দান-খয়রাত কর। তদনুযায়ী আমি তার চুল ওজন দিলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল আদাহী, হা. নং-১৪৬১, বিআইসি)

০৩. আকীকা : নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি বরকী অথবা ভেড়া আর কন্যা হলে একটি খাসী অথবা ভেড়া তার পক্ষ থেকে যবেহ করা উত্তম। আকীকা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

---

১. এখানে কয়েকটি নাম মাত্র উল্লেখ করা হলো। এর বাইরেও অনেক সুন্দর অর্থবোধক নাম আছে। জ্ঞানী আলিম ও পাড়ায়-পাড়ায় মাসজিদের মুহতারাম ইমাম সাহেবের কাছ থেকে অর্থ জেনে বা বাজারে বর্তমানে মুসলিমের নাম সম্বলিত অনেক বই পাওয়া যায় সেগুলো থেকে সুন্দর অর্থবোধক নাম নির্বাচন করা হলে পিতা-মাতার কাছে সন্তানের এ হক পরিপূর্ণ হতে পারে।

اَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী আকীকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল আদাহী, হা. নং-১৪৫৫, বিআইসি)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কোন মা-বাবার যদি আর্থিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে ছেলের জন্যও একটি বকরী বা ভেড়া আকীকা করা যাবে। (দুররে মুখতার)

আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করা ঃ পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, গবেষক ও দার্শনিক একমত যে, সন্তানের জন্য প্রধান ও প্রথম শিক্ষক হলেন মা, তারপর বাবা। সন্তানের প্রথম শিক্ষাঙ্গন বাসা-বাড়ি। আর প্রথম শিক্ষা হবে "আল্লাহ" শব্দটি। এ আল্লাহ নামটি ডাকতে-ডাকতে পরবর্তীতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও পিতা-মাতা ও অন্য শব্দ শিক্ষা দেয়া উত্তম। এখানে বলে রাখা ভাল, যে পিতা-মাতা নিজে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত, রীতিমত কুরআন-হাদীস পাঠ করেন, তাঁদের জন্য সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা দেয়া অত্যন্ত সহজ। এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতা মাত্রই জানেন সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা প্রদান– এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ, আর সন্তানের হক। সুতরাং তা অবশ্যই পালনীয়।

মূলতঃ এখানে এ আলোচনা তাদের জন্যে, যারা জানে না বা অল্প জানে কিন্তু মানে না বা কিভাবে বাস্তবায়ন করবে, কী আগে শিখাব তা জানে না তাদের জন্যে। তাছাড়া পিতা-মাতারা সন্তানের শিক্ষা কী হবে না হবে তা না জানার পেছনে দায়ী শুধু তারাই নয়; দায়ী আমাদের অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা, অনৈসলামী ছাঁচে গড়া লর্ড মেকলে কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা নীতি।

অন্যদিকে যাদের অনৈসলামিক গ্রন্থ, হাসি-ঠাট্টা, প্রেম-ভালবাসা, রাগ-ঢাক, ঝাল-টক ইত্যাদি সম্বলিত লেখা উপন্যাস পড়ার অভ্যাস (অবশ্যই মন্দ অভ্যাস) গড়ে উঠেছে তারা অন্ততপক্ষে পিতা-মাতা হতে যাচ্ছেন এমন সময় থেকে আর এ সমস্ত গ্রন্থ পড়া বা বাসায় সংরক্ষণ করা ঠিক নয়। তাহলে আপনাদের মর্যাদা ভূলণ্ঠিত হবে। আপনারা সন্তানের কাছ থেকে শতভাগ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন না, হতে পারেন না। এ পরিস্থিতিতে আপনারা যেমন সন্তানের হক আদায়করণে ব্যর্থ হলেন তেমনি সন্তানরাও আপনাদের হক আদায়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেই হয়তো বা হবে ব্যর্থ।

কাজেই, পিতা-মাতা ও সন্তান সকলকেই হতে হবে ইসলামী আদর্শের প্রতীক, আদর্শের ধারক-বাহক, আদর্শ ও সচ্চরিত্র গঠনকারী। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পিতা-মাতাকে লক্ষ্য করে আদেশ দেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হলো মানুষ ও পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬ : ০৬)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ আদেশ পালনে আমাদের পিতা-মাতাদের অবশ্যই উচিত সন্তানরা ছোট থাকতেই তাদের ধর্মীয় বিধি বিধান, রীতি-নীতি, সচ্চরিত্র গঠন, আদব-কায়দা ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট হওয়া। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرَةٍ.

সাত বছর বয়সে বালকদের নামায শিখাও এবং দশ বছরে পদার্পণ করলে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে দৈহিক শাস্তি দাও। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, হা. নং-৩৮২, বিআইসি)

একবার শেখ সাদী (র)-এর নিকট তাঁর ভক্তরা জিজ্ঞাসা করলো, কিভাবে সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত! তিনি বললেন–

- ❖ শিশুর বয়স দশ বছরের বেশি হলে তাকে গায়রে মাহরাম এবং অন্যান্যের সাথে মিশতে দেবে না।
- ❖ যদি তোমাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে চাও, তবে সন্তানকে সদাচরণ শিক্ষা দেবে।
- ❖ যদি শিশুকে ভালবাস; তবে তাকে অতিরিক্ত সোহাগ করবে না।
- ❖ শিশুকে শিক্ষকের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তা শিক্ষা দাও।
- ❖ শিশুর প্রয়োজনীয় চাহিদা নিজেই পূরণ কর এবং তাকে এমনভাবে প্রতিপালন কর, যাতে অন্যান্যের অনুকরণ করার সুযোগ না পায়।
- ❖ প্রথম-প্রথম শিশুকে পড়ানোর সময় তার প্রশংসা করে ও সাহস দিয়ে উৎসাহ প্রদান কর। যখন সে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হয়ে যাবে, তখন ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা কর এবং প্রয়োজন হলে কঠোরতা অবলম্বন কর।
- ❖ সন্তানকে কৌশল শিক্ষা দাও। যদি সে কৌশলী হতে পারে, তবে দুর্দিনে অপরের কাছে হাত না পেতে জীবিকা উপার্জন করবে।
- ❖ সন্তানের প্রতি কড়া নজর রাখবে, যাতে সে মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে মিশতে না পারে।

প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত অর্থে শুধু লালন-পালন করাই পিতা-মাতার কর্তব্য নয়; বরং

এমনভাবে লালন-পালন করা যাতে সন্তান উত্তম জীবন যাপন করতে পারে এবং পরকালেও যেন সুন্দর জীবন লাভ করতে পারে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অনেক পিতা-মাতা এমন আছেন যারা শুধু সন্তানকে পার্থিব উন্নতির চেষ্টায় রত থাকেন। অথচ প্রত্যেক মানব সন্তানকেই এ পার্থিব জগৎ ছেড়ে এমন এক চিরন্তন জগতে প্রবেশ করতে হবে, যার কোন শেষ নেই। তাই সন্তানকে যদি এজন্য প্রস্তুত করা না হয়, তবে তার ব্যাপারে এর চেয়ে বড় উদাসীনতা আর কিছুই হবে না। সন্তানকে উত্তম খাবার খাওয়ানো, উত্তম পোশাক পরিধান করানো এবং উঁচু স্তরের স্কুল-কলেজে ভর্তি করানোর চেয়ে তার চরিত্র ও ব্যবহার যাতে উত্তম হয়, সেজন্য বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

উত্তম নসীহত প্রদান : সন্তানের জীবদ্দশায় সচ্চরিত্র গঠন, আদর্শ শিক্ষা অর্জন, দীনী হুকুম-আহকামভিত্তিক খাসলত গঠনের লক্ষ্যে উত্তম নসীহত প্রাপ্তি সন্তানের হক। আসলে এ হক জগতের প্রত্যেক পিতা-মাতাই পালন করতে চেষ্টা করেন। তবে কোথাও-কোথাও শুনা যায় বা দেখা যায়, পিতা-মাতা সন্তানদেরকে যা বলল সন্তানরা তা সাথে সাথে না মানায় বা তখন মেনেছে কিন্তু এখন মনে নেই বা অন্যমনস্ক হয়ে আর মানছে না (যদিও এটি দুঃখজনক) এ অবস্থা দেখে পিতা-মাতারা রাগ করেন আর বলেন– এখন আর বলতে পারব না। এত বলতে হবে কেন? এখন বয়স হয়েছে না, বড় হয়েছে না, নিজে বুঝে না অথবা বকা দিল বেয়াদব, বদমায়েশ, অসভ্য, যা এখান থেকে বেরিয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা, আর আসবি না ইত্যাদি।

এখানে এ কথাগুলো বলা কেমন তা আমার ভাষায় না বলে পবিত্র কুরআন থেকে উল্লেখ করছি :

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সালাত কায়েম করার কথা বার বার বলেছেন। একবার দু'বার নয়। যদি আল্লাহ একবার দু'বার বলে রাগ করতেন, আর না বলতেন আমাদের মত বকাবকি করতেন তাহলে না হয় ভাবতাম আপনাদের নীতি ঠিক আছে; কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন বার বার। তবু রাগ করেননি। তারপরও যখন আমরা ঠিকমত আদায় করি না ঐ রকমভাবে তো তিনি বকা দেন না, এ দুনিয়া থেকে বের হয়ে যেতে তো বলেন না, আলো-বাতাস থেকে তো এক মিনিটের জন্য; এক সেকেন্ডের জন্যও বিচ্ছিন্ন করেন না। সুতরাং, এ বিষয়টি মাথায় রেখে সন্তানদেরকে বার-বার শতবার বলুন, যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তম দিকে ফিরে না আসবে, আর যতক্ষণ আপনারা বেঁচে আছেন ততক্ষণ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নরম সুরে সুন্দর-সুন্দর ভাষায় বার-বার বলুন।

ইনশাআল্লাহ্ একদিন মেনে নেবে। এতেই হবে আপনাদের বলার সার্থকতা।

কন্যা সন্তানের হক

সন্তান ছেলে হোক আর কন্যা হোক সন্তান সন্তানই। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। এতে কোন মানুষের হাত নেই। তবু যারা কন্যা হলে মন খারাপ করেন, ভ্রু কুঞ্চিত করেন, স্ত্রীকে বকাবকি করেন তাদের লক্ষ্য করা উচিত, যাদের সন্তান নেই, যাদের মা-বাবা হওয়ার মত সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'আলা দেননি অথবা দিয়েছিলেন আবার নিয়েও গেছেন সেই সকল মানুষগুলো সন্তান-সন্তান বলে কী না করছে! যদি আপনজনদের মধ্যে কেউ থাকেন তাহলে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

কাজেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলেই হয়তো বা একের পর দুই, দুয়ের পর তিন এভাবে কয়েকজন কন্যা সন্তান দান করেছেন। এতে কন্যার বাবাদের মন খারাপ হলেও আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করে দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে মহাপুরস্কার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَاَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিলে, তারা কিয়ামাতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে। (সুনান ইবন মাজাহ্, শিষ্টাচার, হা. নং-৩৬৬৯, আ.প্র.)

مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرَكُ لَه اِبْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ اَوْ صَحِبَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

কোন ব্যক্তির দুইটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (সুনানু ইবনু মাজাহ্, শিষ্টাচার, হা. নং-৩৬০৭, আ.প্র.)

পর্দা ব্যবহারে অভ্যস্তকরণ

পর্দা ব্যবহার করে মুসলিম কন্যা এবং নারীরা চলাফেরা করবে। পড়ালেখা করতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, কর্মস্থলে যাবে– এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম। এ হুকুম পালনে যারা গাফলতি করবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার যত হুকুমই মেনে চলুক না কেন এ দোষে দোষী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়ে

যাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْآ اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"(হে নবী!) মু'মিন মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন চোখ নিচু রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং তাদের সাজ-সজ্জা যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐটুকু ছাড়া, যা আপনা-আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের বুকের উপর তাদের উড়নার আঁচল দিয়ে রাখে। তারা যেন তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে তাদের সামনে ছাড়া– তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা, নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ, যাদের কোন চাহিদা নেই এবং এমন অবোধ বালক, যারা মহিলাদের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না। তারা যেন তাদের গোপনীয় সাজ-সজ্জা লোকদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যে মাটির উপর জোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে"। (সূরা আন্-নূর, ২৪ : ৩১)

আদর্শ সমাজ গঠনে, অপ্রত্যাশিত সকল ধরনের অপকর্ম, অন্যায় আচরণ, এসিড নিক্ষেপ, কাপড় ধরে টানাটানি, অন্ধকারে, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপহরণ নীতি, ধর্ষণ আর হত্যা মারামারি ইত্যাদি মুক্ত একটি সুন্দর পরিবেশ বর্তমান ও অনাগতদের উপহার দেয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছে কন্যা সন্তানের একটি অন্যতম হক হচ্ছে তাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে পর্দার ব্যবস্থা করে দেয়া। এতে পারিবারিক বন্ধন যেমন সুদৃঢ় হবে, তেমনি মর্যাদা বাড়বে কন্যা-নারীদের। সংরক্ষিত হবে উভয়পক্ষের চরিত্র। বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পিতা-মাতাদেরকে করবেন পুরস্কৃত।

বিয়ের ব্যাপারে কন্যার মতামত দেয়ার স্বাধীনতা

নারীর জীবনে বিয়ের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর নেই। বিয়ে হলো

সামাজিক অনাচার থেকে মুক্তি এবং যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীদের সচ্চরিত্র গঠনের মাধ্যম। এ বিয়ের মাধ্যমেই এক প্রান্তের নারীর সাথে অন্য প্রান্তের পুরুষের একীভূত হওয়া এবং তাদের মিলনেই আসতে পারে নতুন মানুষ। কাজেই জীবনের একটা বড় সময় ধরে যেহেতু তারা দু'জন একত্রে সবকিছু করবে সেহেতু দু'জনেরই চাই চিন্তা ও মতাদর্শগত মিল। এ কারণেই ইসলামী শারী'আহ তাদের মাঝে Equality বা সমতার শর্ত আরোপ করেছে। একে অপরকে নির্বাচন করবে তার মতের ও মনের সাথে মিলিয়ে; ইসলাম তাদেরকে এ রকম পছন্দ বা মতামত প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। কেননা একে অপরের পছন্দ তোয়াক্কা না করে জোর করে বিবাহ দিলে সেখানে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এটা একদিন দু'দিনের সম্পর্ক নয়। একটা জামা নয় যে পছন্দ হয় না ফেলে দিলাম। এটা দীর্ঘদিনের সম্পর্ক।

আজকাল অভিভাবকদের কেউ কেউ নিছক বৈষয়িক দিক বিবেচনা করে পাত্র/পাত্রী নিজেরাই নির্বাচন করে ফেলেন; তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কাই করেন না।

সমাজের এ অবস্থার নিরসন ঘটানোর জন্যেই ইসলাম নারীকে তার মতামত প্রকাশের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুমারী তো (সম্মতি প্রকাশে) লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার সম্মতি। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হা.নং-৪৭৫৮, আ.প্র.)

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ (خِذَامٍ) الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

খানসা বিনতে খিদাম (খিযাম) আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহ দেন, তিনি ছিলেন সায়্যিবা। তিনি এ বিবাহ অপছন্দ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিবাহ বাতিল করে দেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং-৪৭৫৯, আ.প্র.)

আবার এমনও হতে পারে কন্যা বা নারী একজন ছেলের বাহ্যিক দিক দূর থেকে দেখেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে, কিন্তু অভিভাবক খোঁজ-খবর নিয়ে দেখল সে ছেলে যোগ্য নয়। এক্ষেত্রে কন্যার মতামতকে প্রাধান্য দিলে সমস্যা। কাজেই

এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা)-এর বিবাহের পূর্বে যেমন 'আলী (রা)-এর কয়েকটি গুণ ব্যক্ত করে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে আজকের মা-বাবারাও কন্যার মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে কন্যার কাছে অনুমতি চাইবেন। তাহলেই এ সমস্যাও এড়ানো যাবে বলে আশা করছি।

সৎ পাত্রস্থকরণ

সন্তানদের একটা বয়স পর্যন্ত অনেক রকমের হক পরিপূর্ণ করার পরও কন্যাদের প্রতি আরো বিশেষ কয়েকটি হক বেশি আদায় করতে হয়। এগুলোর মধ্যে কন্যা জীবনের শেষ এবং পিতা-মাতার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আঞ্জাম দিতে হয় তা হলো- কন্যাকে সৎ পাত্রস্থকরণ।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

যার দীনদারী ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুন নিকাহ, হা. নং-১০২২, বিআইসি)

এ হাদীস অভিভাবকদেরকে সিদ্ধান্তমূলকভাবে নির্দেশ দেয় যে, যখন এমন কোন পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে, যার দীন ও আখলাকের ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট, আপনার নিকট আস্থামূলক তথ্য আছে যে, পাত্র আল্লাহভীরু,দীনদার, নামাযী, সিয়াম আদায়কারী এবং নৈতিকতায় সুসজ্জিত, মাদকদ্রব্য তথা ধূমপান, মদ, গাঁজা, আফিম সেবনকারী না, সুদ বা সুদী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী না, ঘুষ ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহলে অহেতুক বিলম্ব করা কোন মতেই ঠিক নয়। আল্লাহর উপর ভরসা করে তার সাথেই বিয়ে দিয়ে দেবে এবং কল্যাণের আশা করবে। আর মনে রাখবে, কল্যাণ আর শান্তি দেবার মালিক তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। অন্যদিকে বলা যায়, এমন গুণাবলীসম্পন্ন পাত্রকে সহজে পাওয়াই যায় না। আর যারা পায় তারা যদি পাত্রের সততার কারণে, পারিবারিক জীবনে একটু কষ্ট হবে এমন মনে করে এমন পাত্র হাতছাড়া করে তাহলে তারা তো আসলেই দুর্ভাগা। তাদের জন্যই তো দুনিয়াতে অপমান আর জাহান্নামের আগুন তৈরি করা। কারণ পৃথিবীতে একমাত্র শান্তির পথ হচ্ছে ইসলাম। এ ইসলামের মূল বিধান আল কুরআনুল

কারীমে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে কিসে শান্তি আর কিসে অশান্তি। যেখানে ইসলামে বলা হয়েছে, মুসলিমদের বিয়ের সম্পর্কের জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দীন ও আখলাক (সচ্চরিত্র) সেখানে যে সমাজে দীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে পাত্রের মাসিক ইনকাম ১,০০,০০০ টাকা, এলাকায় বড় বড় পুকুর, পুকুরে রুই, কাতলা আর মাগুর মাছে ভরপুর, বাড়িতে বড় বড় ঘর আর দেখতে সিনেমার নায়ক অমুকের মত সুশ্রী ও সৌন্দর্যে ভরপুর বলে অগ্রাধিকার দেয়া হয়, সে সমাজে ফিতনা ও ফাসাদের তুফান সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক এবং আল্লাহ মাফ করুন দুনিয়ার কোন শক্তিই (ধন-সম্পদ, অর্থ-বৈভব) এমন সমাজের জনগোষ্ঠীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহই পারবেন আর আল্লাহর কাছেই সকলকে ফিরে আসতে হবে।

হিজড়া সন্তানের হক

পুরুষও নয় নারীও নয় এমন এক ধরনের মানুষই হলো হিজড়া। তাদের সামাজিক মর্যাদা উপেক্ষিত। অথচ তারাও কোন না কোন পিতার ঔরসজাত ও মায়ের গর্ভের সন্তান। অন্যান্য সন্তানদের মত তাদেরও রয়েছে পিতা-মাতার কাছে অধিকার।

আজকাল হিজড়া লোকগুলো যেভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে তা সত্যিই হৃদয়-মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না। এ সমাজ তাদের কোন মূল্যই দেয় না। তারা মানুষের কাছে হাত পেতে, সাহায্য নিয়ে বস্তিতে কোথাও বা গাছতলায় জীবন যাপন করছে। যার জন্য প্রথমত পিতা-মাতাই দায়ী। অপরদিকে রাষ্ট্রও তাদের জন্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করছে না বলে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও হবেন দায়ী।

সন্তানের কাছে পিতা-মাতার হক

পৃথিবীতে পিতা-মাতাই সন্তানের সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রাহী। তারা সন্তানদের প্রতি যে আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করেন, তাদের জন্ম থেকে শুরু করে লালন-পালনে যে কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম সহ্য করেন এবং তাদের মুখে হাসি; জীবনে সুখ-শান্তির জন্য নিজেদের সকল চাহিদা জলাঞ্জলি দেন, দুনিয়ার কোন দৃশ্যমান সম্পদ বা আর কোন কিছুর দ্বারাই এ বদলা বা প্রতিদান হতে পারে না। এজন্যে পিতা-মাতার হক যে সন্তানদের কাছে কত বেশি তা লেখায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[১]

---

১. পিতা-মাতার হক তো সন্তানদের জন্য আদায় করা সম্ভব নয়, তাই অভিমত হলো সন্তানেরা যদি পিতা-মাতার অপছন্দীয় বা তারা যা- যা করতে বারণ করেন বা যা করলে

তবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বহু জায়গায় আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ের পর পরই পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এতেই প্রমাণিত হয়, সন্তানের কাছে পিতা-মাতার হক বা অধিকার কত বেশি! পিতা-মাতার হক আদায় করার সামর্থ্য কোন সন্তানেরই নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন উপায়েই সন্তান নিজ পিতার সম্পূর্ণ অধিকার আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে যদি সে তার পিতাকে গোলাম পায় এবং তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয় তাহলে কিছুটা অধিকার আদায় হয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা.নং-১৮৫৬, বিআইসি)

পৃথিবীর অঙ্গণে একমাত্র ইসলামে তাদের এত বেশি হক ঘোষণা করা হয়েছে, যার সমপরিমাণ হক অন্য কোন সত্তার নেই। অথচ আজকাল কোথাও দেখা যায়, নিজের জীবন বাজি রেখে, শরীরের রক্ত দিয়ে তিল-তিল করে যে সন্তানকে বড় করে তুলল পিতা-মাতা সে পিতা-মাতাই আজ সময়ের ব্যবধানে সন্তানের বন্ধু-বান্ধব, অফিস পাড়ায়, সন্তানের সফলতায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, মোজাইক করা উঁচু দালানের দামি সোফা সম্বলিত ড্রয়িং রুমে, সন্তানের এসি সেটআপ করা কক্ষে, দামি বিছানায়, টাইলস সেটআপ করা বাথরুমে, আর ব্যক্তিগত গাড়িতে পরিত্যক্ত, আনফিট। পিতা-মাতা ভিক্ষা করে অথবা যাকাত আর চামড়ার টাকা গ্রহণ করে, চিকিৎসার অভাবে প্রচণ্ড গরমে অবহেলিত গ্রামের বাড়িতে কোন রকমে জীবন ধারণ করে অভাব, ক্ষুধা আর লজ্জা নিবারণের তাগিদে সন্তানের কাছ থেকেই যাকাতের টাকা নিতে চায় এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যও বর্তমান সময়ে অপ্রতুল নয়। মা বসবাস করে গ্রামের বাড়িতে এ গরমে ছোট্ট টিনের ঘরে আর

মুখ কালো করেন অর্থাৎ পিতা-মাতা যা পছন্দ করেন, (অবশ্যই আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস মুতাবিক) যা-যা করতে বলেন, যা-যা প্রত্যাশা করেন (পড়ালেখায় সফলতা, কর্মে সফলতা) এগুলো যদি করা হয় তাহলে হয়তো বা পিতা-মাতার হক কিছুটা আদায় হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং মানবতার মূর্ত প্রতীক পৃথিবীতে শতভাগ হক আদায় করে বাস্তবে রূপদানকারী একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথে চলতে পারলেই একমাত্র হক আদায় হবে মনে করে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে।

স্ত্রী তখন ৩৫০ ভরি স্বর্ণ ব্যবহার করে। এমন দৃশ্য কি বিবেকবান সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারে? হ্যাঁ হয়তো বা মানুষ মেনে নিলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা মেনে নেননি তার বিচার দুনিয়ার আদালতেই করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর পরকাল তো বাকী আছেই।[১]

এ মূর্খ বা জাহিল সন্তানগুলো জানে না পিতা-মাতার সাথে এমন বৈরিতাপূর্ণ আচরণ, আর এর ফলে তাদের হৃদয়ে দেয়া কষ্ট, তাদের চোখের পানি সন্তানদের উচ্চ পদে আসীন চেয়ারকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। দুনিয়াতে অশান্তির অনলে পোড়াতে পারে আর আখিরাতে মহাশাস্তি তো অপেক্ষা করছেই; তারা তা বুঝে না। অধিকন্তু বলে, আমার পিতা-মাতা মূর্খ, তাদের নিজেদের নামাযই হয় না তারা আর কী দু'আ করবে! তাদের দু'আ কী কবুল হবে ইত্যাদি। আসলে এম.এ. পাশ, এম.বি.এ পাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং আর মেডিকেল পাশ করলে হবে কি কুরআনুল কারীম আর হাদীস গ্রন্থ তো পড়ে না আর তাই তো জানে না পিতা-মাতার চোখের পানি আর বদদু'আ একটি তীর নির্দিষ্ট স্থানে ছুড়লে পৌছতে যত সময় লাগে তার আগে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।

পিতা-মাতার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার

আল-করআনুল কারীমে পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ও সৌজন্যমূলক ভাল ব্যবহারের প্রতি তাকিদ দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّه كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের সাথে 'উফ' শব্দটিও বলো না; তাদের ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। তাঁদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে পক্ষপুট অবনমিত করো (তোমার ডানা

---

১. এ লেখার বাস্তব প্রমাণ গত ১৫ মে ২০০৭ থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একজন মায়ের সাথে তার সন্তানের আচার-আচরণ, দায়িত্ব পালনের ধরন ও করুণ বর্ণনা এবং আদালত কর্তৃক সন্তানের পাপের শাস্তি।

অবনত কর) এবং বল, 'হে আমার পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালই জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তিনি আল্লাহ-অভিমুখীদের (তাওবাকারীদের) প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৫)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُه وَفِصلُه ثَلثُوْنَ شَهْرًا.

"আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে পেটে রেখেছে, কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং তাকে পেটে বহন করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে।" (সূরা আল-আহকাফ, ১৮ : ১৫)

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّه وَهْنًا عَلى وَهْنٍ وَّفِصلُه فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْر.

"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার তাকিদ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি শুকরিয়া আদায় করে। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে"। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪)

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَتُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩৬)

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৪৮, বিআইসি)

দৃষ্টান্ত : ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কাফির বাবার সাথে সদ্ব্যবহার

ইবরাহীম (আ) তাঁর নিজ পিতার কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে

দু'জনের মধ্যে যে সুন্দর কথোপকথন হয়েছে তা মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার এত পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ তা কিয়ামাত পর্যন্ত আগন্তুক জাতিকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আল-কুরআনুল কারীমে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّه كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا. اِذْ قَالَ لاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَيُبْصِرُ وَلاَيُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا. يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يٰاَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا. يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا. قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّه بِىْ حَفِيًّا.

"স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি ওর ইবাদাত করেন কেন? সে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোনই কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার অনুসরণ করুন, আমি সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদাত করবেন না। শয়তান তো আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি যে, দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু। পিতা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করাবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বলল, আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।" (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪১-৪৭)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাই ইবরাহীম (আ) জন্মদাতা পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সুন্দর ও নরম ভাষা ব্যবহার করে তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে 'হে আমার পিতা' বলে সম্বোধন করেছেন যাতে নম্রতা, আন্তরিকতা ও সর্বোৎকৃষ্ট সম্মানবোধের প্রকাশ ঘটেছে। অথচ পিতা কুফরীর গোমরাহীতে উত্তেজিত হয়ে উঠল, এরপরও যখন পিতাকে বললেন, পিতা তখন তা প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তরাঘাত করার হুমকি দিল, তার কাছ থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল, সে কঠিন এবং হৃদয় বিদারক পরিস্থিতিতেও তিনি পিতার সাথে সুন্দর ও সদয় ব্যবহার পেশ করে নরম সুরে বলেন যে, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার গুনাহ মাফ করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করব।

সন্তানের সম্পদে পিতা-মাতার হক

পিতা-মাতা তাদের শ্রেষ্ঠ পছন্দনীয় খাবার, উপহার, সুখ-শান্তি, হাসি-ঠাট্টা সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে সন্তানদেরকে গড়ে তোলেন, একটু অসুস্থ হলে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে তাদের জীবন আল্লাহর কাছে ফেরত চাইতে থাকেন, সন্তানের দুঃখে যারা সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়ে থাকেন আর আনন্দে যারা হয়ে উঠেন আত্মহারা সেই পিতা-মাতা যখন কর্মে অক্ষম, বয়সের ভারে নুব্জও প্রায় তখন কতিপয় সন্তান তাঁদের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে। তাদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করতে চায় না, বাবা বা মা সম্বোধন করে কথা বলতে চায় না, অধিকন্তু তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রম বা পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে ফেলে রাখে, দারুণভাবে নিগৃহীত নিষ্পেষিত হয়ে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তাঁদের সাথে বসে সুন্দর করে একটু কথাও বলা হয় না, সন্তানের সম্পদ কী পরিমাণ তা তাঁদেরকে জানতেও দেয় না, এমন সন্তান কখনো ভাবে না তাকেও একদিন এ পর্যায়ে যেতে হবে আর সে দিন তার সন্তানও তাকে এমনভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করবে।

পৃথিবীতে জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মায়ের অধিকারের সমান আর কোন মানুষের অধিকার নেই। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজ-সামাজিকতার অঙ্গণে কোথাও কোথাও দেখা যায়, নিজের পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বেশি খেদমত করতে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا.

"তোমরা প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারোর ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সাথে কখনো রাগ করে উফ্ শব্দটি পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)

আর সন্তানের সম্পত্তিতে পিতা-মাতার হক প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয়নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

"তোমার যা ভোগ-ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হলো তোমাদের নিজস্ব শ্রমের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।"

(সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২২৯০, আ.প্র.)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اِنَّ لِيْ مَالاً وَّوَلَدًا وَّاِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلاَدِكُمْ.

'আমর ইবন শু'আইব (রা) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আছে, আর আমার পিতা আমার মালের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি এবং তোমার মাল সবই তোমার পিতার। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য উত্তম উপার্জন। কাজেই তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জিত মাল ভক্ষণ করবে। (আবু দাউদ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-৩৪৯৩, ই.ফা.)

পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ

পিতা-মাতার কথা না শুনা, তারা যা-যা করতে বলে তা না করা যেমন তারা নামায পড়তে বলে তা না করা, সিয়াম পালন করতে বলে তা না করা, মাথার চুল ছোট রাখতে বলে তা না রাখা, জিন্সের প্যান্ট, হাতে ব্রেসলেট, কানে দুল, দেড় ইঞ্চি উঁচু জুতো ইত্যাদি পরতে নিষেধ করলে তা মেনে না নেয়া, ভালভাবে পড়ালেখা করতে বললে তা না করা, যখন তখন খেলতে দিতে না চাইলে তা মেনে না নেয়া, কম্পিউটারে গান শোনা, গেমস খেলা, টেলিভিশন দেখা, অসৎ বন্ধুর সাথে না মেলামেশা করা ইত্যাদি যা-যা করতে নিষেধ করে তা করাই হচ্ছে গুনাহের কাজ। যদি কেউ শয়তানের ইঙ্গিতে এগুলোর কোনটি করেও ফেলে তাহলে পরক্ষণেই পিতা-মাতার কাছে ভুল স্বীকার করে শুধরিয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আর তাহলেই জীবনে সফলতা নিশ্চিত। কিন্তু যারা তা করে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য লানতযুক্ত (অসম্মান, অপমান) পরিবেশ তৈরি করে দেন। ফলে অপমানের যিন্দেগী তাদেরকে ঘিরে বসে, জীবনে যা করে বা করতে চায় ভাল হয়তো বা মনের অজান্তেই হয়ে যায় খারাপ বা মন্দ।

অন্যদিকে যদি পিতা-মাতা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিপরীত কোন কথা বা কাজ করতে বলে তাহলে তা করা যাবে না, মানাও যাবে না। এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْ قِنكُم كُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, তারাই যালিম।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ২৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ لا فَلاَتُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনে নিও না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে ভাল ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৫)

পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবতার অসম্মান-অপমান অবমূল্যায়ন অস্বীকৃতি ইত্যাদির ইসলামে কোন স্থান নেই। বরং এ ধর্মে রয়েছে প্রত্যেকের হকের ব্যাপারে বা অবস্থান মূল্যায়নের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কড়া আদেশ। এখানেই শেষ নয়। রয়েছে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী এবং তা বাস্তবায়নের নমুনা। পিতা-মাতা হলেন প্রত্যেক সন্তানের জীবনে অত্যন্ত আপনজন, শ্রদ্ধাযোগ্য। পিতা-মাতাই সন্তানদেরকে পৃথিবীতে আসতে ভূমিকা রাখেন, তাঁদের অসহায় অবস্থায় সব দায়-দায়িত্ব পালন করেন। এমন পিতা-মাতা যাদের সাথে চলাফেরা, মত বিনিময়, লেনদেন, শলা-পরামর্শ করেন তাদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন তারাও শ্রদ্ধাযোগ্য। তারাও সুন্দর ব্যবহার পাবার হকদার; খিদমত পাবার হকদার। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ.

"সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথেও সম্পর্ক অটুট রাখা।" (জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায় ঃ আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং- ১৮৫২, বিআইসি)

দুধ মায়ের হক

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া বা কোন কারণে মায়ের স্তনে দুধ না থাকা বা কম থাকা বা এমনিতেই মায়ের বান্ধবী বা মায়ের বোন খালা বা অন্য কারোর স্তনের দুধ যদি কোন শিশু পান করে তাহলে তিনি শিশুর দুধ মা হিসেবে গণ্য হন।

দুধ মায়ের হক হলো :

❖ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি। সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ উচ্চ বংশ বা নিম্ন বংশ, ধনী বা দরিদ্র সকল অবস্থায় তাঁকে উত্তম মনে করা চাই।

আমাদের প্রিয়নবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি দুধ মা হালিমা সাদিয়ার আগমনে আপন চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, দুধ মা কতটুকু সম্মানের অধিকারী!

❖ দুধ মায়ের অন্যান্য সন্তানরা এই শিশুর দুধ ভাই-বোন হবে। ফলে তাদের মধ্যে চিরতরে বিবাহ্ হারাম।

❖ তিনি গর্ভধারিণী মায়ের মতই প্রয়োজন হলে খিদমত পাওয়ার যোগ্য। কারণ বুকের দুধ এতো উৎকৃষ্ট, এতো মূল্যবান যে এর দাম টাকা, ডলার বা পাউন্ডে হিসাব করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই তিনি সর্বদাই যে তার দুধ পান করেছে তার কাছে সদাচরণের হকদার।

বড় ভাইয়ের কাছে ভাই-বোনের হক

বাবার ঔরসজাত একই মায়ের কয়েকজন সন্তান মিলেই আপন ভাই-বোন। যারা ভবিষ্যতে এ পরিবার ও বংশের উত্তরাধিকারী। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

قَالَ تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْاَثَرِ.

তোমরা নিজেদের বংশধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট থাকলে নিজেদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।

(জামে আত তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, বিআইসি)

পরিবারে বাবার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে সময় গড়িয়ে দায়িত্ব যেন পিছু তাড়া করে পরিবারের ছেলেদেরকে একদম ঘিরে ফেলে। আর মেয়েরা আল্লাহর হুকুমেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরের ঘরে চলে যায়। ফলে বয়সে বড় হলে বিশেষ করে ভাই হলে সকলের প্রতি পালন করতে হয় অনেক দায়-দায়িত্ব– যা তাদের হকের সাথে সম্পৃক্ত।

পিতার অবর্তমানে ছোটদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা

পিতার মৃত্যুতে পরিবারে বড় ভাই থাকলে তাকে উপার্জন এবং ছোটদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্ব পরিবারের ধারণা থেকে পারিবারিকভাবে বড়দের উপর অব্যক্তভাবেই বর্তায়। বড়রা তখন হয়ে পড়েন ছোটদের অভিভাবক। আর তাই পরিবারে পিতার কাছে সন্তানের যে হক ছিল প্রায় সবক'টি হক বিশেষ করে ছোটদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা, চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে আদর্শ পরিবেশ গড়ে দেয়াসহ বড়দের জন্য পিতা একজন অভিভাবক হিসেবে যা-যা করেছেন এর সবগুলো সুযোগ-সুবিধা যতটা সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করা বড়ো সন্তানের ওপর বর্তায়।

আর এ দায়িত্ব পালনে বড় ভাইয়েরা যখন অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে ছোটদেরকে পড়ালেখা অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়, তখন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলেই তার সুফল ভোগ করে এবং আশা করা যায়, পরিবারের অনাগতরাও তাদের পথ ধরেই আগামী দিনে শিক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে; তাদের হক অনুসারেই সুফল ভোগ করবে।

কাজেই বড় ভাইয়েরা ছোটদের প্রয়োজনে নয়, বাধ্য হয়ে নয়, নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় এবং ছোটদের কাছ থেকে যথার্থ মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্যই ছোটদেরকে পড়ালেখা করানোসহ সামগ্রিক প্রয়োজন পরিপূর্ণকরণে যোগান দেয়া বুদ্ধিমত্তা ও মনুষ্যত্ববোধের দাবি। কেননা পরিবারের ছোটরা অশিক্ষিত হলে বড়দের যা সমস্যা হতে পারে তা হলো :

০১. ছোটরা অশিক্ষিত হওয়ার কারণে বড় ভাইয়ের সাথে কিভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয় তা তারা বুঝবে না। এতে বড় ভাইয়ের প্রতি তাদের পক্ষ থেকে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন হওয়ার কথা তা হবে না। পরিবারে বড় এবং ছোটদের মাঝে

সম্পর্ক হবে দ্বন্দ্ব ও কলহপূর্ণ। সুতরাং ছোটরা অশিক্ষিত হওয়ায় বড় ভাইয়ের সাথে সামগ্রিক আচরণে পশুত্বেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

০২. ছোটরা অশিক্ষিত হওয়ায় বড়দেরকে যথানিয়মে সম্মান করতে চাইবে না বা চাইলেও পারবে না। অর্থাৎ বড়দের সাথে দেখা-সাক্ষাতে ছোটদের পক্ষ থেকে কথোপকথন শুরুতে প্রথম যে বাক্য সালাম বিনিময় তার উচ্চারণ যথাযথভাবে হবে না। এতে সালামের মাধ্যমে দু'আ প্রকাশিত না হয়ে তা হবে বদদু'আ, সালামের অর্থ হলো, "আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক" আর উচ্চারণ যথাযথ না হওয়ায় তার অর্থ হবে "আপনার উপর গযব বর্ষিত হোক।"

০৩. ছোটরা অশিক্ষিত হওয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদে সে হয়তো কখনো রাস্তায় রিক্সা ও মজুরী খেটে জীবন ধারণ করবে। এতে বড় ভাইয়ের যদি সম্পদ থাকেও তাহলে বড় ভাইয়ের সামাজিক মর্যাদা কতটুকু প্রতিষ্ঠা পাবে তা বোধহয় বড়দের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

০৪. ছোটরা অশিক্ষিত হওয়ায় বড় ভাইয়ের পরিবারে আগত সন্তানেরাও স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত হবে। কেননা ওরা তো ছোটবেলা থেকেই শিক্ষিত বলতে কাউকে দেখতে পাবে না; আর বাড়ির পরিবেশও শিক্ষার অনুকূলে থাকবে না। তাতে বীজগণিতের সূত্রের ন্যায় প্লাসের পরে প্লাস, দুই প্লাস মিলে আরো প্লাস। অর্থাৎ বড় ভাই মূর্খ ফলে ছোট ভাই অশিক্ষিত এবার সকল অশিক্ষিত মিলে আগামী বংশধরও অশিক্ষিত হবে।

০৫. ছোটদেরকে পড়ালেখা না শিখানোতে বড় ভাইদের মৃত্যুতে তারা যেমন জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না তেমনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বড় ভাইদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে মুনাজাত করে চোখের পানি ফেলতেও পারবে না। কেননা পড়ালেখা না করানোতে ছোটরা জানাযা ও মাগফিরাত কামনার দু'আও করতে পারার কথা না। ফলে ওরা কবরের কাছে যায় না। আর গেলেও বছরে একদিন ঈদুল ফিতর বা আযহার দিনে হয়তো যায়।

০৬. বড়রা স্বাভাবিকভাবে ছোটদের আগে মৃত্যুবরণ করে (ব্যতিক্রমও হতে পারে।) এ অবস্থায় লাশ কবরে রাখতে যেয়ে যে দু'আ পড়তে হয় তা হলো "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" এবার ছোটরা অশিক্ষিত হওয়ায় শিখতে না পারার কারণে যদি সে কবরে নামে তাহলে লাশ রেখে বলবে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ...। এবার দাফন শেষ হয়ে গেলে ফেরেশতারা কেমন আচরণ করবেন বড়দের সাথে তা বোধহয় বড় ভাইরা বেঁচে থাকতেই ভেবে দেখা দরকার।

অন্যদিকে মা বেঁচে থাকলে পিতার অনুপস্থিতিতে মাও হয়ে পড়েন সন্তানের মুখাপেক্ষী। ফলে বড় সন্তানেরা যখন ছোটদের সাথে খারাপ আচরণ করে তখন মাও কষ্ট পেতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন তারা মায়ের বদদু'আর রোষাণলে পড়ে যান। যা ঐ কপালপোড়া সন্তানের জন্য বয়ে আনে অনেক দুঃখ-দুর্দশা। ফলে সন্তানরা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন, রোগে-শোকে আচ্ছন্ন এবং সবশেষে যালিমের মত মৃত্যুবরণ করে থাকে– যা জ্ঞান চক্ষুর অভাবে তারা বুঝতে পারে না।

সুতরাং বড় ভাইয়েরা যদি বড় বা শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন হতে চায়; পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে প্রিয় হতে চায়; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত প্রাপ্ত হতে চায় তাহলে তাদের যে দায়িত্ব তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

আদর্শ পথ গড়ে দেয়া

বড় ভাইয়েরা যা-যা করে তার পথ ধরে অনেকটা মনের অজান্তেই ছোটরা তা-ই করতে থাকে এবং সে পথে গমন করে। তাই পরিবারে পিতা-মাতা বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় আগামী দিনের একজন পতাকাবাহী হিসেবে বড় ভাইকে হতে হবে যথেষ্ট সচেতন, শিক্ষিত, কর্মঠ, সৎ, সদালাপী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ। বড় ভাই এমন কোন কাজ করবে না যার রেশ ছোটদের মাঝে পড়ে এবং সেই পথ ধরে ছোটরা বিপথগামী হতে শুরু করে।

পরিবারে বড় ভাইদেরকে হতে হয় শান্তশিষ্ট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। সে ছোট ভাই-বোনদের সাথে সব সময় কথাবার্তা বলবে, তাদের কোথায় কী প্রয়োজন, কী সমস্যা তা জানতে চাইবে, সমাধান করতে আন্তরিক হবে, কিন্তু একদম বন্ধুর মত ফ্রি সবকিছু বলবে, বসে-বসে অতিরিক্ত হাসাহাসি ও গল্প-গুজব করবে এমনটি না হওয়াই উত্তম। কারণ বড় ভাই শয়তানের প্ররোচনায় না বুঝে বা জীবনের একটা সময় পর্যন্ত সঠিক জ্ঞানের অভাবে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা হাস্যকর, লজ্জাজনক এক কথায় অনৈসলামিক। এখন ফ্রি বা মিশুক কালচারে কথা বলতে-বলতে এমন অনৈসলামিক কথাগুলো ব্যক্ত করে ছোটদের মনে রেখাপাত হওয়ার সুযোগ দেয়া কখনোই ইসলামসম্মত নয়; বরং এমন কথা যা দোষের সাথে সম্পৃক্ত তা গোপন রেখে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : كُلُّ أُمَّتِىْ مُعَافَاةٌ إِلاَّ

الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُوْلُ : يَا فُلاَنُ! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيْتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ. قَالَ زُهَيْرٌ : 'وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ' .

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নিজের পাপাচার জাহিরকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মাতের গুনাহই ক্ষমার যোগ্য। জাহির করার অর্থ এই যে, কোন বান্দা রাতের বেলা কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর দিন হলে তার প্রভু তার পাপকে গোপন রাখেন। কিন্তু বান্দা কাউকে ডেকে প্রকাশ করে দেয় যে, আমি গত রাতে এই-এই পাপ করেছি। অথচ বান্দা গুনাহ করার পর রাতে তার প্রভু তা গোপন রেখেছিলেন। ভোর হলে আল্লাহ যে পাপ গোপন রেখেছেন, সে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিল। যুহাইর বলেছেন, (الهجار) অর্থাৎ (الاجهار) এর স্থলে পূর্বোক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন। অর্থ প্রায় এক। অর্থ নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা। (সহীহ মুসলিম, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও মর্মস্পর্শী বিষয়সমূহ, হা. নং-৭২৬৭, বিআইসি)

অন্যদিকে ছোট ভাইয়েরা বড় ভাইদের শিক্ষা ও কর্ম জীবনের সফলতায় হবে মুগ্ধ। বড়রা সমাজের সেবায় যখন আত্মনিয়োগ করবে ছোটরাও তা ভবিষ্যতে করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে ছোটদের জন্য আদর্শ পথ গড়ে বড় ভাইয়েরা নিজেদেরকে আদর্শের মূর্তপ্রতীক ও সচ্চরিত্রবান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে আর তাদেরকে সে পথ দেখিয়ে দিবে এটা তাদের হক।

ছোটদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা

বড় ভাইদের কর্তব্যে অবহেলার কারণে ছোটরা আদর্শ মানুষ হওয়া থেকে বিচ্যুত হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝায় পরিণত হতে পারে। পরিবারের বড়রা (ভাই-বোন) ছোটদের জন্য যথাসম্ভব সব রকম সুন্দর কর্মসূচি গ্রহণ করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়বে– এটি ছোটদের হক। ছোটদের পক্ষে বড়দের অবশ্যই করণীয়। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে সম্ভব না, আমার কী দায়িত্ব! আমি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ইত্যাদি বলে সাময়িক নিষ্কৃত পাওয়া যাবে বৈকি; কিন্তু ভবিষ্যতে বড় ভাই প্রফেসর, অফিসার, ছোট ভাই রিক্সা চালায়, মজুরী করে তাহলে বড় ভাইয়ের সম্মান কিন্তু ঠিক আসনে থাকবে না। আর ইসলামও একা ভাল কাজ করবে অন্যকে আহ্বান করবে না, তাকে এ পথে আনতে চেষ্টা করবে না এমন বৈরিতাপূর্ণ আচরণের অনুমতি দেয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা বলেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৫)

ভাই-বোনদের জন্য সৎ পাত্র-পাত্রীর ব্যবস্থা করা

পিতার বেঁচে থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে সৎ পাত্র-পাত্রীর সুব্যবস্থা করা এবং সাধ্যমত এর খরচ আঞ্জাম দেয়া বড় ভাইয়ের কাছে ছোটদের হক। এক্ষেত্রে সুন্দর আলাপ-আলোচনা, সুষ্ঠু মতামত পোষণ ও যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমূহ দায়িত্ব পালন না করে পিছপা হলে বা খরচের কারণে দায়িত্ব পালনে ঢিলেমি করলে এ সময়ে যদি তাদের দ্বারা কোন নৈতিকতা বিরোধী কাজ হয়, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব বড় (অভিভাবক) হিসেবে তাদের উপর বর্তাবে।

আজকাল কোথাও-কোথাও দেখা যায়, কয়েকজন বড় ভাই থাকা সত্ত্বেও ছোট বোন বা ছোটদের অনেক বয়স অতিবাহিত হওয়ার পরও স্বাভাবিক খরচের ভয়ে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে রীতিমত পিছিয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে, অর্থের যোগান কে দেবে? কত দেবে ইত্যাদি– যা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত।

আবার কোথাও শুনা যায়, ছেলে হলে যৌতুকের টাকা আর কন্যা হলে সুদের মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করে অথবা পিতার সম্পত্তি সুদের উপর বন্ধক রেখে বিয়ের কাজ আঞ্জাম দিতে হয় যা সম্পূর্ণ নাজায়িয। এমন যে কোন পরিস্থিতিতে পরিবারের সামর্থ্যবান বড় ভাইয়েরা অবশ্যই আল্লাহর আদালতে ছোটদের হক আদায় না করার অপরাধে অপরাধী সেজে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো সমাজে শারী'আহ মুতাবিক হকের বাস্তবায়ন না থাকায় বা প্রভাবশালী হলে হয়তোবা তারা সমাজের চোখে পার পেয়ে যেতেও পারেন কিন্তু আল্লাহর চোখে তো অবশ্যই নয়।

ভাই-বোনদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত না করা

পিতার সম্পদে পরিবারের সদস্য হিসেবে বড়-ছোট ভাই-বোনদের রয়েছে হক বা

অধিকার। এ অধিকার মতেই পরিবারের প্রধান হিসেবে পিতার সম্পত্তিতে যেমন সকলের হক রয়েছে তেমনি পিতার অবর্তমানে ঐ একই পরিবারের প্রধান হিসেবে বড় ভাই যখন উপার্জনক্ষম হবেন এবং পিতার সম্পদ থেকে সুফল নিয়ে সম্পদ গড়বেন তখন অন্যরা (যৌথ পরিবারের সদস্য-সদস্যা) হকদার হওয়া ইসলামসিদ্ধ রীতি।

অন্যদিকে বোনেরা যদি পিতার সম্পত্তিতে তাদের যে হক রয়েছে তা নিয়ে যায় তাহলেও পিতার বাড়িতে ভাইদের বাসায় তাদের বেড়ানোর হক থেকে যায়। আজকাল অনেকে মনে করে বোনেরা সম্পদ নিয়ে গেছে এ বাড়িতে তাঁদের আর কোন হক নাই– যা ঠিক নয়।

বাবার বাড়ির প্রতিটি ইট বা বালু কণার সাথে, গাছপালার সাথে বোনের যে সম্পর্ক ছিল তা তো আর শেষ হয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া রক্তের সম্পর্ক তো ছেদ হওয়ার কোন সুযোগই নেই। কারণ রক্ত থেকে রক্তের সম্পর্ক মুছে দেয়ার কোন ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই মানবতার চির কল্যাণকামী মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে তাকিদ এসেছে এ সম্পর্ক রক্ষার এবং ছিন্নকারীদের ব্যাপারে এসেছে কড়া ধমক। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِىْ قَاطِعَ رَحِمٍ.

কর্তনকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইবনু আবি 'উমার বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। (জামে আত তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৫৯, বিআইসি)

সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে বাধা দেয়া

ছোটদের সৎ কাজের আদেশ দেয়া, সৎ পথে চলতে উৎসাহিত করা, সৎ কথা ও সৎ জীবন গঠনে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মেনে চলার নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়া আর যা কিছু অসৎ, অকল্যাণকর ও আদর্শ নীতি বিরোধী তা থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা বড়দের দায়িত্ব আর ছোটদের হক। কেননা একটি কথা তো সকলেই জানে, যার বয়স যত তার বুদ্ধিমত্তা ও মেধার প্রখরতা তত। অর্থাৎ যে ছোট সে কম জানবে বা যতটুকু পর্যন্ত জানবে বা জানার পরিধি যেখানে শেষ হবে বড়দের সেখান থেকে শুরু হবে। সুতরাং স্বভাবতই ছোটরা অনেক কিছু জানবে না– যা বড়দের জানানোই কর্তব্য। সৎ কাজের

আদেশ দান এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়া মুসলিম উম্মাহর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বয়স, পেশা ও দায়িত্ব নির্বিশেষে এটি সকলের উপর বর্তায়। তবে মহান আল্লাহ যাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন এবং সেই সাথে বয়সেও তারা বড়, তাদের কাছে ছোটদের এটি একটি হক যে, তারা তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। আর তবেই তারা হবে সর্বোৎকৃষ্ট। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি। তোমাদের সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১১০)

এ আয়াতে আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মুসলিমরা যে সর্বোত্তম উম্মাত তা ব্যক্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। নতুবা অবিলম্বে আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ কবুল করবেন না। (জামে আত তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, হা. নং-২১১৫, বিআইসি)

স্ত্রীর কাছে স্বামীর হক

ভাল স্ত্রী, নেককার স্ত্রী স্বামীর জন্য নেয়ামত। পরিবারের জন্য শান্তির উৎস। একটি পরিবারের সকল কিছু আঞ্জাম দেয়া এমন সুযোগ্য স্ত্রীর কাছেই কাম্য। মূলতঃ স্ত্রী-ই হচ্ছেন পরিবারের সংরক্ষক। আর স্বামী হচ্ছেন পরিবারের সকল প্রয়োজন বা খরচের যোগানদাতা; স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার অতন্দ্র প্রহরী। অন্যদিকে সমাজের একজন কর্ণধার হিসেবে স্বামীকে পরিবারের বাইরে সমাজ-সামাজিকতার চাকাকে গতিশীল রেখে রাষ্ট্র ও বিশ্বের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্নমুখী দায়-দায়িত্ব

পালন করতে হয়। স্ত্রী শুধু পারিবারিক অবস্থানে দু'টো কাজ সুন্দরভাবে খেয়াল রেখে করবে আর তাহলেই যেন সে হবে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত, মহাপুরস্কারে ভূষিত।

❖ স্ত্রীকে হতে হবে স্বামীর জন্য শান্তিদায়ক, দয়া ও ভালবাসার আধার। বহু ক্লান্ত-শ্রান্ত স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করবে স্ত্রী তখন তার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে হাসি মুখে তাকে বরণ করে তার প্রয়োজন পূরণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। স্বামীর ভাল উত্তম কাজগুলোর প্রতি উৎসাহ ও সমর্থন দান করবে তখন সে পরিবারে শান্তি নিশ্চিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে শান্তির উৎস সম্পর্কে বলেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِه فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ.

"তিনিই সে স্রষ্টা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার জুড়ির সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, যদি তুমি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর তাহলে আমরা শোকর করব। (সূরা আল-আরাফ, ০৭ : ১৮৯)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمِنْ آيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْآ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً.

"আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া।" (সূরা আর-রূম, ৩০ : ২১)

❖ সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ মানুষকরণে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবেই সন্তানরা হবে সমাজের জন্য সম্পদ ও কল্যাণকামী, আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা ও রাষ্ট্রের জন্য যোগ্য নাগরিক।

এখানে স্ত্রীরা এ দু'টির বাইরে কোন কাজ করতে পারবে না তা বলা হয়নি। মূলতঃ এখানে যা বলা হয়েছে তার প্রথমটি হলো একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে, দ্বিতীয়টি হলো একজন শ্রদ্ধেয়া মা হিসেবে তার দায়িত্ব। আর কর্তব্যের টানে সে বিভিন্ন কর্ম যেমন শিক্ষকতা, ডাক্তারী ও ইসলামী শারী'আহ মুতাবিক পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থায় ভূমিকা রাখতে পারলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে। তবে এ সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে স্ত্রী কখনো স্বামীর ওপর খবরদারি বা প্রভুত্ব বিস্তার করতে যাওয়া ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর ভাল পন্থায়। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।" (সূরা আল বাকারা, ০২ : ২২৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

"পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, এজন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যকে বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে থাকে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩৪)

স্ত্রীর সতীত্বের হিফাযত

স্ত্রীর কাছে স্বামীর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হক হলো স্ত্রী তার সতীত্বের হিফাযত করবে। এ সতীত্বের হিফাযত বলতে শুধু পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এজন্য তার মান-সম্ভ্রম যাতে করে বিন্দুমাত্রও কলঙ্কিত বা সন্দেহযুক্ত না হয় সে ব্যাপারেও সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। যেমন :

❖ স্ত্রী তার সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করবে না, পর্দা করে চলাফেরা করবে।

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

"মুমিনা নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন চক্ষু সংযত করে, তাদের লজ্জাস্থানের

হিফাযত করে, তাদের সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না করে, তবে স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ পায় সেটা ভিন্ন কথা।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩১)

❖ পর পুরুষদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা-বার্তা বলা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। আর গল্প-গুজব তো নয়ই। যদি জরুরি কথা-বার্তা একান্ত বলতেই হয় (স্বামীর অনুপস্থিতিতে) তাহলে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে। অন্যথায় বিপদ আসন্ন। কুরআনে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে :

فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِه مَرَضٌ.

"তাদের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে নরম সুরে কথা বল না, এমন করলে যার অন্তরে রোগ-ব্যাধি আছে তার মনে কোন অবাঞ্ছিত লালসার জন্ম হতে পারে।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩২)

❖ স্বামীর আরেকটি বিশেষ হক হচ্ছে তার অনুমতি ব্যতিরেকে ঘরের বাইরে অন্য কোথাও যাবে না। এখানেও কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.

"তোমরা তোমাদের নিজ ঘরে অবস্থান কর এবং অতীত দিনের জাহিলী যুগের ন্যায় নির্লজ্জভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে চলাফেরা করবে না।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৩)

এভাবে স্ত্রীরা যখন কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে তখন স্বামীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর এমন স্ত্রীদের প্রতি সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَيُّمَا اِمْرَاةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

যে কোন মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (জামি' আত-তিরমিযী, আবওয়াবুর রিদা, হা.নং-১০৯৯, বিআইসি)

স্বামীর আনুগত্য ও ধন-সম্পদের হিফাযত

স্বামীর যাবতীয় হুকুম আদেশ-নির্দেশ যতক্ষণ তা শারী'আত বিরোধী না হয় তা স্ত্রীদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একেকে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এইজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। সুতরাং

সৎ স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে তাদের (স্বামীদের) হক রক্ষা করে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ.

"নেককার স্ত্রীরা আনুগত্য করে এবং আল্লাহ যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে তার হিফাযত করে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩৪)

হাদীসে এসেছে :

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنُ فِيْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُوَدَّىْ اِلَيْهِ شَطْرُهُ رَوَاهُ اَبُو الزِّنَادِ اَيْضًا عَنْ مُوْسى عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الصَّوْمِ.

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সাওয়াব পাবে। হাদীসটি রোযা অধ্যায়েও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। (সাহীহুল-বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং-৪৮১৩, আ.প্র.)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে, এমনকি সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুর রিদা, হা. নং-১০৯৮, বিআইসি)

স্বামীকে কষ্ট না দিয়ে ধৈর্যধারণ করা

বিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ফায়সালা। ফলে কোথাকার নারী কোথাকার পুরুষের সাথে একত্র হয়ে জীবন যাপন শুরু করবে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত মানুষকে হায়েনার মত তাড়া করে যে দিকটি তা হলো অভাব।

এ অভাব লাঘব করার জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ ছুটে চলছে দেশ থেকে দেশান্তরে বিশ্বের বহু দেশে। কিন্তু তবুও অভাব পূরণ করা মানুষের পক্ষে দুরূহ। ফলে

অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর হক পরিপূর্ণকরণে স্বামী হয়ে পড়েন হতাশাগ্রস্ত। আর এমন অবস্থায় অনেক স্ত্রী না বুঝে তাদের স্বামীদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকেন– যা দুঃখজনক। সত্যি কথা বলতে কী দুনিয়া হচ্ছে সৎ মানুষ ও হালাল উপার্জনকারীদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে স্বামীরা যদি হন আদর্শবান তাহলে কিছুটা অভাব তাদের থাকলেও আদর্শবান স্ত্রী পাওয়ায় তা অভাব বলে প্রতীয়মান হবে না।

এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফিরের জান্নাত। (সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায় ঃ পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হা. নং-৪১১৩, আ.প্র.)

সুতরাং অভাবের তাড়নায় স্বামীকে কষ্ট দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। সেই সাথে আজকের সমাজে একটি প্রবাদ আছে তা হলো 'অভাব আসলে ভালবাসা জানালা দিয়ে পালায়'– যা মূলতঃ অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কেননা ভালবাসার বিন্দু পরিমাণও যাদের হৃদয়ে আছে তারা এটা মানতে নারাজ হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর তাই বিপদ বা কোন সমস্যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া এবং ধৈর্যের সাথে একটু কষ্ট মেনে জীবন ধারণ করা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

حَامِلاَتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيْمَاتٌ لَوْلاَ مَا يَاْتِيْنَ اِلى اَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ.

গর্ভধারিণী (বহনকারিণী), সন্তান জন্মদানকারিণী এবং মমতাময়ীরা তাদের স্বামীদের কষ্ট না দিলে তাদের মধ্যে যারা নামাযী তারা জান্নাতে যাবে। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ [বিবাহ], হা. নং-২০১৩, আ.প্র.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

لاَ تُؤْذِىْ اِمْرَاةٌ زَوْجَهَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَتُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا.

যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার আয়তলোচনা হূর স্ত্রীগণ বলতে থাকে : ওহে! আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার নিকট অল্প দিনের মেহমান। অচিরেই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের নিকট চলে আসবে। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ [বিবাহ], হা. নং-২০১৪, আ.প্র.)

স্বামীর কাছে স্ত্রীর হক

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীতে নারী-পুরুষদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন :

وَاَنْكِحُوْا الاَيَامى مِنْكُمْ وَالصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"তোমাদের মধ্যে যারা আয়্যিম (অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩২)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْنَا قَالَ اَنْ تَطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَتَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحَ وَلاَتَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ.

হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) তা খাওয়াবে, সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রী) চেহারার উপর প্রহার করবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না। তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না। (আবু দাউদ, বিবাহের অধ্যায়, হা. নং-২১৩৯, ই.ফা)

উল্লিখিত এ ঘোষণা অনুসারে মানুষ যখন বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হবে তখন তাদের একে অপরের উপর হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। এবার এ অধিকার বা হক কার কাছে কার কতটুকু হবে এ সম্পর্কেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কারভাবে আল-কুরআনুল কারীমে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানা এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা। আর তাহলেই আমরা পেতে পারি একটি সুন্দর শান্তিময় পৃথিবী।

স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার

স্বামীর কাছ থেকে সুন্দর ব্যবহার পাওয়া স্ত্রীর হক। স্ত্রীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। কর্কশ ভাষা ব্যবহার অনাকাঙ্ক্ষিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বামীদেরকে নির্দেশ দেন :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"তোমারা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে ভাল ও সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৯)

স্ত্রীর সাথে যার ব্যবহার ভাল নয়, সে আসলে ভাল পুরুষ নয়। স্ত্রীর সাথে যার ব্যবহার যত ভাল, সে আল্লাহর কাছে ততই নৈকট্যশীল। তাই পুরুষদের উচিত স্ত্রীর সাথে নম্র ব্যবহার করা। তার সাথে রাগারাগি না করা। কখনও স্ত্রীর কোন কথা-কাজ স্বামীর পছন্দনীয় না হলে তাকে বুঝিয়ে দেয়া, কয়েকবার করে বলে দেয়া এবং বাসায় মেহমান বা অন্য কারো সামনে কোন ত্রুটি নিয়ে আলোচনা না করা । মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার আছে পুরুষদের উপর। তবে নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২২৮)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنَّ الْمَرْاَةَ كَالضِّلَعِ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ تَرَكْتَهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلٰى عِوَجٍ.

স্ত্রীলোক পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সমতুল্য। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি ফেলে রাখ (সোজা করার চেষ্টা না কর) তবে তার বাঁকা অবস্থায়ই তুমি ফায়দা উঠাতে পারবে। (জামে আত-তিরিমিযী, আবওয়াবুত তালাক ওয়াল লিআন, হা. নং-১১২৮, বিআইসি)

আল-কুরআনুল কারীমের আলোচনা ও হাদীসের আলোকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো অবশ্যই স্বামী স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে নতুবা আল্লাহর আদেশ ও নাবীর তরীকা অমান্য করার অপরাধে তাকে আসামীর কাতারে দাঁড়াতে হবে।

মাহর প্রদান

মুসলিম সমাজে বিবাহ বন্ধন উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীকে নগদ অর্থ বা স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে যা দেয় তা মাহর। মাহর প্রদান স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে পরিষ্কার নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا.

"তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ত্রীদেরকে তাদের মাহর প্রদান করবে। তারা সন্তুষ্টচিত্তে মাহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ০৪)

আজকাল কোন কোন সমাজে এ মাহর কন্যা পক্ষের পিতা-মাতা ছেলে পক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকে। এতে শুনা যায়, মাহর ১০ বা ১৫ লক্ষ বা ৯,৯৯,৯৯৯ টাকা। এর কম হলে কন্যা পক্ষের ইজ্জত-সম্মান থাকবে না। কারণ অমুকের মেয়ের বিবাহ হয়েছে এত টাকা মাহরে বা আমি ঐ বিয়ের নেতৃত্ব দিয়েছি সেখানে মাহর ছিল অত টাকা; আজ আমার মেয়েরটা কম হলে হবে কী করে? এভাবে শুরু হয় দ্বন্দ্ব বা দর কষাকষি।

এক্ষেত্রে ছেলের আর্থিক অবস্থা, উপার্জন ক্ষমতা মাহর পরিশোধের জন্য কতটুকু যথার্থ তা বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না। বরং ছেলে পক্ষ আপত্তি করলে কন্যা পক্ষ বলে থাকে আরে এটা আর এমন কী? মেনে নাও বিয়ে হয়ে যাক। মাহর তো কাগজে কলমে লেখা জিনিস মাত্র, এটাতো আর পরিশোধ করতে হয় না। তার মানে অব্যক্ত হলেও বুঝা যায়, ইসলামে যে বলা হয়েছে মাহর পরিশোধ করতে হবে এটি ঠিক না নাউযু বিল্লাহ। এখানে কন্যা পক্ষের মন-মানসিকতা হলো লৌকিকতার খাতিরে সমাজে গর্ব-অহংকার করে বেড়ানোর জন্যে এটি বেশি করে ধার্য করতে হবে নতুবা এ বুঝি জাত গেল! আর এভাবে ইসলামী রীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বিয়ে হওয়ার কারণেই অধিকাংশ দাম্পত্য জীবন অসুখের হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়ছে, মহব্বত, দয়া-মায়া, ভালবাসা সৃষ্টির স্থলে রাগারাগি, হাতাহাতি, মারামারি সৃষ্টি হচ্ছে।

মাহরের পরিমাণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

দশ দিরহামের (১০ দিরহাম = সমসাময়িক টাকার অংকে হিসাব করতে হবে) কম মাহর হতে পারে না। (সূত্র : হিদায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪)

মাহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ কত হবে তা ইসলামে নির্ধারিত করে কিছু বলা নেই। তবে এ সম্পর্কে আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُوْنَه بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

"যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করবে?" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ২০)

সর্বাবস্থায় ইনসাফ করা

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের প্রতি ইনসাফ করা আল্লাহর হুকুম এবং স্বামীর কাছে এটি স্ত্রীদের হক।

ইসলামী বিধানে একজন পুরুষ যদি সমুদয় হক পরিপূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে তাহলে একসাথে সর্বোচ্চ চার জন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের ভরণ-পোষণের সাম্য, বাসস্থান, পোশাক, প্রয়োজনে চিকিৎসা এবং তাদের সাথে রাত্রি যাপন পর্যন্ত হতে হবে ইনসাফভিত্তিক। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজ-সামাজিকতার, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার বেড়াজালে চারজন স্ত্রীর হক পরিপূর্ণ করা এক সাথে যে কোন মানুষের পক্ষেই কষ্টকর। কেননা মানুষ নিজ প্রবৃত্তির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে এমনিতেই হিমশিম খায়। তাই এ প্রসঙ্গে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১২৯)

আমাদের প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীদের প্রয়োজন এবং তাদের সাথে রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সব সময় সমতা রক্ষা করতেন।

এটা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে বেশি ভালবাসতেন। তিনি ইন্তিকালের পূর্বে জিজ্ঞাসা করেন, আগামীকাল কার ঘরে আমার পালা? নাবী পত্নীরা প্রশ্নেই বুঝে গেলেন তিনি আয়িশার (রা) ঘরে যেতে চান। তাঁরা সবাই ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিজেদের দিককে উপেক্ষা করে আয়িশার (রা) পক্ষে অভিমত দেন। এরপর সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ এবং সাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্ক ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেননি। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে :

عَنْ عَائِشَةَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ

هٰذِهٖ قِسْمَتِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে পালা বণ্টন করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমার সাধ্য অনুযায়ী এই আমার পালা বণ্টন। যে ব্যাপারে কেবল তোমারই পূর্ণ শক্তি রয়েছে, আমার কোন শক্তি নেই। সেই ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার কর না। (জামি' আত-তিরমিযী, আবওয়াবুন নিকাহ, হা. নং-১০৭৮, বিআইসি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

اِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَاَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ.

যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে সে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে সে কিয়ামাতের দিন তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় হাজির হবে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুন নিকাহ, হা. নং-১০৭৯, বিআইসি)

স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া

স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাকে কোন অবস্থায়ই কষ্ট না দেয়া স্বামীর কাছে তার ইসলামসম্মত হক। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন তাদের মিলন ও আবেগ-অনুভূতির শক্তিশালী উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সদয় ব্যবহার, সদাচার ও সকল ক্ষেত্রে সমঝোতার মনোভাব দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা, দয়া-মায়া, প্রাণ ও কর্ম চাঞ্চল্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং গতিশীল রাখে। সন্তানের জীবনকেও করে তোলে প্রাণবন্ত।

অন্যদিকে খারাপ আচরণ, তর্ক-বিতর্ক, বকাবকি, প্রভুত্ব বিস্তারের নেশা, অধীনস্থ করে দাবিয়ে রাখার পায়তারা, বিদ্বেষ-বিদ্রূপের তোপধ্বনি উভয়ের সুন্দর সম্পর্কে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়, পরিণামে অশান্তি, অস্থিরতা ও অমানিশার কালো মেঘ মনের উপর ভর করে। এতে দয়া-মায়া, ভালবাসা, মহব্বত চিরতরে বিদায় নেয়। তাছাড়া স্ত্রীদেরকে কখনোই খারাপ ভাষায় বা স্ত্রীর পিতা-মাতাকে সম্বোধন করে বকাবকি করা উচিত নয়। শারী'আত স্বীকৃত কারণ ছাড়া কখনো তাদেরকে প্রহার করা উচিত নয়।

স্ত্রীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করা

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সরাসরি বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর কাছে স্ত্রীর হক। এগুলো যে কোন স্বামীকেই তার স্ত্রীর প্রতি যত দিন সে বেঁচে থাকবে, তার আয়ত্তে থাকবে তত দিন বহন করে যেতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীর যদি দীন সংক্রান্ত জ্ঞান কম থাকে বা নও-মুসলিম হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য দীনের শিক্ষা অর্জন করার ব্যবস্থা করাও স্ত্রীর হক। এ হক পূরণে স্বামীকে সদা তৎপর এবং হালাল উপার্জনের তালাশ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ.

"তোমরা তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী এমন বাসস্থানে রাখ, যেখানে তোমরা নিজেরা থাক।" (সূরা আত্-তালাক, ৬৫ : ০৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّن سَعَتِه.

"সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী (স্ত্রীর জন্য) খরচ করবে।" (সূরা আত্-তালাক, ৬৫ : ০৭)

স্ত্রীর এ হক প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلى وَاَبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ الْمَرْاَةُ اِمَّا اَنْ تُطْعِمَنِيْ وَاِمَّا اَنْ تُطَلِّقَنِيْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اَطْعِمْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ وَيَقُوْلُ الاِبْنُ اَطْعِمْنِيْ اِلى مَنْ تَدَعُنِيْ.

সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। আর নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ। নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর। এটা কি ভাল কথা যে, স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও। কাজের লোক বলবে, আগে খাবার দাও, পরে কাজ লও। সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ? (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুন নাফকাত, হা. নং-৪৯৫৫, আ.প্র.)

উল্লিখিত আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসের আলোকে স্ত্রীর এ হক পালনে তাকেও স্বামীর অর্থ উপার্জন বা আয়ের মাত্রার দিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। আজকাল অনেক পুরুষের অভিমত হচ্ছে স্ত্রীর চাহিদাকে আঞ্জাম দিতে গিয়ে তাদেরকে হিমশিম খেতে হয়। ফলে বাধ্য হয়ে হারাম পথে উপার্জন বা দুর্নীতির সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত হতে হয়– যা নাজায়িয। অন্যদিকে স্ত্রী যদি দীনদার হয়, তাঁর চাহিদা যদি স্বামীর জন্য সহনশীল হয়, সে যদি স্বামীর ইচ্ছার ওপর তার চাহিদাগুলোকে ছেড়ে দেয়; তাহলে কোন স্বামীকে অসৎ পথে উপার্জনের পথে পা বাড়াতে হবে না। স্বামীকে অন্যের হক হরণ করতে হবে না। স্বামীর উপর অন্যের যে হক আছে তা সে শারী'আত মত আদায় করতে পারবে।

পরিবেশ পরিবর্তনে বেড়ানোর সুযোগ দেয়া

শৈশবে মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে রেখে ঘুর-ঘুর করা, বাল্যকালে কুত-কুত, গোল্লাছুট আর কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা, চারদিকে দৌড়াদৌড়ি, হৈ-হুল্লোড় করে

বাড়ি মাতোয়ারা; আম, জাম, লিচু কুড়ানো আর জাতীয় ফল কাঁঠাল খাওয়ার সে যে দৃশ্য হাতে আঠা, মুখে আঠা তৈল নিয়ে মাখামাখি করা, কৈশোরে পড়ালেখার কড়া চাপ, পিতার শাসানি, মায়ের আদর মাখা বকুনি এমনি করে যৌবনে পদার্পণ আর তখনি বিয়ে– নতুন এক জীবন, নতুন পরিবেশ, পৃথক করে দিল সেই মাতৃসম পরিবেশ। আসলে বিধির বিধান তো মেনে নিতেই হয়। আজ আর সে যে ছোট নয় সে এখন স্বামীর সংসারে একজন গৃহবধূ একটু এগিয়ে একজন শ্রদ্ধাময়ী সৌভাগ্যবান মা। কিন্তু শৈশব-কৈশোরের সেসব স্মৃতিকে তো আর ভুলে থাকা যায় না। আর তাইতো একটু দাবি ব্যক্তকরণে হক, দৃঢ়করণে অধিকার, আমাকে যেতে দিতেই হবে নইলে যে...।

না... না এভাবে বলার দরকার নেই। প্রকৃত অর্থেই একটু বেড়াতে যাওয়া মন-মানসিকতা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। এটি ইসলামসম্মত স্ত্রীর হক।

তবে স্ত্রীকে খেয়াল রাখতে হবে এ দাবি যেন স্বামী, সন্তান বা বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে উপেক্ষা করা না হয়। তাহলে কিভাবে?

❖ পরিবেশ পরিবর্তন, মন-মানসিকতার পুনঃগঠন দায়িত্বে মনোযোগপ্রবণ হওয়ার লক্ষ্যে যেখানেই বেড়াতে যেতে চান না কেন এতে অতিরিক্ত টাকা খরচ হবে। এ টাকা আঞ্জাম দেয়া সেই সময়ে স্বামীর পক্ষে সম্ভব কিনা খেয়াল রাখতে হবে। যদি এ বেড়ানোর খরচ কেন্দ্র করে স্বামীকে ঋণ বা কর্জ, ঘুষ বা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় তাহলে এমন বেড়ানোর কথা না বলা উত্তম। তাছাড়া কোন আদর্শবান স্ত্রীই তাঁর স্বামী ঘুষ বা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জগতের আদালতে এবং আল্লাহর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াক এমনি চায় বলে মনে হয় না।

❖ সন্তানদের পড়ালেখা উপেক্ষা করে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন সময় বিশেষ করে শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু আরো কত কী সবই খাই তবু ভাল লাগে আরেকটু খাইতে পারলে মন্দ কী) বেড়াতে যাওয়া কতটুকু ঠিক হবে? কারণ এ সময়ে প্রচণ্ড গরমে ছেলে-মেয়েরা অসুস্থ হওয়া, রৌদ্রের প্রখর তাপে গায়ের রং কালো হয়ে যাওয়া, দাদু-নানুর বাড়ি গ্রামের দিকে হলে সেখানে যেয়ে গ্রাম্য কথা চর্চা (কথ্য কথা, আঞ্চলিক কথা) করাসহ পড়ালেখার দারুণ ক্ষতি হতে পারে। তবে বছরের শেষের দিকে স্কুল, কলেজে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে বেড়াতে যাওয়া উত্তম।

অন্যদিকে বেড়াতে যেতে চাওয়া স্ত্রীদের হক। এ হক আদায়ের ভাষা হতে হবে

সুন্দর, নমনীয়, হৃদয়গ্রাহী, প্রাঞ্জল এবং উপস্থাপনা হতে হবে মায়াবী ভাষায়। আর তখনই জগতের প্রত্যেক স্বামীর সুন্দর মন নিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীর হক আদায়ে হবে সচেষ্ট।

আত্মীয়-স্বজনের হক

আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকজনই আত্মীয়। অন্যকথায়, রক্তের সম্পর্কের সাথে যারা সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ যারা ওয়ারিশ সূত্রে উত্তরাধিকার ভোগ করে বা করতে পারবে তারা সবাই আত্মীয়। কারো কারোর মতে, শুধু মাহরাম ব্যক্তিরাই আত্মীয়, আবার অন্যদের মতে অমাহরাম ব্যক্তিরাও আত্মীয় হতে পারে।

এবার অগ্রাধিকারযোগ্য মতামত হলো, মাহরাম-অমাহরাম নির্বিশেষে সবাই আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তা না হলে চাচাত ভাই, খালাত ভাই ও ফুফাত ভাই দূরের হয়ে যায়। আসলে তা ঠিক নয়। কেননা তারা যে আত্মীয় এটা সর্বজন স্বীকৃত।

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ

আত্মীয়দের হক আদায়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে সুন্দরভাবে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করতেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বারোপ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه.

"আত্মীয়দের হক আদায় কর।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেন :

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّه ذَوِى الْقُرْبٰى.

"তারা ধন-সম্পদের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনদের দান করে।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৭৭)

উল্লেখিত আয়াতগুলোর নির্দেশ মেনে যারা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদয় হবে, তাদের হকের ব্যাপারে সচেতন হবে তারাই কামিয়াব হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর দাও আত্মীয়কে তার হক এবং মিসকীন ও পর্যটককেও। এটা শ্রেয়

তাদের জন্য, যারা আকাঙ্ক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা আর-রূম, ৩০ : ৩৮)

এরপরও যারা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ আচরণ করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে তাদের হক বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদেরকে সহ্য করতে চায় না; তাদের অসুখের কথা শুনলে বা তাদেরকে দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায় তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহর কঠোর ঘোষণা হলো :

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْۢ بَعدِ مِيْثَاقِه وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللهُ بِه اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الاَرْضِ اُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।" (সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২৫)

এবার মানবতার কল্যাণকামী প্রিয়নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ اِشْتَكى اَبُو الدَّرْدَاءِ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ خَيْرُهُمْ وَاَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ اَنَا اللهُ وَاَنَا الرَّحْمنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবুদ্ দারদা (রা) রোগাক্রান্ত হলে 'আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তাঁকে দেখতে আসেন। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, আমার জানা মতে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা ব্যক্তি হলেন আবু মুহাম্মাদ ('আবদুর রহমান)। 'আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পরিপূর্ণ কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমিই আল্লাহ এবং আমিই রাহমান। আমিই আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে নির্গত করে এই নাম (রাহমান থেকে রেহেম) রেখেছি। যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার থেকে (রহমতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৫৭, বিআইসি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

اَلرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ :مَن وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ.

আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে। সে বলে– যে আমার সাথে মিলিত হয় আল্লাহ্ তার সাথে মিলিত হয়; আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (সহীহ মুসলিম, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৩৭, বিআইসি)

مَنْ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক সে যেন আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করে। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৪২, বিআইসি)

لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْ عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিন্ন করো না। বরং এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৪৮, বিআইসি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে উল্লেখিত বাণীগুলো জানার পরও যারা সম্পর্ক যথাযথভাবে রাখবে না তাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৩৯, বিআইসি)

তারপরও আত্মীয়দের সাথে এমন দুঃসম্পর্ক যেন না হয় সেজন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো নির্দেশ দেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَافَسُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

তোমরা অবশ্যই কু-ধারণা ও অনুমান থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িও না। গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না। কান কথা বলো না। পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রেখো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে সবে ভাই ভাই বনে যাও। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৫৩, বিআইসি)

আত্মীয়দের হক আদায়ের পন্থা

আত্মীয়দের হক বিভিন্ন উপায়ে আদায় করা যায়। কোন সময় বেড়ানোর মাধ্যমে, কোন সময় আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে, কোন সময় রোগী দেখার মাধ্যমে, কোন সময় দাওয়াত গ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়া খুশীর মুহূর্তে অভিনন্দন জানানো, দুঃখের সময় সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ, ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা, তাদের সন্তান থাকলে পড়ালেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, শিক্ষার্থী মেধাবী হলে সুন্দর পরামর্শ দেয়া, তাদেরকে এগিয়ে যেতে, সফলতা অর্জন করতে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দেয়া (পিতা-মাতা খারাপ, তাদের সাথে কথা মিলে না এমন মনে করে তাদের সন্তানদের হক হরণ না করা) ঈদে তাঁদের মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করা এবং রোগ হলে সেবা করার মাধ্যমে আত্মীয়তার হক আদায় করা যায়।

কারো যদি একজন ধনী ভাই ও দরিদ্র চাচা থাকে তাহলে সে ভাইয়ের সাথে সাধারণ আলোচনা ও কথাবার্তাই যথেষ্ট। আর সামর্থ্য থাকায় চাচাকে অর্থনৈতিক সাহায্য না দিয়ে শুধু কথা বললে আত্মীয়তার হক আদায় হবে না। আবার যদি উভয়ে দরিদ্র হয় তাহলে দরিদ্রাবস্থায় একে অপরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে। অক্ষমতার কারণে আর্থিক সাহায্য দেয়া জরুরি নয়। যদি কারো ভাই, চাচা ও চাচাত ভাই-বোন থাকে এবং তারা সবাই দরিদ্র হয়, আর যদি তাদের আর্থিক সাহায্য দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে যে বেশি নিকটবর্তী আত্মীয় তাকে সাহায্য দিতে হবে। আর অন্যদেরকে দেখাশুনা করে এবং ভাল কথা বলে আত্মীয়তার হক আদায় করবে। এখানে বলে রাখা ভাল, ফরয (তথা অবশ্য পালনীয়) দায়িত্ব পালনের পর যদি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা হয় তাহলে সেটা আরো বেশি উত্তম। যেমন : ধনী ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদেরকে দেখতে যাওয়াও আবশ্যক।

আবার নিকটতম আত্মীয় যদি আত্মীয়ের হক পূরণ না করে তাহলে দূরবর্তী আত্মীয়ের উপর সে অধিকার আপতিত হয়। যেমন : কোন ব্যক্তির যদি অবাধ্য সন্তান থাকে এবং ভাই থাকে, সন্তান যদি পিতার অর্থনৈতিক অভাব পূরণ না করে, বিপদে সাহায্য না করে কিংবা রোগে সেবা না করে, তাহলে ভাইয়ের ওপর সে দায়িত্ব অর্পিত হয়। অর্থাৎ সে দায়িত্ব সন্তান থেকে ভাইয়ের ওপর স্থানান্তরিত হয়। তখন যদি ভাই বলে, এটাতো তার সন্তানের দায়িত্ব, আমার নয়; তাহলে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দায়ে অভিযুক্ত হবে এবং গুনাহে কবীরা করবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা

আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে তাঁদের জন্য সাধ্যমত কল্যাণকর কাজ করা এবং তাঁদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

অপরদিকে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হলো, আত্মীয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার না করা, তাঁদের প্রয়োজনে বা বিপদে-আপদে, সমস্যা সমাধানে ধনবান আত্মীয়রা এগিয়ে না আসা।

এখানে বলে রাখা ভাল, আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে নেক কাজ আর সম্পর্ক ছিন্ন করা এ অপরাধ। অর্থাৎ নেক কাজ ত্যাগ করা। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করা।

তবে আলিমদের মতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক না রাখা আর তা ছিন্ন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। যা এভাবে প্রকাশ করা যায় :

❖ **সম্পর্ক রক্ষাকারী** : যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং যে তাকে দিতে অস্বীকার করে তিনি তাকে দান করেন, তার সাথে হাসি মুখে কথা বলেন, তার সংসারের খোঁজ-খবর নেন ইত্যাদি।

❖ **সমান সম্পর্ক রক্ষাকারী** : যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করে তিনি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং যে তাকে দেয় তিনি তাকে দেন অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের প্রতি সচেতন এবং সুসম্পর্ক রক্ষা করে জীবন ধারণ করা।

❖ **সম্পর্ক ছিন্নকারী** : যে নিজে সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং তার সাথেও কেউ সম্পর্ক রক্ষা করে না, যে নিজে দেয় না অন্য কেউ তাকে দেয় না তারা উভয়েই সম্পর্ক ছিন্নকারীর আওতাভুক্ত। সর্বাধিক কঠোর স্তরের ব্যক্তি হচ্ছে সে, যার সাথে অন্যরা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে কিন্তু সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অন্যরা তাকে দেয় কিন্তু সে দেয় না। দু'পক্ষে সমান সম্পর্কের যেমন অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি সমান বয়কটেরও অস্তিত্ব আছে। যে ব্যক্তি বয়কট শুরু করে তাকে সম্পর্ক ছিন্নকারী বলা হবে এবং যদি কেউ কারো ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে তাকে সমান সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা হবে।

চাচা-চাচীর কাছে ভাতিজা-ভাতিজীদের হক

পিতার আপন ভাই চাচা। যাদের শরীরে একই মায়ের রক্ত (দাদীর রক্ত) প্রবাহিত। ফলে একে অপরের গায়ের রং, কথা বলার ঢং, চলাফেরার গতি, চিন্তা-চেতনার ধরন ও মন-মানসিকতার প্রকৃতি সবকিছুই যেন কাছাকাছি। আর তাইতো লোক মুখে শুনা যায়, বাবার গায়ের গন্ধ চাচার গায়ে পাওয়া যায়। চাচাকে দেখলে যেন বাবাকে সামনে না পাওয়ার দুঃখ ভুলে থাকা যায়। আবার চাচার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আসেন চাচী তিনি যে পরম শ্রদ্ধাময়ী। একদম মায়ের সাথে তুল্য হওয়ার উপযোগী।

চাচা-চাচীর কাছে তাদের সন্তানের মতই কল্যাণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা, ছোট মানুষ হিসেবে আদর-ভালবাসা, প্রয়োজনে সামর্থ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি প্রত্যাশা করা ভাতিজা-ভাতিজী হিসেবে তাদের হক।

অন্যদিকে আপন ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর নাবালক ও অবুঝ সন্তানরা পিতা না থাকার কারণে ইয়াতীম, আত্মীয়ের হিসেবে নিকটতম আত্মীয়, প্রতিবেশী হিসেবে নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী। সুতরাং আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও আল-হাদীসে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম, নিকট আত্মীয় ও নিকটতম প্রতিবেশীদের যে সমস্ত হকের কথা উল্লেখ করেছেন তা সবই এখানে প্রযোজ্য। এর ব্যতিক্রম হলে অবশ্যই ঐ সমস্ত চাচা-চাচীকে আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ফলে চাচা-চাচী, ভাতিজা-ভাতিজীকে সব সময় তাদের পিতার স্নেহে আদর করে জীবনে সফলতার দিক-নির্দেশনা প্রদান, তাদের আদর্শ শিক্ষা নিশ্চিত করা, আল্লাহর হুকুম পালনে অভ্যস্ত করা, তারা বড় হলে শারী'আহ মুতাবিক বিয়ের ব্যবস্থা করা, ভাতিজী হলে পর্দার ব্যবস্থা করা, তাদের সাথে সুন্দর-সুন্দর কথা বলে মনকে হাসিখুশি রাখা, অসুস্থ হলে সেবা ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা (আলহামদু লিল্লাহ বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলিম পরিবারেই এমন অবস্থা বর্তমানে বিরাজমান আছে) ভাতিজা-ভাতিজী হিসেবে তাদের হক।

ভাতিজা-ভাতিজীদের কাছে চাচা-চাচীর হক

হক পারস্পরিক। একজনের হক আরেকজনের কাছে, আরেকজনের হক ঐ একজনের কাছে। এক্ষেত্রে ভাতিজা-ভাতিজীর কাছেও চাচা-চাচীর হক রয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে তারা তো ছোট, অনেক ক্ষেত্রে পিতাহীন। তারা তো চাচা-চাচীর মুখাপেক্ষী (দীনের বুঝ বুঝার পূর্ব পর্যন্ত) সুতরাং তাদের কাছে আবার হক কী? হ্যাঁ। তাদের কাছে চাচা-চাচীর হক হলো, তারা কখনো চাচা-চাচীদের সাথে আদবের বিপরীত কোন কাজ করবে না; কথা বলার ক্ষেত্রে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য কথা বলবে। কোন ভুল হলে দুঃখ প্রকাশ করবে। প্রয়োজনে ক্ষমা চেয়ে নেবে। চাচা-চাচীকে নিজ পিতা-মাতার মত মর্যাদা দিয়ে কথা বলবে। কোন চাচা-চাচীই ভাতিজা-ভাতিজীদের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করে বলে মনে হয় না।

চাচাত ভাই বোনের একে অপরের হক

এক চাচার ছেলে-মেয়েদের সাথে অন্য চাচার ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক হলো চাচাত ভাই-বোন। এ চাচাত ভাই-বোনদের মধ্যে যারা বয়সে বড়, যারা শিক্ষিত,

মেধাবী তাদের কাছে স্বভাবতই যারা ছোট তাদের হক আছে। তারা বলতে গেলে একই পরিবারভুক্ত, অন্যদিকে নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী হিসেবে তারা হকদার। এ পর্বে তাদের কেউ যখন পড়ালেখা করতে পারছে না; সম্ভব হলে তাকে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দেয়া, অসুস্থ হলে ঔষধ কিনে দেয়া, দরিদ্র হলে খাদ্যের সংস্থান করে দেয়া, কর্মী হলে কাজের সংস্থান করে দেয়া আবশ্যক। এছাড়াও ইসলামী বিধান অনুসারে দরিদ্রদের জন্য ইসলামের যে হুকুম তাতেও তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হকদার। আজকাল কোথাও-কোথাও দেখা যায়, এটা সেটা নিয়ে সাময়িক দ্বন্দ্বে অথবা চাচাত ভাই-বোন উপরে উঠে যাবে এমন মনে করে তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হয় না। আবার সাহায্য করলেও ছোট-খাট বিষয়ে বা খাবারের ক্ষেত্রে করা হয় কিন্তু পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবন গঠনের লক্ষ্যে পড়ালেখা বা ট্রেনিং-এ ব্যয় করা হয় না। কিন্তু লক্ষ্য করুন, আজ যদি আপনি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করেন আর আপনার চাচাত ভাই রিক্সা চালায় বা মজুরী করে তাহলে সে আপনাকে যে সম্মান দেখানোর কথা তাতো দেখাতে পারবেই না অধিকন্তু আপনি যখন বহু দিন পর উচ্চ শিক্ষা শেষে বা বিদেশ থেকে বা শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন তখন মানুষ কি এমনটি বলবে না সে হচ্ছে অমুকের চাচাত ভাই। কারণ গ্রামের বাইরে অবস্থান করায় আপনাকে হয়তো অনেকেই চিনেই না। এক্ষেত্রে আপনার ইজ্জত-সম্মান কতটুকু থাকল? সুতরাং যেহেতু মুছে ফেলা সম্ভব নয় সেহেতু কি তাদের একটু আদর-ভালবাসা, সাহায্য-সহযোগিতা, দিক-নির্দেশনা, উপদেশ, পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে বুঝিয়ে একটা লেভেলে নিয়ে আসা উত্তম নয়? অবশ্যই ইসলামিক দৃষ্টিকোণে এটি তাদের হকও বটে।

খালা-খালুর হক

মায়ের বোন খালা। খালার জামাই খালু, খালার সাথে মায়ের মিল অনেক। আর তাই খালার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান পোষণ করতে হবে মায়ের অবস্থানে রেখে। পাশাপাশি খালাও অন্য বোনের ছেলে-মেয়েদেরকে নিজের ছেলে-মেয়ের মতই দেখবে।

খালা অর্থনৈতিক অবস্থানে দুর্বল হলে অন্য বোনের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সহযোগিতা করা, কোন একজন খালা দুর্বল হলে ঐ খালার ছেলে-মেয়েদের সম্ভব হলে পড়ালেখা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করা তাদের হক।

অন্যদিকে খালাও আবার অন্য বোনের ছেলে-মেয়েদেরকে নিজের ছেলে-মেয়ের মতই আদর করবে; তাদের জীবনে সফলতার জন্য দু'আ করবে।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الاُمِّ

খালা হল মাতৃস্থানীয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৫৩, বিআইসি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরা বলেন :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا.

ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তাওবা করার সুযোগ আছে? তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : তোমার খালা জীবিত আছে কি? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন : তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (জামে আত্-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৫৪, বিআইসি)

ফুফু-ফুফার হক

পিতার আপন বোন ফুফু। ফুফুর স্বামী ফুফা। ফুফু নিজ ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের ছোটবেলা কোলে, পিঠে বড় হতে সহায়তা করে থাকে, হৃদয় নিংড়ানো আদর-সোহাগ আর কপালে, দু'গালে চুমো একে ছোট্ট সেই মানুষ নামের অসহায় জীবকে যখন তিলে-তিলে বড় করে তোলে তখন স্বাভাবিকভাবে ফুফু তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাজনক আচরণ, পিতার বোন হিসেবে পিতাতুল্য আচরণ প্রত্যাশা করতেই পারেন। আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসে কোথাও কারো সাথে কারো দৃষ্টিকটু আচরণ সমর্থিত হয়নি। এমনকি দূর সম্পর্কের, অমুসলিম, কাফিরের সাথেও নয়। সেখানে আজকাল কতিপয় পরিবারে দেখা যায়, এক শ্রেণির ভাইয়ের মেয়ে-ছেলেরা তাদেরই পিতার বোনের সাথে নিজেদের দাম্ভিকতা বা না বুঝে বড়ত্ব প্রকাশ করে থাকে– যা দুঃখজনক। কেননা ধরে নিলাম, তারা পড়ালেখা শিখে বড় হয়েছে কিন্তু কতটুকু বড়! এইতো সেদিন ছিলে বড়ই অসহায় একজন কোলের শিশু একটু চিন্তা করো না! তারপর তোমার পিতার এই আছে সেই আছে কিন্তু কেন ভুলে যাও তোমার পিতা মানে তো তোমার ফুফুরই ভাই। ক্ষেত্র বিশেষে ফুফু মানে যিনি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আদর সোহাগ দিয়ে তোমার বাবাকে বড় করেছেন। তোমার জন্মের আগে থেকেই তো সে

তাকে চিনে জানে। তার সাথে তার রক্তের সম্পর্ক আছে। আর এজন্য ফুফু, চাচী, খালা তাদের নামের সাথে একটা শব্দ যোগ হয়ে যায় অটোমেটিকেলি যা সবচেয়ে প্রিয় শব্দ তা হলো মা বা আম্মা। সুতরাং সম্মান প্রদর্শনের স্থলে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাদের হক হরণ করা, তারা বেড়াতে আসলে তাদেরকে দূর দূর ছে-ছে করা কোনভাবেই ইসলাম সম্মত নয়। এতে নিকটাত্মীয়দের হক হরণ করার অপরাধের ফলে আল্লাহর কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে।

দাদা-দাদীর হক

আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসে হাক্কুল ইবাদ বা মানুষের হক বলতে প্রথম যাদের হক আলোচনা করা হয়েছে তারা হলেন পিতা-মাতা। সন্তানের কাছে পিতা-মাতার হক কী হবে বা কতটুকু হবে তা সকলেরই জানা। কিন্তু সেই পিতা-মাতা যখন সময়ের ব্যবধানে বয়স গড়িয়ে বৃদ্ধ, উপার্জনে অক্ষম, সন্তানদের উপর নির্ভরশীল, সন্তানদের সন্তানরাও তখন বড় হচ্ছে হয়তোবা তারাও উপার্জনক্ষম তখন তাদের কাছে বৃদ্ধ দাদা-দাদীর কোন হক আছে কিনা বা থাকলে কেমন? কোন ধরনের? কিভাবে তা আদায় করা যায়– সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

যে সমস্ত পরিবারের সন্তানেরা পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে, কখনো কষ্ট দেয় না বা কষ্ট হবে এমন কোন কাজ করে না, কথা বলে না, তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে মান্য করে সে সমস্ত পরিবারের নাতী-নাতনীরাও তাদের দাদা-দাদীর সাথে সুন্দর আচরণ করে থাকে। এটাই হলো মূলতঃ সুশিক্ষা, সুশিক্ষার রেশ বা ধারা অথবা সুন্দর পরিবেশের ফল। কিন্তু ব্যতিক্রম বেশি বলেই এ আলোচনা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বৃদ্ধ দাদা-দাদীর সাথে তাঁদের আচরণ হয়ে থাকে এমন– বুড়ো মারা গেলেই বাঁচি। বুড়াকে এখন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান, সুন্নাতে খাতনা ও জন্ম দিনের অনুষ্ঠানে নেয়া যাবে না, সে আনফিট ইত্যাদি– যা দুঃখজনক। বয়সের ব্যবধানে সবাইকেই একদিন বৃদ্ধ হতে হয় বা হতে হবে। তাই বলে আজ তারা যখন তোমাদের (নাতী-নাতনী) কোলে তুলে নিতে পারছে না, মজার মজার খাবার দিতে পারছে না, ছেলে মানুষিকতার নাচানাচি, ব্যান্ডের গানের তালে-তালে লাফালাফি, টেলিভিশনে নাচ-গান দেখাদেখিসহ অন্য যা অসচ্চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত তা যখন পছন্দ করছে না তখন কিনা আজ তারা খারাপ। তাদের বাসায় রাখা যাবে না, বাসায় থাকলেও কোণায় ছোট্ট এক কক্ষে,

সেখান থেকে বের হতে দেয়া যাবে না অথবা গ্রামের বাড়িতে কুঁড়ে ঘরে অথবা শহরে হলে বাসার বাইরে বৃদ্ধাশ্রমে (ওল্ড কেয়ার হোমে) বছরের পর বছর পড়ে থাকতে হবে ইত্যাদি- যা হৃদয়বিদারক।

বরং বৃদ্ধ বয়সে তারা যখন মৃত্যুর কাছাকাছি তখন তাদের খেদমত, সুন্দর আচরণ, যথাসম্ভব তাদের রুচি মাফিক খাবার দেয়া, শুধু কাজের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে নয় নিজেরাও যতক্ষণ বাসায় আছি ততক্ষণ তাদের প্রতি খেয়াল রাখাই তাদের হক। এ হক আদায়ের মধ্য দিয়ে তাদেরকে খুশি রেখে দু'আ কেড়ে নেয়ার একটা শুভ প্রতিযোগিতা নাতী-নাতনীদের মধ্যেও থাকা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যা ভোগ-ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম হলো তোমাদের নিজস্ব শ্রমের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা.নং-২২৯০, আ.প্র.)

নানা-নানীর হক

নিজের গর্ভধারিণী মায়ের পিতা-মাতা হলো নানা-নানী। তাদের হক আদৌ নাতী-নাতনীর কাছে আছে কিনা এ বিষয়ে মীমাংসা করার লক্ষ্যে আমি এভাবে বলব মায়ের বাবা নানা, মায়ের মা নানী- এ দু'জনেই মায়ের কাছেও শ্রদ্ধার আসনে আসীন। কেননা আমরা আজ যার গর্ভের সন্তান হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি তিনি তাঁদের সন্তান। কাজেই সম্মান কার কতটুকু তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। হাঁ, অবশ্যই গর্ভধারিণী মায়ের বেশি যেহেতু তিনি প্রসবকালীন অনেক কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু সেবা করে অসহায় ছোট্ট এ নাতী-নাতনীকে তো বড় করে তুলল সেই মায়ের মা নানী, বাবার মা দাদী, মায়ের বাবা নানা, বাবার বাবা দাদা। কাজেই আজ কি করে তাদেরকে ভুলি? এ দু'পক্ষ! কখনো নিজ মা-বাবা রাগ করে সন্তানের চিৎকার বা অনৈতিক দাবি ও কর্মে রাগান্বিত হয়ে জোরে ধমক বা একটা থাপ্পড় পর্যন্ত নাতী-নাতনীর গায়ে দিতে দেয়নি। সেদিনগুলোর কথা কিভাবে ভুলে থাকি, যা চেয়েছি, একটু হাত বাড়িয়েছি, একটু তাকিয়ে রয়েছি, তাদের মনে হয়েছে আমাদের নাতী-নাতনী বুঝি তা পছন্দ করে বেশি তাই তারা তা দিয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে আজ

তাদের শারীরিক অপরাগতার কারণে কোন কিছুতেই অবজ্ঞা না করে খুশি রেখে হাসি মুখে কথা বলাই তাদের হক।

মামা-মামী ও ভাগিনা-ভাগিনীর পারস্পরিক হক

মায়ের ভাই হচ্ছে মামা, মামার স্ত্রী মামী। বোনের ছেলে ভাগিনা আর মেয়ে ভাগিনী। প্রত্যেক সন্তানদের কাছে মামার বাড়ি হলো নিকটতম আত্মীয় এবং বেড়ানোর জন্য অত্যন্ত প্রিয় স্থান। ইসলামে নিকট আত্মীয়ের যে হকের কথা বলা হয়েছে এখানেও ঠিক তাই কার্যকর করতে হবে। নতুবা পাপগ্রস্ত হতে হবে। এবার ভাগিনা-ভাগিনীদের দায়িত্ব হলো নিজ গর্ভধারিণী মায়ের সাথে রক্তের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ মামাদেরকেও সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, ভাগিনা-ভাগিনী প্রতিষ্ঠিত হলে আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে আর মামারা দুর্বল হলে তাদের যতটা সম্ভব অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে দাওয়াত দেয়া, কোনভাবেই তাদের মনে কষ্ট আসবে এমন কোন কাজ, কথা বা আচরণ না করা, সব সময় মাথায় রাখা মুসলিম হিসেবে যেহেতু আখিরাতকে আমরা বিশ্বাস করি সুতরাং সেখানে অবশ্যই আমাদের সবকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, বিচারও হবে। এবার ভাগিনা-ভাগিনী যদি বেড়াতে আসে মামা-মামী তাদের যদি মেহমানদারী না করে তাহলে অবশ্যই তাদেরকেও মহান আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

কেননা মানবতার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কারভাবে ভাগিনাদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

আনাস ইবনে মালিক (রা) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ভাগিনা নিজ নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবে। (সুনানু নাসাঈ, যাকাত, হা.নং-২৬১৩, ই.ফা)

শ্বশুর-শাশুড়ির হক

কন্যা বিয়ে দেয়া বা ছেলে বিয়ে করানো দু'ভাবে উভয় পক্ষেই অভিভাবকগণ শ্বশুর-শাশুড়ি। এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি তাদের হায়াত দেন, তারা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে উভয় পরিবারের ক্ষেত্রেই তারা হলেন পিতৃ ও মাতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ। ফলে বাবা, মা ডাকের উপযোগী এ মানুষগুলো

পুত্রবধূ বা কন্যার জামাতাদের কাছ থেকে সম্মান প্রাপ্তি তথা বয়োঃসন্ধিকালে হাসি-খুশি কথা-বার্তা, তাঁদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা, সামগ্রিকভাবে সেবা-শুশ্রুষা, অসুস্থতায় খাবার মুখে তুলে দেয়াসহ সব সময় পাশে পাওয়া তাদের হক। (সুনানু নাসাঈ, যাকাত অধ্যায়, হা. নং-২৬১৩, ই.ফা)

শ্যালক-শ্যালিকার হক

স্ত্রীর ছোট ভাই-বোন শ্যালক-শ্যালিকা হিসেবে গণ্য। তারা ছোট হওয়ায় তাদের আদর্শ জীবন গঠন, আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রতি মতামত প্রদান, পরামর্শ দেয়া বড় বোনের জামাতা হিসেবে নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে শ্বশুর বয়োবৃদ্ধ হওয়া বা মৃত্যুবরণ করলে আর পরিবারে বড় ভাই না থাকলে এ দায়িত্ব কন্যার জামাতাদের উপর আসা স্বাভাবিক। তবে শারী'আহর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের দেখাশুনার ক্ষেত্রে একটা ব্যালেন্স করতে হবে। কেননা আমাদের সমাজে কতিপয় লোকজন শ্যালক-শ্যালিকার প্রতি এমনভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকে– যা নিজের আপন ভাইদের হক হরণের পর্যায়ে চলে যায়। ফলে দুঃখ করে কোথাও আপন ভাই-বোনদেরকে বলতে শুনা যায় "ইস! আমরা যদি আপন ভাই-বোন না হয়ে ভাইয়ের শ্যালক-শ্যালিকা হতাম" তাহলে ভাইও আদর করত, ভাবীও আদর করত- যা দুঃখজনক।

শ্বশুর বাড়িতে কন্যার হক

জামাতা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে ছেলে হিসেবে গণ্য। সুতরাং কন্যা বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তা যেন অটুট থাকে সেদিকে উভয় পক্ষেরই রয়েছে কিছু করণীয়। প্রকৃত অর্থে, জামাতার হক বলতে যৌতুক প্রথাকে উৎসাহিত করা বা সমর্থন করা এ লেখার প্রতিপাদ্য নয়। যৌতুক ইসলামে নিষিদ্ধ। যৌতুক হলো যা চুক্তি করে, চাপ প্রয়োগ করে কন্যা পক্ষ যা দিতে অপারগ কিন্তু তা দিতে বাধ্য করা। অর্থাৎ এটা এক ধরনের শোষণ, অন্যায়, নির্যাতন। যৌতুক প্রথার মাধ্যমে মেয়ে পক্ষকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। তবে বিয়ের সময় নব দম্পতিকে তাদের ঘর সাজানো-গোছানোয় সাহায্য করার জন্য অনেক সময় নিকট আত্মীয়-স্বজন ও শ্বশুর-শাশুড়ি কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করে থাকে। এই উপহার সামগ্রী স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই নব দম্পতিকে প্রদান করা হয়। এখানে বাধ্যবাধকতা বা অন্য কোন চাপ প্রয়োগের প্রশ্নই আসে না। এটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত। হাদীসের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে জানা

যায় যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উপহার দেয়ার প্রচলন ছিল এবং তিনি তাঁর কন্যাদের বিয়ের সময় উপহার প্রদান করেছেন। 'আলী (রা) বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা (রা)কে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন একটি পাড়ওয়ালা কাপড়, একটি পানির পাত্র এবং একটি চামড়ার তৈরি বালিশ; যার মধ্যে তীব্র সুগন্ধিযুক্ত ইযখীর খড় ভর্তি ছিল।" (মুসনাদে আহমদ)

'আলী (রা) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে : নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব দ্রব্য ছাড়াও দুটি যাঁতা এবং একটি পাকা মাটির পাত্র ফাতিমা (রা)কে উপহার হিসেবে দান করেছিলেন।

উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা আহামাদুল বান্না বলেছেন, উপহার প্রদানের ব্যাপারে মধ্যম ধরনের নীতি অবলম্বন করা এবং এতে প্রাচুর্যের বাহুল্য না করে বরং যুগের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদানকে যথেষ্ট মনে করা আবশ্যক। (বুলুগুল আমানী, ১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭)

কনের পিতা বা বরের পিতা বা উভয় পক্ষের অভিভাবকের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় উপহার প্রদান ইসলামে বৈধ বলে গণ্য। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় ও সুন্দর হয়। কিন্তু এ নিয়ে বাড়াবাড়ি বা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাচুর্য প্রদর্শন ও অপরিমিত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

নারীর হক

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাবী, মানবতার কল্যাণকামী ও পৃথিবীর বুকে হক বা অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সফল অগ্রনায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর হক প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হলেন। আর প্রচার করে দিলেন নারী অধিকার সম্বলিত মহান আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা। ফলে বিনা আন্দোলনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পেল সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দেয় বৈধ অধিকার। আর তাই বলা হয়, সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইসলাম নারীর ধর্মীয় হক, রাজনৈতিক হক প্রভৃতির ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার ঘোষণা করে দিয়েছে। এ সকল হক বা অধিকার পাওয়ার জন্যে নারীকে চাইতে হয়নি, রাস্তায় নেমে আন্দোলন-মিছিল মিটিংও করতে হয়নি। এটাই হলো নারী জাতির জন্য সবচাইতে বড় পাওয়া, সম্মানের পাওয়া।

নারীর ধর্মীয় হক

ইসলাম ধর্ম নারী জাতিকে সম্মানের আসনে আসীন করে সেই ইসলাম পূর্ব জগতের সকল হক হরণ তথা অধিকার বঞ্চিত হওয়া থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। নারীও যে একজন মানুষ, মানুষ হিসেবে যে তাদের রয়েছে জীবনের প্রয়োজনে সকল ক্ষেত্রে হক বা অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা সে কথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের অনুকরণে বিশ্বের বুকে সকল সৃষ্ট জীবের হক প্রতিষ্ঠায় যিনি ছিলেন অগ্রনায়ক সেই নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কোথাও নারী ও পুরুষকে আল্লাহর নিয়ামত লাভে বা ভাল কাজের প্রতিদানস্বরূপ পুরস্কার প্রদানে কম-বেশি করার কথা বলেননি। বরং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারী যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।” (সূরা আন্-নাহ্ল, ১৬ : ৯৭)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَايُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

“পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে, তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।” (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১২৪)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

“অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক

স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (সূরা আল-আহ্যাব, ৩৩ : ৩৫)

মাসজিদে নামায আদায়ে নারীর হক

ইসলাম নারীদেরকে মাসজিদে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় নারীদের মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল। তারা জুমার নামায ও অন্যান্য নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু তাদের জন্যে মাসজিদে গিয়ে জুমাসহ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কারণ দুর্বল নারীর জন্য প্রতিদিন মাসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করা কষ্টকর। অথচ পুরুষের জন্যে প্রতিদিন মাসজিদে নামায আদায়ে বিশেষ ওজর ছাড়া বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে। এভাবে ইসলাম নারী জাতির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের মান-মর্যাদা উন্নত করেছে।

হায়েয অবস্থায় নারীর হক

ইসলামের বিধি-বিধানগুলো মধ্যপন্থীয়, ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত। ইসলাম একদিকে জাহিলিয়াত যুগের নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা ও বর্বরতা থেকে নারীদেরকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে, অন্যদিকে নাসারাদের কুৎসিত-ঘৃণিত, সীমালঙ্ঘনকারীর ন্যায় অসুস্থ অবস্থায় পুরুষদেরকে স্ত্রী গমন থেকে দূরে থাকার জন্যে পরিষ্কারভাবে একে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছে। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা অসুস্থতায় নারীর হক সংরক্ষণ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ.

"সুতরাং তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তীও হবে না। অতপর যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে সেভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২২২)

নারীর অর্থনৈতিক হক

পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই নারীর অর্থনৈতিক হক বা অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম নারী জাতিকে ধন-সম্পদে স্বত্বাধিকার দিয়েছে। যা নিম্নরূপ :

পিতা-মাতার সম্পদে নারীর হক

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পিতা-মাতার সম্পদে নারীর অর্থনৈতিক হক সম্পর্কে ঘোষণা করেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

"পুরুষদের জন্য ঐ সম্পদে হিস্যা রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে এবং মহিলাদের জন্যও ঐ সম্পদে হিস্যা রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, সে সম্পদ অল্পই হোক আর বেশিই হোক। এ হিস্যা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক নির্ধারিত অংশ।" (সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭)

ইসলাম নারীদেরকে পাঁচ জায়গায় ওয়ারিশ পাওয়ার হকদার বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভাই, স্বামী ও ছেলের নিকট থেকে নারী তাদের অর্থনৈতিক অধিকার পাবে।

নিকট আত্মীয়ের সম্পদে নারীর হক

ইসলাম নারীকে নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তিতে হকদার বলে ঘোষণা দিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করেছে। কেউ যদি কন্যা, বোন বা ফুফুকে তাদের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করে তবে সেজন্য সে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ও দোষী হবে, ইসলাম নয়। যদি কেউ এরূপ করে থাকে তবে সে মারাত্মক অপরাধী। কন্যা, বোন, ফুফু, ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় না করা অন্যের হক (হাক্কুল ইবাদ) হরণ করার শামিল। এজন্য ইসলামে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

মাহর ভোগ নারীর মৌলিক হক

নারীর অর্থনৈতিক হকের অন্যতম প্রধান হক হলো মাহর, যা বিবাহ মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মাহর পরিশোধ করে দেয়ার আদেশ প্রদান করে বলেন :

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا.

"তোমরা স্ত্রীদেরকে মাহর দিয়ে দাও খুশি মনে। তবে তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ০৪)

সুতরাং বিয়ে সম্পন্ন করতে স্ত্রীকে মাহর দেয়া ফারয। মাহর স্ত্রীর হক, তার

নিজস্ব সম্পদ আর তা স্বামীর জন্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণ বিশেষ। এ ঋণ কোন রকম শর্ত ভালবাসার ঊর্ধ্বে থেকেই পরিশোধ করা কর্তব্য। এবার স্ত্রী যদি খুশি মনে মাহরের দাবি ত্যাগ না করে, তবে স্বামীর পক্ষে অন্যের হক (হাক্কুল ইবাদ) হরণ করার গুনাহ হবে।

এমনকি কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে তালাকও দিয়ে দেয় এক্ষেত্রেও বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে দেয় অর্থ-সম্পদ-গহনা বা মাহর ফেরত নেয়াকে ইসলাম নারীর হককে হরণ করাই মনে করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

"তালাক হয়ে গেলেও তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মাহর ফেরত লওয়া হালাল নয়।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২২৯)

বরং বিধি মুতাবিক ইদ্দত পূর্তি পর্যন্ত ভরণ-পোষণ দেয়াও আল্লাহর হুকুম। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিধি মুতাবিক ইদ্দত পূর্তি পর্যন্ত ভরণ-পোষণ দেয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৪১)

নারীর চাকুরি লাভের হক

ইসলাম নারীকে ঘরের বাইরে চাকুরি করার অনুমতি দিয়েছে। তবে তাকে স্ত্রীধর্ম ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করায় উৎসাহিত করে। স্ত্রীধর্ম পালন করা এবং ঘরোয়া পরিবেশে মাতৃত্বের দায়িত্ব পূর্ণ করা হল নারী জাতির জন্যে মহান কাজ। তাই ইসলাম স্ত্রী ও মা-এর ভূমিকা পালন করাকে নারীর জন্য অপরিহার্য ও পবিত্ররূপে গণ্য করে।

নারী স্ত্রী-ধর্ম পালন করে বংশ বিস্তারের জন্য সুসন্তান জন্ম দেবে, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করবে, রক্ষণাবেক্ষণ করে সন্তানকে গড়ে তুলবে, অতঃপর আদর্শ শিক্ষা দিয়ে জাতিকে আদর্শ মানুষ উপহার দেবে এবং নিজের মাতৃত্বের আসন গ্রহণ করে সে সম্মানিত হবে। জাতি ও দেশের জন্য এর চেয়ে উত্তম কাজ আর কী হতে পারে?

তাছাড়া একটি কথা তো আমরা সকলেই জানি, মা হচ্ছেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক আর মায়ের সংসার হচ্ছে সন্তানের জন্য প্রথম এবং প্রধান বিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র। সুতরাং আদর-স্নেহ, ভালবাসা ও যত্নসহকারে সাবধানতার সঙ্গে মা কর্তৃক লালিত-পালিত শিশুর ভবিষ্যৎ অযোগ্য পরিবেশে দাসী, পরিচারিকা বা

চাকরানী অথবা নার্স কর্তৃক লালিত-পালিত শিশুর ভবিষ্যতের চাইতে অনেক উজ্জ্বল। শিক্ষিকারূপে দাস-দাসী, পরিচারিকা, চাকরানী বা নার্স কখনোই মায়ের স্থান দখল করতে পারে না। যার কারণে আমরা অনেক চাকুরিজীবি বা কর্মজীবি মায়ের ছেলে-মেয়েকে সন্ত্রাসী ও এক কথায় অমানুষ হতে দেখি। অবশ্য যে সকল মায়েরা শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত তাদের কথা ভিন্ন। কারণ তারা ঘরের বাইরেও শিক্ষক হওয়ার কারণে ঘরের ভেতরে বা বাসায় শিক্ষকতার কাজটি সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন। আর অন্যান্য পেশায় জড়িত মায়েদের সন্তান ভাল মানুষ হওয়ার চেয়ে খারাপই বেশি হয় বলে পত্রিকা পাঠে জানা যায়। তবে ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কিন্তু খুব বেশি খারাপ হওয়ার ভীড়ে কতিপয় ভাল মানুষ উদাহরণ হিসেবে স্থান পাওয়া যে কঠিন।

যাহোক, ইসলাম নারীর যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে চাকুরি লাভের হক বা অধিকারকে কখনোই নিষিদ্ধ করেনি। অবশ্যই নারীরা কাজ করতে পারবে এবং তার উপার্জিত অংশ তারই থাকবে। তার উপার্জিত অর্থে পুরুষ বা স্বামীর হক নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩২)

শুধু শর্ত হলো, নারীর শালীনতা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে নারীকে শারী'আতী পোশাক পরিধান করে, শারী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে পর্দার সাথে কাজ করতে হবে। শালীনতা রক্ষা করে চলতে হলে স্বভাবতই নারী এমন কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে না, যে পেশায় তার সৌন্দর্য এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন মডেলিং, নৃত্য, সিনেমায় অভিনয় এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজ।

অবশ্য পেশা ও কাজ নির্বাচনে বিধি-নিষেধ শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, পুরুষের জন্যেও বিধি-নিষেধ রয়েছে। এমন অনেক কাজ বা পেশা আছে যেগুলো নারীদের জন্যে নিষিদ্ধ, পুরুষের জন্যেও নিষিদ্ধ। যেমন জুয়া খেলা, মদের ব্যবসা, সিনেমা হলে চাকুরি বা ব্যবসা, হাউজি খেলা, বল ড্যান্স এবং যে কোন শারী'আত বিরোধী কাজ ও পেশা।

যে সকল পেশা নারী প্রকৃতির জন্যে উপযোগী, একই সাথে সমাজ কর্তৃক নারীর সেবা বা বৃত্তি গ্রহণ করার দরকার হয় সে সকল পেশা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতে ইসলামে নিষেধ নেই। যেমন যাদের শিক্ষকতা করার যোগ্যতা আছে,

যারা ডাক্তার বা নার্স হিসেবে কাজ করতে পারে, সমাজে তাদের খেদমতের প্রয়োজন আছে। নারীর প্রকৃতি হলো শিশুর প্রতি কোমলতা, ছোটদের প্রতি ভালবাসা ও তাদের যত্ন নেয়া, দুর্বল ও রোগীদের সেবা করা ইত্যাদি। কোমলতা, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা এগুলো নারীদের সহজাত ধর্ম, প্রকৃতির দান। তাই ধাত্রী ও সেবার কাজ করা, পরিচর্যার কাজ করা, সেলাইয়ের কাজ করা, ছোট ছেলে-মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা দেয়া, মহিলা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং নারীদের ওয়ার্ডে নারী ডাক্তারের চিকিৎসা করা নারীর প্রকৃতির অনুকূলে, মুসলিম সমাজে এ সকল পেশায় নারীদের কাজ করার চাহিদা অনেক।

নারীর পারিবারিক হক

নারী জীবনের বিশেষ হক বা অধিকার হলো নারীর সতীত্ব, সম্ভ্রমের সম্মান ও নিরাপত্তা। ইসলাম নারীর এই হককে কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর জন্য একাধিক আইন ও বিধি প্রবর্তন করেছে। নারীত্বের মর্যাদা ও সতীত্বের হিফাযতের জন্য ইসলাম নারীকে যে নিরাপদ আশ্রয়স্থল দিয়েছে তা হলো পরিবার ও পর্দা। কিন্তু নারীরা যখন পরিবার ছেড়ে বাইরে আর পর্দার বিপরীতে চলাকে মূর্খের ন্যায় হক বা অধিকার মনে করেছে তখনই তাদের মুখে এসিড নিক্ষেপ থেকে শুরু করে ইজ্জত-আব্রু হরণ, যৌন নিপীড়ন করে সুন্দর ও সম্মানজনক জীবন লুণ্ঠন, বিয়েতে মাহর দেয়ার বিপরীতে বরপণ (যৌতুক) নেয়া শুরু হয়েছে, যা সবই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং নিষিদ্ধ। আর সে অবস্থা থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই এ আলোচনা।
নারীর পারিবারিক জীবনের অধিকারকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে আমরা এর আলোকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখাচ্ছি।

এক. কন্যা হিসেবে হক

ইসলাম পূর্ব যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া

ইসলামই প্রথম পৃথিবীর বুকে কন্যা শিশুকে মান-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার ঘোষণা করেছে। অত্যন্ত দুঃখ লাগে, ভাবতেই গায়ের পশম শিউরে উঠে, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মাত্র পৃথিবীর বুকে কন্যা শিশুর হক প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের প্রিয় নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অথচ এর পূর্বে বিশ্বে অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীর যে লোকজন ছিল

তারা কন্যা সন্তান জন্ম হলে জীবন্ত প্রোথিত করে দিত। কন্যা হওয়ার অপরাধে হত্যা করে দিত। আর আজকে তারাই মানব সভ্যতার দাবি করে, মানবের হক প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা বলে। কী আশ্চর্য! আর মুসলিমদের জন্য কী দুর্ভাগ্য! হক হরণকারীদের মুখে হক প্রতিষ্ঠার বাণী আর শ্লোগান তারই পেছনে সূক্ষ্ম কৌশলে নতুন স্টাইলে যে হক হরণ করার চিন্তা তা মুসলিম নারী জাতি বুঝতে পারল না– সে কথা ভাবতেই অবাক হয়ে যাই।

পাত্র নির্বাচনে মতামতকে প্রাধান্য দেয়া

মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত চাওয়া, তাদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া মেয়ের হক। পিতা-মাতা বা অভিভাবকের প্রতি তাদের এ হক অবশ্যই পালনীয়। তবে কন্যা হিসেবে নারীর এ হক মানে আবার এমন নয় যে, সে নিজে কাউকে পছন্দ করে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের মতামত ছাড়াই বিয়ে করবে। এখানে কন্যার এ হক মানে হলো পিতা-মাতা বা তাদের অনুপস্থিতিতে নির্ভরশীল অভিভাবক দেখে শুনে যেখানে, যার সাথে বিয়ে ঠিক করবে তা তাকে জানানো এবং বিয়ের ব্যাপারে মতামত নেয়া– যা তাকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহায়ক হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لاَ تُنْكِحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ اِلاَّ بِاِذْنِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ.

কোন সাইয়্যেবা মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত এবং কুমারী মেয়েকে তার স্বীকারোক্তি ব্যতীত বিবাহ প্রদান করবে না। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীর স্বীকারোক্তির স্বরূপ কী? তিনি বলেন, সে যদি চুপ করে থাকে তা-ই তার জন্য স্বীকারোক্তি। (আবু দাউদ, বিবাহের অধ্যায়, হা. নং-২০৮৮, ই.ফা)

দুই. স্ত্রী হিসেবে হক

ইসলাম বাস্তববাদী জীবন আদর্শ, বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত দীন। আর তাই ইসলাম যে সকল পুরুষের ভরণ-পোষণ দেয়ার সামর্থ্য আছে, তার জন্য বিয়ে করা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاَنْكِحُوا الاَيَامى مِنْكُمْ وَالصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। আর যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ

নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩২)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْاهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّيْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللهِ اِنِّيْ لاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُوْا وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির একটি দল নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের কাছে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করে। তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের কাছে এ ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে হল এবং তারা বলল : আমরা নাবীর সমকক্ষ হই কি করে, যাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! তাদের মধ্যকার একজন বলল : আমি সর্বদা রাতভর নামায পড়ব। অপরজন বলল : আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনও রোযাহীন থাকব না। (বিরতি দেব না)। তৃতীয়জন বলল : আমি সর্বদা নারীদের ত্যাগ করব এবং কখনও বিবাহ করব না। অতপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন : তোমরাই কি এই-এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম। আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে নামাযও পড়ি, ঘুমও যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ হবে, তারা আমার অনুসারী নয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং-৪৬৯০, আ.প্র.)

মূলতঃ ইসলাম যে বিয়েকে বাধ্যতামূলক করেছে তার উদ্দেশ্য তিনটি।

০১. বিবাহ ধর্ম কাজে সহায়ক হয়।
০২. শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা তথা সচ্চরিত্র সংরক্ষণের সুদৃঢ় প্রাচীর এবং
০৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাত বৃদ্ধির উপায়।

বিয়ে করার দ্বারা যিনা-ব্যভিচার প্রভৃতি গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়। বিবাহ চোখের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে এবং যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করতে সহায়ক হয়। তাছাড়া বিবাহ করার দ্বারাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠে, বিবাহ করার মাধ্যমেই পিতা-মাতা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। পিতা-মাতার দায়িত্ব, স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দু'টি বস্তু মানুষের দীনকে নষ্ট করে।

০১. লজ্জাস্থান

০২. ক্ষুধার্ত উদর বা পেট।

বিয়ে করলে অর্ধেক দীন রক্ষা হয়। বিয়ে দ্বারা লজ্জাস্থানের হিফাযত হয়। বিয়ে না করলে কামস্পৃহা প্রবল হয়। আর এই কামস্পৃহা দমন করার মত তাকওয়া শক্তি না থাকলে মানুষ কু-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদিও পরহেজগার ব্যক্তি পরহেজগারীর জোরে বাহ্যিক অঙ্গকে কু-কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। যেমন লজ্জাস্থানকে সংরক্ষিত রাখা, দৃষ্টি অবনত করা ইত্যাদি। তবু অন্তরকে কু-মন্ত্রণা ও কু-চিন্তা থেকে বাঁচানো অনেকের জন্যই কঠিন। আবার এ অবস্থায় অনেকের ইবাদাতে একাগ্রতাও আসে না। আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হক পরিপূর্ণ করার তাকিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শের অনুকরণে ইসলাম নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। অবশ্য বলে রাখা ভাল, শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি একে অপরের উপর হক বা অধিকারও ঘোষণা করেছে।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর হক

ইসলাম বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। ইসলাম স্বামীর কাছে স্ত্রীর হক কী হবে তাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পরিষ্কারভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন :

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تَطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَاتُقَبِّحَ وَلَاتَهْجُرَ اِلاَّ فِى الَبَيْتِ.

হাকীম ইবন মুআবিয়া (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, সে যা খাবে তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রী) চেহারার উপর প্রহার করবে না এবং তাকে

গালাগাল করবে না। আর তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না। (আবু দাউদ, বিবাহের অধ্যায়, হা. নং-২১৩৯, ই.ফা.

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীদের প্রতি কোমল, সুন্দর ও সদয় ব্যবহার করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلاَ يُؤْذِىْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ هُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الْضِلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের উপর অংশের হাড়। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হা.নং-৪৮০৪, আ.প্র.)

উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা মতে স্ত্রীরূপে নারী স্বামীর কাছ থেকে যে হকগুলো পেল তা হলো :

❖ খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি।
❖ পরিধেয় বস্ত্র সমস্যার সমাধান।
❖ দ্বন্দ্ব-কলহ ও মারামারি থেকে নিষ্কৃতি।
❖ গালাগালি থেকে নিষ্কৃতি তথা সম্মান প্রতিষ্ঠা।
❖ স্বামীর ঘর ও বাড়ির প্রতি তার হক বা অধিকার।
❖ সুন্দর ব্যবহার ও কোমল কথা বলার হক বা অধিকার।

অর্থাৎ স্ত্রীরূপে নারী স্বামীর সংসারে থাকা অবস্থায় অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁদের যা-যা প্রয়োজন, মৌলিক চাহিদা বলতে যা বুঝায়, তার সবকিছুর নিশ্চয়তা যেখানে ইসলামের ঘোষণা অনুযায়ীই পেয়ে যায় সেখানে তাদের কেন ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতে হবে? আর সমান অধিকার দাবি উত্থাপন করে চিৎকার করতে হবে! বলুন, এগুলো তো স্ত্রীরূপে তার হক মাত্র। আরও হক তো তার পূর্বে আলোচনা হয়েছেই।

অবশ্য, উপরে বর্ণিত হাদীসের এ হকগুলো নারী পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো বিবাহ। অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে নারী যদি পশ্চিমা বিশ্বের কথিত আধুনিকা নারীর স্টাইলে জীবন-যাপন করতে চায় তাহলে তো স্বামীর অভাবে ঐ সকল নারীরা তা পাবেই না, বরং স্বামীর কাছ থেকে অর্থনৈতিক হক হিসেবে মাহরও

পাবে না আর এজন্যই হয়তো বা পিতার সম্পত্তিতে তাদের হক সমান করা নিয়ে তাদের কেউ কেউ চিৎকার করছে বৈকি!

খু'লা (তালাক) দেয়ার হক

নারী বৈধ কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া অথবা খু'লা (তালাক) দিতে পারে। অর্থাৎ ইসলাম বিশেষ ক্ষেত্রে নারীকে তালাক দেয়ার অধিকারও দিয়েছে। কোন নারীর স্বামী ভাল, তার ব্যবহার ও আচরণে কোন দোষ নেই। তবুও স্ত্রী তার নিজের থেকেই যে কোন কারণে এ স্বামী নিয়ে সুখী নয়, তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত হয় না অথবা স্বামী পুরুষত্বহীন। এমতাবস্থায় ইসলাম স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক চাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

স্বামীর পার্থিব ও নৈতিক লোকসানের ক্ষতিপূরণ করতে এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী শুধু অনুরোধে তালাক দিতে রাজি হয় এবং তার ক্ষতিপূরণের হক ছেড়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَآ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِه تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا.

"আর (স্ত্রীকে) নিজের দেয়া সম্পদ (মাহর) তাদের কাছ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে জায়িয নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২২৯)

স্ত্রী হিসেবে নারীর এ হক প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণনা করেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَّا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَّلاَ دِيْنٍ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাবেত ইবনে কায়েসের চরিত্র ও দীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি

মুসলিম হয়ে কুফরী করাটা মোটেই পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি তার বাগানটা ফেরত দিতে রাজি আছ? সে বলল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেতকে বললেন : বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তালাক, হা. নং-৪৮৮৬, আ.প্র.)

তিন. মা হিসেবে নারীর হক

ইসলামে মা হিসেবে নারীর হক কতটুকু; তা কে বা কারা আদায় করবে; কিভাবে আদায় করবে; আদায় না করলে কী হবে ইত্যাদি সকল প্রশ্নের জবাব পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। ঘোষণা হয়েছে :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

"(হে নাবী!) আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সাথে কথোপকথনে দুঃখ করে 'উফ্' বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার বাহু প্রসারিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩-২৪)

এখানেই শেষ নয়, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম ব্যবহার পাওয়ার হকদার সন্তানের পক্ষ থেকে মা-মা-মা, তারপর বাবা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ (النَّاسِ) بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি বললো, তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন : তারপরও তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর তোমার পিতা।

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আখলাক, হা. নং-৫৫৩৮, আ.প্র.)

হাঁ, যে সকল মুহতারামা নারী মা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না; সন্তানের ভ্রূণকে নষ্ট করে দেয়, সন্তান লালন-পালনকে ভীষণ ঝামেলা মনে করে, সন্তান জন্মলাভ করলেও তাদেরকে বিভিন্ন কেয়ার সেন্টারে দিয়ে দেয়, সন্তানের প্রথম হক বুকের দুধ পান করানো থেকে বঞ্চিত করে, সন্তানকে কোলে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। ফলে সন্তানের পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার, সেবা, বৃদ্ধ বয়সে বা কর্মে অক্ষম বয়সে সন্তানের সম্পদে যে তাদের হক তা তো না পাওয়ারই কথা বা বোধহয় এ জন্যই পাচ্ছে না।

অথচ মা কত সৌভাগ্যবান! প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি না হতে পারলেও তাঁদের মর্যাদা কোন অংশে কমেনি, তাঁদের হক খর্ব হয়নি, কারণ তাঁরা রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি, বিচারপতি, কোটিপতি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলিম, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আদর্শ মানুষ এক কথায় সকল মানুষের গর্ভধারিণী। এটাই বড় সম্মান, গৌরব। এটাই তাঁদের বড় হক। পৃথিবীর বুকে এটাই তো তাদের শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

চার. বোন হিসেবে নারীর হক

ইসলাম বোন হিসেবেও নারীকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমেও তাদের হকের কথা বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍم يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه اُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ৭১)

অর্থাৎ নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরে সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক। অন্য কথায় নর-নারী পরস্পর দীনী ভাই-বোন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাবী মানবতার কল্যাণকামী মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বোন হিসেবে নারীর হক এবং যারা তা মেনে চলবে তাদের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বলেন :

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلاَثُ اَخَوَاتٍ اَوِ ابْنَتَانِ اَوْ اُخْتَانِ فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ

وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

যার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন আছে অথবা দুইটি কন্যা অথবা দুইটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধরিত রয়েছে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৬৫, বিআইসি)

নারীর সামাজিক হক

ইসলাম নারীকে অনেক সামাজিক অধিকার দিয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে নারী জাতির শুধু সামাজিক নয় কোন অধিকারই ছিল না। প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে জগতের সর্বত্র নারী জাতিকে অস্থাবর সম্পত্তির মত মনে করা হত। পাক-ভারত উপমহাদেশে, আরব জগতে, চীন দেশে, পশ্চিমা দুনিয়ার কোথাও নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। নারীদেরকে ক্রীতদাসীর মত মনে করা হত। তাদেরকে যেমন খুশি, যেখানে খুশি ব্যবহার করা যেত, এমনকি এই প্রগতির যুগেও অমুসলিম সমাজে নারী জাতির দুর্গতির সীমা নেই। পতিতা বা অধঃপতিত নারীর সংখ্যা দেখলেই তথাকথিত সভ্য দেশের অসভ্যতা বা নারী জাতির করুণ অবস্থা বুঝা যায়। বিশ্বনাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। নারীদেরকে সামাজিক জীবন হিসেবে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ ঘোষণা করলেন। যেমন :

❖ মুসলিম নারী মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে পারবে।

❖ ঈদ উৎসবে যোগ দিতে পারবে।

❖ হজ্জে যেতে পারবে।

❖ যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করতে পারবে।

❖ যুদ্ধ পরিচালনা করতে এমনকি নিজেও যুদ্ধ করতে পারবে।

❖ জ্ঞান চর্চা করতে পারবে।

❖ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।

❖ চাকুরি করতে পারবে।

❖ অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

শুধু শর্ত হলো, নারীকে তার এই সকল হক বাস্তবায়ন করতে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মত চলতে হবে। যেমন :

০১. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নারীকে পুরুষের সাথে অবাধে

মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

০২. ঘরের বাইরের পরিবেশে গেলে তাকে মার্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ ও বড় কাপড় বা বোরখা জড়িয়ে শরীরের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

জ্ঞান অর্জনে নারীর হক

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা– এ পাঁচটি মানুষের মৌলিক হক। জ্ঞান অর্জন করা তার মধ্যে একটি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীর বুকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন আল-কুরআনুল কারীম নাযিল করতে শুরু করেন তখন সর্বপ্রথম যে পাঁচটি আয়াত নাযিল করেন তা হলো-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الاِنْسَانَ مالَمْ يَعْلَمْ.

"পাঠ কর আল্লাহর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" (সূরা আল-আলাক, ৯৬ : ০১-০৫)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা যে জ্ঞান অর্জনের তাকিদ দিলেন তাতে নারী পুরুষ বিভাজন করা হয়নি। মূলতঃ এ নির্দেশ সকলের জন্যই কার্যকর। সেই সাথে জ্ঞান অর্জনই হচ্ছে মানুষ তার নিজেকে চেনা ও তার স্রষ্টাকে খুঁজে বের করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করার একমাত্র মাধ্যম।

আর তাই নারীদেরকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাবী পরিবারকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ ايتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا.

"হে নাবী পত্নীরা! আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়; তোমরা সেগুলো আয়ত্ত কর। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞান-বিজ্ঞানময়।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উল্লেখিত এ আদেশ নাবী পরিবার থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যতে যত নারী পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করবে সকলের জন্যই। সুতরাং শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তি তাদের হক। কন্যা অবস্থায় পিতার এবং বিয়ে হওয়ার পরও পড়ালেখা করতে থাকলে নারীর এ পড়ালেখার দায়িত্ব পালন স্বামীর জন্যে কর্তব্য আর স্ত্রীর জন্য

হক। ইসলাম জ্ঞান অর্জনে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বিভাজন করেনি। বরং ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব-কলহ মুক্ত আদর্শ সমাজ ও আদর্শ পরিবার গঠন।

নারীর আইনগত হক

ইসলামে আইনগত হক বা অধিকার নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে একই রকম। হত্যা, চুরি-ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার বা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অথবা মদ পানের শাস্তি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান। তাছাড়া শারী'আতের বিধান নারী-পুরুষ উভয়েরই জান-মাল রক্ষা করে; উভয়েরই সমভাবে আইনগত হক প্রতিষ্ঠা করে।

হত্যার শাস্তি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমান

একে অপরকে হত্যা বা খুন করার শাস্তি নারী পুরুষভেদে উভয়ের জন্য একই রকম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى.

"হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৭৮)

কিসাস-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এটা তার পক্ষে বৈধ।

শারী'আতের পরিভাষায়, কোন পুরুষ হত্যার অপরাধে অপরাধী হলে তাকে যেমন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে অপরাধী হলে তাকেও তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পুরুষের বেলায় যেমন চোখের প্রতিশোধে চোখ, দাঁতের প্রতিশোধ দাঁত, কানের প্রতিশোধে কান, হাতের প্রতিশোধে হাতের কিসাস করা হয়, নারীর ক্ষেত্রেও তেমনি একই রকম কিসাস নেয়া হয়। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক পুরুষ হলে তার মাফ করার বা দিয়াত আদায় করার মতামত যেমন গ্রহণ করা হয়, স্ত্রীলোক হলেও তা মাফ করার বা দিয়াত আদায় করার মতামত গ্রহণ করতে হবে, অগ্রাহ্য করার কোনই উপায় নেই।

চুরির শাস্তি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমান

কেউ যদি কোন কিছু চুরি করে অন্যের হক হরণ করতে চায়, চাই সে নারী বা

পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বিচার একই রকম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেননি। বরং কঠোরভাবে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রমশালী, জ্ঞানময়।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৩৮)

ব্যভিচারের শাস্তি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমান

ইসলামী শারী'আতে বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক শুধু অপরাধই নয় বরং মহাঅপরাধ, আইনত ঃ দণ্ডনীয়। এ দণ্ড বা শাস্তি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান। উভয়ের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন : বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা-ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি রজম করা অর্থাৎ প্রকাশ্যে পাথর মেরে প্রাণে বধ করা, আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত করে বেত্রাঘাত করা ও তা'যীর হিসেবে ১ বছরের জন্য নির্বাসন দেয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"ব্যভিচারিণী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলিমদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ০২)

মদ্য পানের শাস্তি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমান

মদ পান করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলে নারী-পুরুষ উভয়ের উপর একই শাস্তি সমানভাবে বর্তাবে। পবিত্র কুরআনে মদ পান করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম নারীর মান-সম্মান, হক বা অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এতখানি সতর্ক যে, তাদের মান-সম্মান, হক বা অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এতখানি সতর্ক যে, তাদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করাকেও শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে এতে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে। প্রিয় নাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هِيَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

তোমরা ধ্বংস আনয়নকারী সাত বস্তু থেকে বিরত থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? তিনি বললেন : তা হলো- ০১. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। ০২. যাদু করা। ০৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ০৪. সুদ খাওয়া। ০৫. ইয়াতীমের মাল খাওয়া। ০৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। ০৭. মুমিন মহিলাদের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করা। (সুনান নাসাঈ, ওসীয়ত, হা. নং-৩৬৭৫, ই.ফা.)

মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক আরোপ করা

ইসলামী শারী'আতের বিধানে যে সকল অপরাধের শাস্তি কঠোর হয়, সে সকল অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কঠোর। শারী'আতে ছোট অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট অথচ বড় অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে প্রয়োজন হয় চারজন সাক্ষীর। ইসলামে কোন নারীর প্রতি যিনা-ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা বড় ধরনের অপরাধ। এমন অপরাধ প্রমাণ করতে হলে আরোপকারীকে তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। নতুবা এ নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ফলে শাস্তি অপবাদকারীর নিজের উপরই বর্তাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই ফাসিক।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ০৪)

নারীর রাজনৈতিক হক

ইসলাম নারীকে পুরুষের মত রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল

কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে।..... এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-এর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ৭১)

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথিবীর বুকে ইসলাম নারীদেরকে সম্মানের সাথে যত হক দিয়েছে অন্য কোন ধর্মের অনুসারী বা মতাবলম্বীরা যতই সভ্যতা, উদারতা, সহনশীলতার দাবিদার হোক না কেন তাদের আয়ত্তাধীন থাকা নারীরা উল্লেখিত হকগুলোর কোনটিই যথাযথভাবে ভোগ করতে পারছে না। পক্ষান্তরে মুসলিম নারীরা জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের বাস্তব প্রতিফলন ও সুফল ভোগ করছে।

নারীর সমান অধিকার দাবি ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ বিধানের প্রবর্তন করেছেন স্বয়ং স্রষ্টা এবং স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ বিধানের মূল উপাদান হলো স্রষ্টার সৃষ্টি তথা সকল মাখলুকাতের প্রয়োজনে সেরা মাখলুকাতের চাওয়া-পাওয়া, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকে কেন্দ্র করে। এ মাখলুকাতের মধ্যে মূল হলো নর ও নারী। আর স্রষ্টাই দুনিয়ার অঙ্গনে নর ও নারীকে সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট ও স্থির করে দিয়েছেন তাদের সকল চাওয়া-পাওয়ার হক বা অধিকার। সেখানে নর তথা পুরুষরা যখন তাদের হক বা অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে না তেমনি নারীরও আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে নারী যখন তাদের অধিকার আন্দোলনে স্রষ্টার ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে আরো পেতে চায়– তখন হয় তারা অবিবেচক, নতুবা লোভী, নতুবা কপালপোড়া। সুতরাং নারী মানেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান আল-কুরআনুল কারীমে তাদের সংরক্ষিত ও দেয় অধিকারের কথা জানা বা জানার চেষ্টা করা উচিত।

অন্যদিকে যারা কুরআন পড়ে না তারা জানে না কিন্তু অজানাদের ন্যায় দাবি উত্থাপন করে কুরআনের অনুসারী মুসলিম নামধারী নারীও যখন তাদের সাথে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে রাস্তায় নামিয়ে আন্দোলন মিছিলে জড়িত করে তখন তারা নারী না নারীর পরিচয়ে সর্বনাশী তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে তাদের এ অবস্থাটাকে অবিবেচক বলছি এ কারণে যে, তাদের হকের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে ফায়সালা দিয়েছেন তা বড়ই চমৎকার এবং জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের কোমলতাকে পুরুষের সামনে ধরে তাদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে দিয়েছেন– যা বিবেচনা

প্রসূত ও যথার্থ। আবার লোভী বলছি এ কারণে যে সম্পদের প্রতি লোভ ছাড়া কেউ ভাইদেরকে ঠকিয়ে পিতার সম্পত্তি থেকে স্রষ্টার নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সমান অধিকার দাবি করতে পারে না। বিশেষ করে মুসলিম নারী তো স্রষ্টার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেই পারে না। কারণ তারা জানে এ জীবন জীবন নয় আরো জীবন আছে। সেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে। এ জীবনে যা কিছু করছে তার সবকিছু সে জীবনে ভোগ করতে হবে এবং বিন্দুমাত্রও কম দেয়া হবে না। আর তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্যে প্রত্যেক মানুষের কাঁধে দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা সবকিছুই লিখছে, সর্বদাই নিয়োজিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন :

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"(আমি তো সব জানিই, তা ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে সব টুকে নিচ্ছে। তার মুখ থেকে যে শব্দই বের হয় তা (রেকর্ড করার জন্য) তার নিকট পাহারাদার হাজির রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৭-১৮)

আর কপালপোড়া বলছি এ কারণে নারী সৃষ্টির সাথে-সাথে তার সকল হক বা অধিকার পাওয়ার ঘোষণা অটোমেটিক্যালি তার ভাগ্যে আসে। আর তা পাকাপোক্ত হয় মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম নারী হিসেবে জীবন ধারণ করার মাধ্যমে। কিন্তু কেউ যদি মুসলিম ভিন্ন অন্য জাতি-গোষ্ঠী বা মতাবলম্বীদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তো তাদের কথা ভিন্ন; তারা তো সে অধিকার পাবে না। কারণ সে অধিকার সম্পর্কে তারা জানে না। ফলে নারী হিসেবে যে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার কথা তা পায়ও না। আর তাইতো তারা অন্য কারোর কাছে কোথাও কোন অধিকার না পাওয়ায় পিতার কাছ থেকে সমান অধিকার দাবি করছে। আর সেই দাবির প্রতি একাত্মতা পোষণ করে এক শ্রেণির মুসলিম নারীও তাদের মতই আজ সে অধিকার দাবি করছে। অথচ মুসলিম আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত নারী মাত্রই জানে মুসলিম নারীরা সকল অধিকার পায় তাদের মান-মর্যাদা ও সম্মানের আসনে থেকে।

পক্ষান্তরে অমুসলিম নারীরা অধিকার পায় তাদের নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বিসর্জন দিয়ে। এ দু' পাওয়ার ধরন তো কখনোই এক রকম নয়। এরপরও কি মুসলিম নারীরা তাদের পথে এসে তা দাবি করবে! যদি তারপরও দাবি করে এবার তাদেরকে লক্ষ্য করে বলব :

০১. ইসলাম নারীদেরকে স্বামীর পক্ষ থেকে মাহর পাওয়ার হকদার ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি পুরুষদেরকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বরপণ (যৌতুক) নিতে নিষেধ

করেছে। কিন্তু আজকাল নারীরা যখন ইসলামের নীতি না মেনে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করছেন তখন তাদের দাবির অন্তরালেই পুরুষের বরপণ দাবি আসা যৌক্তিক। (এখানে বলে রাখছি– নারীদের দাবি যেমন অযৌক্তিক তেমনি সভ্য সমাজের মুসলিম শিক্ষিত পুরুষ এমন দাবি কখনো করবে না, করতে পারে না।) আর তাই আজকে যারা নারীর সমান অধিকার নিয়ে চিৎকার করছেন তাদেরকে বলব, পুরুষদেরকে এমন কথা বলার সুযোগ নারীদের প্রয়োজনেই দেয়া সমীচীন নয়। এমন দেয়া মানে নারীদের অবস্থানকে নারীরাই ভূলুণ্ঠন করে ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের দুরবস্থার দিকে ফিরিয়ে নেয়া অর্থাৎ আত্মঘাতীর শামিল।

০২. ইসলাম স্ত্রীদেরকে তাদের চাকরির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ পরিবার-পরিজনদের জন্যে ব্যয় করার আদেশ দেয়নি। এ ব্যয়ভার বহনের আদেশ দিয়েছে পুরুষদের। আর স্ত্রীরা যদি কখনো ব্যয় করেও এটা তা ইচ্ছাধীন। কিন্তু নারীরা যখন সমান অধিকার দাবি পেশ করছে তাহলে সংসারের ব্যয় নির্বাহে নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক চাকুরি তথা কাজ করে অর্ধেক দায়িত্ব পালন করবে– এটাই তো বোধহয় বুঝায়। তাহলে যারা কর্মে অক্ষম নারী, যারা পরিবারে থেকে সুন্দর সংসার পরিচালনা করে আদর্শ জাতি গড়ায় ভূমিকা রাখছে, যারা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে তাদের কী অবস্থা হবে! কাজেই কতিপয় নারী তাদের স্ব-নারী জাতির বিপক্ষে কোন দাবি উত্থাপন করে তাদের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করুক তাতো আর যাই হোক বুদ্ধিমতীর কাজ হতে পারে না।

০৩. স্বামী স্ত্রীর সুন্দর জীবন যাপনের ফসল সন্তান। এ সন্তানদের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যয়ভার গৌণভাবে দেখে শিক্ষা প্রসঙ্গে কথা বলছি। কেননা আজকাল শিক্ষার ব্যয়ভার কেমন তা সম্পর্কে অনেকেই অবগত। সেই ছোট থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার শেষ পর্যন্ত পড়ালেখার সকল খরচের যোগান দাতা পিতা। কিন্তু নারীদের সমঅধিকারের দাবি আজ এক্ষেত্রেও সমান খরচের যোগান দেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বা এভাবে বলা যায়, মায়ের কাছে কয়েক দিন পরে সন্তানের দাবিও আসবে– যা নারী জীবনে কতটুকু মেটানো সম্ভব তা আজকের নারীদের ভেবে দেখার দাবি পেশ করে।

০৪. রাজধানীসহ অন্যান্য শহরগুলোতে বাসা ভাড়া কেমন অসহনীয় তা যারা বসবাস করছেন তাদের সকলেরই জানা। সেই সাথে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি পুরুষদের হাপিয়ে তুলছে, করে তুলছে যন্ত্রের ন্যায় গতিশীল। খুব ভোরে বাসা

থেকে বেরিয়ে গভীর রাতে বা ক্যালেণ্ডার হিসাবে আজকে বেরিয়ে কাল ফিরে এসেও কোন রকমে জীবন যুদ্ধে পুরুষরা নিজেদেরকে আল্লাহই বাঁচিয়ে রেখেছে বলে দাবি পেশ ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে থাকে। এ অবস্থায় সমঅধিকারের দাবি উত্থাপনকারী নারীদের তো বাসা ভাড়াও অর্ধেক বহন করতে হবে।
এছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোতে পুরুষরা এখন নারীদের দাবির সমর্থনে দাবি পেশ করলে নারীরা কী করবে তা বোধহয় তারা ভেবেও দেখেনি।

পথ শিশুদের হক

দরিদ্রতার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন যাপন করে। এতে বেঁচে থাকার তাকিদে খাদ্যের মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেই তাদের হিমশিম খেতে হয়। তারপর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, বাসস্থান, সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার মত অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো অভাবের তাড়নায় তাদের কাছে যেন অনেকটাই গুরুত্বহীন। অধিকন্তু অভাবের তাড়নায় খোলা আকাশ বা কোন রকমে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই খুঁজে নিলেও ঐ সমস্ত দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পথেই থাকে, পথেই খায়, পথেই ঘুমায়, হাসা-হাসি ও দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটি করে। আর জীবনের সকল যুগ জিজ্ঞাসা সকল কিছুকে তারা পথের সাথী বানিয়ে নেয়। ফলে বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে প্রকৃতির নিয়তির সাথে সখ্যতা গড়ে এ শিশুরা যখন দিনের পর দিন বুঝতে শিখে তখন তাদের মনে জাগে অনেক প্রশ্ন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বাভাবিক জীবন যাপন হয়ে পড়ে তাদের কাছে বহু কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই কর্মে বিভোর হয়ে পড়ে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা, কেউবা ধনী শ্রেণির অধীনে ছোট-খাট চাকুরি, কেউবা তাদের বাসায় চাকর-চাকরানী, কেউবা সিগন্যালে দাঁড়িয়ে সাধে ফুল চকলেট, পানি বিক্রেতা কখনো বা তারাই বনে যায় পথের ভিখারী, পথে-পথে কুঁড়িয়ে লিচু, পঁচা অর্ধেক পঁচা, আম, জাম, কাঁঠাল আর ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়া দইয়ের পাতিল পেয়ে চেটে খাওয়ার আনন্দে অভিভূত। তখন এক শ্রেণির বিত্তশালীদের অমানবিক আচার-আচরণ, ভালবাসার বিপরীতে ঘৃণা, সুন্দর কথা বলার বিপরীতে বাঁকা কথা-ধমক, তাদেরকে খাঁটিয়ে যথাযথ মূল্য প্রদান না করে দূর-দূর ছে-ছে বলে তাড়িয়ে দেয়া সত্যিই অমানবিক। তাছাড়া এ কথা সকলেরই জানা, তাদের রক্তের বিনিময়ে এক শ্রেণির লোকের জীবন বেঁচে আছে, ব্যবসায়ীর কলের চাকা ঘুরছে, মেশিন কার্যক্ষম থাকছে, পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কাজেই ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে সফলতা পেতে, ধনীদের ধনীত্বকে বজায় রাখতে, শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে যাদের ভূমিকা এত বেশি তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা থেকে দূরে সরে আসা উচিত সকলকে। তাদের ভালবাসা উচিত এক সাথে। অন্যথায় মনে রাখতে হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ মানবতার চির কল্যাণকামী ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কঠোর বাণী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَيَرْحَمُهُ اللهُ.

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা.নং-১৮৭২, বিআইসি প্রকৃতপক্ষে পথ শিশুরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব, তারাও মানুষ। তাদেরও রয়েছে স্বাভাবিক জীবন ও কর্মে অংশগ্রহণ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জীবন যাপন ও নাগরিক সুবিধাবলী ভোগ ও যথাযথভাবে পাওয়ার অধিকার। কেননা রাষ্ট্রের রাজকোষে তাদেরও রয়েছে অর্থের যোগান। আর তাই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তাদের হক রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তারা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় একদিকে বাজেটের ঘাটতি অন্যদিকে অপরিকল্পিত বা যথেচ্ছা ব্যবহার; সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের সততা ও একনিষ্ঠতার অভাব সরকারের সকল আয়োজনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেয়। ফলে সরকারের এই আয়োজন পথ শিশুদের যথাযথ হিফাযত করতে সক্ষম হয় না। আর তাই জনগণ ও সরকার সকলের কাছেই অধিকার বঞ্চিত নিগৃহীত, নিষ্পেষিত এ মানুষগুলো বার-বার অন্যায়ভাবে তাড়িত হতে-হতে এক সময় জেদ ধরে প্রতিবাদী ও সহজেই বিপদগামী হয়ে পড়ে। আর তখনই ওরা যে কোন অন্যায় আচরণ ও অমানবিক কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ওদের মনে আসে জীবনের বেঁচে থাকাই যখন নিরর্থক, কোন মূল্যই যখন নেই, সমাজে কোন অঙ্গনে যেহেতু আমাদের কোন স্থান নেই, তখন যা ইচ্ছা তাই করব। এমন সিদ্ধান্ত তাদেরকে পরবর্তীতে শীর্ষ সন্ত্রাসী, অস্ত্র, ফেনসিডিল ও মাদক ব্যবসায়ীসহ যে কোন অকল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এভাবে সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে তারা নিজেদেরকে খুব সহজেই জড়িয়ে ফেলে। তাই জাতিকে সমূহ ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে সকলের উচিত সকলের হকের ব্যাপারে সচেতন হওয়া। সমাজের বিত্তশালীদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা। পথ শিশুদের প্রতি ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ (لَمْ) يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا.

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে না সে আমাদের নয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৭০, বিআইসি)

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হক

জীবনের নব উদ্যম তারুণ্য ও যৌবনের প্রখরতা পেরিয়ে সেই দিনের হাঁটি-হাঁটি পা-পা করা শিশু যেন আজ ধীর গতিতে কোন রকমে এটা সেটা ধরে বা লাঠি হাতে নিয়ে, অন্যের সহযোগিতায় টুক-টুক করে শয়ন কক্ষ থেকে বাথরুমে আর বড়জোর কোন রকমে নামায আদায় করে। অথচ এ মানুষগুলো যৌবনে কী না করেছে আর আজ কিছুই করতে পারছে না। এ কী আল্লাহর নিয়ম! একদিন তাদের হাত ধরে যারা হাঁটা শিখেছে, বেড়াতে বেড়িয়েছে আজ তারাই আবার চলতে ফিরতে খেতে তাদের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য এ অবস্থায় যে সকল লোকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, তাদেরকে সমাজে অপাংক্তেয় মনে করবে না; তাদেরকে পরিবার, সমাজ ও সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠানে সম্ভব হলে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেবে, তাদের অসুস্থতায় খেদমত, শেষ বয়সে প্রয়োজনে খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান করে দেবে, বাসা থেকে বের হলে প্রয়োজনে হাত ধরে রাস্তা দেখিয়ে দেবে বা রাস্তা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, বাসে উঠলে বসার ব্যবস্থা করবে, মসজিদে যেতে সহায়তা করবে এবং সর্বোপরি তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ঠাণ্ডা মাথায় শুনে তাদের সাথে হাসি-খুশি কথা বলে তাদেরকে সদা প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করবে, কখনো মনে কষ্ট আসলে তাদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে বরং তাদের অবস্থার কথা মাথায় আর কল্পনায় চোখের সামনে তুলে এমনটি ভাবা যে, একদিন আমিও এমন বৃদ্ধ হবো। আজ আমরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করলে একদিন অন্যরাও আমাদের সাথে করবে তা মাথায় রেখে তাদের সাথে সহনশীল ও সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করাই উত্তম। বিশ্ব নাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোকদেরকে সাহায্য দান প্রসঙ্গে বলেন :

اِبْغُوْا لِي الضُّعَفَاءَ فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ.

তোমরা অক্ষম, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে তালাশ করে আমার নিকট উপস্থিত কর। (আমি তাদেরকে সাহায্য দিয়ে উপকৃত হই)। জেনে রেখো যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের অক্ষম ও অচলদের বরকতেই তোমাদের প্রতি রিযক ও সাহায্য পৌঁছে থাকে বা তোমাদেরকে খাদ্য ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। (আবু দাউদ, জিহাদের অধ্যায়, হা. নং-২৫৮৬, ই.ফা)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا.

"তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাক থেকে, এরপর তোমাদের বের করেন শিশুরূপে; তারপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, পরে হও বৃদ্ধ।" (সূরা আল-মুমিন, ৪০ : ৬৭)

শিক্ষকের হক

অজানাকে জানানো, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোতে আনয়ন নামসর্বস্ব মানুষ নামের জীবকে পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণের উপযোগী করে গড়া– এ মহৎ কাজ যিনি বা যাঁরা সম্পাদন করেন তাঁরাই শিক্ষক। অর্থাৎ শিক্ষক তিনিই যিনি শিক্ষাদান করেন, জ্ঞান বিতরণের কাজে ব্রতী হন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের অভিব্যক্তি সুবিস্তৃত এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুবিধ; তিনি তাঁর আদর্শভিত্তিক জ্ঞান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যানুগ জ্ঞান অর্জনে, সচ্চরিত্র গঠনে এবং মেধা বিকাশে পরিকল্পনা মাফিক নিয়োজিত করেন।

শিক্ষা দানের সকল কাজ নাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ বা নাবীওয়ালা কাজ হিসেবে গণ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৫১)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" (সূরা আল-জুমু'আ, ৬২ : ০২)

সুতরাং সুষ্ঠু সমাজ, দেশ ও আদর্শ জাতি গঠনে যাদের ভূমিকা রয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকাই অধিক বিস্তৃত; গভীর প্রভাবশীল এবং নিয়ামত প্রকৃতির। এ কারণেই রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের জনগণ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকের হক বা অধিকার অনেক বেশি।

শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার মেরুদণ্ড

শিক্ষকতা একটি জটিল কৌশল। কিভাবে অল্প কথায়, অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে কোন কিছু সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করে তাদের মনে শেখার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়া যায়, জ্ঞানোন্মুখ করে তোলা যায়, শিক্ষার্থীদের অধিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, পোশাক তথা মাথার চুল থেকে পায়ের জুতা পর্যন্ত বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনা যায় তার ব্যবস্থা করা শিক্ষকের প্রধান কাজ। ফলে একটি দেশে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে আদর্শ শিক্ষার্থী তথা আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বের কোন দেশে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের চেয়ে উত্তম নয়। শিক্ষক মাত্রই সভ্যতার অভিভাবক, ধারক ও বাহক। আর শিক্ষা হচ্ছে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ এবং শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার মেরুদণ্ড। ফলে এ শিক্ষকের গড়া ভীতেই একটি দেশ হয় জাতি-গোষ্ঠীতে সমৃদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী। পৃথিবীর বুকে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। সে দেশ তত অর্থনীতিতে শক্তিশালী ও সম্পদে সমৃদ্ধ।

কাজেই শিক্ষাই যখন সভ্যতার প্রধান অঙ্গ, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সকল প্রকার উন্নয়নের সূতিকাগার, আদর্শ জাতি-গোষ্ঠী গড়ার মূল তখন এ শিক্ষা যারা দেবেন অর্থাৎ যারা শিখাবেন তাদের মর্যাদা-সম্মান, হক বা অধিকার কতটুকু বা কী পরিমাণ হওয়া উচিত তা কি আর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার দরকার আছে! যার বা যাদের গড়া জিনিসের এত মূল্য, এত গুরুত্ব সেখানে তিল-তিল করে বিভিন্ন কৌশলে, বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে, শিক্ষার্থীদের অবুঝ মনে বার-বার আঘাত হেনে শিক্ষার্থীদের মনের মতো করে বিভিন্ন উপমা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তার চোখের সামনে তুলে ধরে যিনি বা যাঁরা গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন তাঁদের মূল্য, তাঁদের সম্মান, দেশ ও জাতির কাছে তাঁদের গুরুত্ব কেমন হওয়া উচিত তা বোধহয় বলাই বাহুল্য। আর তাই এমন শিক্ষকের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেন :

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّيْ جِئْتُكَ مِنْ مَّدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ تُحَدِّثُه عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِه طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ

وَاِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَه مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاء وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاء وَاِنَّ الاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَادِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَه اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ.

কাসীর ইবন কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি দামেশকের মাসজিদে আবুদ্ দারদা (রা)-এর নিকট বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলে : হে আবুদ্ দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর মাদীনা থেকে আপনার নিকট একটা হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। এছাড়া আর কোন কারণে আমি এখানে আসিনি। তখন আবুদ্ দারদা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি 'ইলম (কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান) হাসিলের জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা 'তালেবে 'ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং 'আলিমের জন্য আসমান ও জমিনের সবকিছুই মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর 'আবিদের উপর 'আলিমের ফযীলত এরূপ, যেরূপ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। আর 'আলিমগণ হলেন, নাবীদের ওয়ারিশ এবং নাবীগণ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) মীরাস হিসেবে রেখে যান না, বরং তাঁরা রেখে যান 'ইলম। কাজেই যে ব্যক্তি 'ইলম হাসিল করলো সে প্রচুর সম্পদের মালিক হলো। (আবু দাউদ, শিক্ষা বিদ্যা [জ্ঞান-বিজ্ঞান], হা. নং-৩৬০২, ই.ফা)

শিক্ষক অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব

'আলী (রা) শিক্ষকদের সম্মান ও হক প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি। 'আলী (রা) বলেছেন :

"একজন শিক্ষকের হক বা অধিকার হলো তুমি তাকে বেশি প্রশ্ন করবে না, তাঁকে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা করতে পারবে না, তাঁর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারবে না যদিও তিনি অলসতা করেন, তাঁর কাপড় ধরে বসাতে পারবে না। যদি তিনি উঠে যান, তাঁর কোন গোপন তথ্যের ব্যাপারে প্রতারণা করবে না, যদি তাঁর পদস্খলন হয় তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্মান করবে

যতক্ষণ তিনি আল্লাহর আদেশ সংরক্ষণ করেন, আর তুমি শিক্ষকের সামনে বসবে যদি তার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাঁর খেদমতের জন্য এগিয়ে যাবে এবং তাঁকে এমন কথা বলবে না অমুক ব্যক্তি আপনার মতের বিপক্ষে বলেছে।"

আবার কোন ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে তার পক্ষ অবলম্বন করা সম্পর্কে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লাম যা বলেছেন তা হলো :

مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرًا مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُه وَيَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِه اِلاَّ خَذَلَه اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَه وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضَعٍ يَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِه وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِه اِلاَّ نَصَرَه اللهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَه .

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন স্থানে অপদস্থ করে, যেখানে তার ইজ্জত নষ্ট হতে পারে, তবে আল্লাহ তাকে এমন স্থানে অপমানিত করবেন, যেখানে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। অপর পক্ষে যদি কেউ কোন মুসলিমকে এমন স্থানে সাহায্য করে, যেখানে তার অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে তাঁর সাহায্য অধিক প্রয়োজন হবে। (আবু দাউদ, আদাব, হা. নং-৪৮০৬, ই.ফা)

শিক্ষকের মূল্যায়ন, মূল্যবোধ ও সম্মানী প্রসঙ্গ

শিক্ষক যেহেতু নিজে আদর্শবান এবং আদর্শের মশাল হাতে আদর্শ মানুষ গড়ার নৈতিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেন তাই তাঁদের মূল্যায়ন ও পারিশ্রমিক হওয়া উচিত যথাযথ। জাতির কর্ণধার সম্মানিত এ শিক্ষকবৃন্দ যেন শিক্ষকতা ছাড়া অন্য পেশায় জড়িত হতে না হয় সেজন্য সরকারিসহ সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন কাঠামো যথাযথ হওয়া যুক্তিযুক্ত।

সুতরাং সময় থাকতেই প্রয়োজন জাতির স্থপতি সম্মানিত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে তাঁদের মেধাকে শাণিত ও সৃজনশীল গবেষণাধর্মী করার লক্ষ্যে সব সময় ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ এবং দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত পলিসিতে তাঁদের মতামত পর্যবেক্ষণ ও গ্রহণ। মনে রাখতে হবে শিক্ষকগণ হচ্ছেন সকলের মাথার তাজ, সকলের শ্রদ্ধেয় আদর্শ মানুষ, যাঁদের সম্মান প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّموتِ وَالاَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ حُجْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং (পানির) মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, হা. নং-২৬২২, বিআইসি)

এমন শিক্ষকদের মূল্যায়নই দেশ হবে আরো উন্নত, একবিংশ শতাব্দী হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের জন্য আদর্শমণ্ডিত।

শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর হক

অজানাকে জানার, অন্ধকারকে বিদূরিত করে আলোতে উত্তরণ ঘটবার, নিজেদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তোলার অদম্য স্পৃহা যাদের তারাই দেশ ও জাতির আগামী ভবিষ্যৎ আজকের শিক্ষার্থী। যাদের কাছে পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশা পূরণে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে আজ তাদেরও রয়েছে আমাদের সকলের কাছে হক বা অধিকার। তবে এখানে শিরোনামের সাথে সম্পর্ক রেখে শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীদের হক শুধু আলোচনা করা হলো :

❖ শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীদের প্রথম হক হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোধগম্য করে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তাদের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন করবেন।

❖ ক্লাসে শিক্ষকদের কাছ থেকে কার্যকর শিক্ষা পাওয়া। ভুল শিক্ষা না পাওয়া, শিক্ষক কর্তৃক কোন কিছু গোপন বা পাশ কাটিয়ে না যাওয়া শিক্ষার্থীদের হক।

❖ শিক্ষার্থীদের মেধার প্রখরতা এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় রেখে শিক্ষকের শিক্ষাদান পলিসি গ্রহণ এবং সকলের বোধগম্য ভাষা সংযোজন শিক্ষাথীর হক।

❖ শিক্ষকের লেকচার বা বক্তব্য যেন সকলেই শুনতে পায় সেদিকে শিক্ষকের খেয়াল রাখা, তারপর কোন শিক্ষার্থী না বুঝলে বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সহজবোধ্য করে আবারও বুঝানোর চেষ্টা শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের হক।

❖ শিক্ষার্থীদের প্রতি যতটা সম্ভব উদার হওয়া, রাগান্বিত না হওয়া এবং শিক্ষার্থী বুঝে না বলেই এভাবে বলছে মনে করে তার ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা।

❖ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক গ্রন্থ পড়া ছাড়াও অন্যান্য জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শ গ্রন্থ পড়ার প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়া আর অনাদর্শিক গ্রন্থ পড়া, ক্রয় ও সংরক্ষণ

করার প্রতি নিরুৎসাহিত করা।

❖ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনুকরণীয় মডেল, সচ্চরিত্রবান আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান উৎসাহদাতা হিসেবে শিক্ষার্থীদের সামনে নিজেদেরকে পেশ করা যেন এখানেও শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে এবং নিজেদেরকে গড়ার প্রেরণা পেতে পারে।

❖ শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে তথ্য ও তত্ত্ব ভিত্তিক নির্দেশনা পাওয়া।

❖ একাডেমিক পড়ালেখার পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ বিষয় যেমন : কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা প্রভৃতি আদর্শিককরণের লক্ষ্যে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া।

❖ পরিবার ও পারিবারিকমণ্ডলে, প্রতিবেশী ও সমাজ-সামাজিক অঙ্গনসহ আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার্থীদের করণীয় কী তার নির্দেশনা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ দানের পাশাপাশি প্রাপ্তি শিক্ষার্থীদের হক।

❖ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মনোভাব গঠনে আসমানী কিতাবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রের আদলে চরিত্র গঠনের দিক-নির্দেশনা দেয়া শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

❖ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে আজকের ছোট মানুষ আগামীতে বড় এমন অবস্থায় তাদের দায়-দায়িত্ব, তাদের দ্বারা সকলের হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ক সম্যক জ্ঞান প্রাপ্তিও শিক্ষার্থীদের হক বা অধিকার।

❖ শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল ও আদর্শ শিক্ষা অর্জনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করা।

পরিশেষে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে, শিক্ষার্থীদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, সুন্দর করে জ্ঞানপূর্ণ তাত্ত্বিক ভাষায় তাদের সামনে আগামী দিনের একটি সুন্দর জীবনের উপযোগিতা এবং পরকালের জীবনের কঠিন ও বেদনাদায়ক অসহনীয় যন্ত্রণার উপমা তুলে ধরে তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ার চেষ্টা করা শিক্ষকের যেমন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তেমনি তা শিক্ষার্থীদের হকেরও আওতাভুক্ত।

বড়দের কাছে ছোটদের হক

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রজ, বড় তথা প্রধানদের কাছে ছোট তথা নবীনদের জানার ও শিক্ষা নেয়ার রয়েছে অনেক কিছু। বড়দের কাছ থেকে ঈমান ও আমলের ট্রেনিংসহ জাতীয় পরিচিতি, জাতির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সত্য ও

সঠিক বীরত্বমাখা তথ্য ও তত্ত্ব এবং বর্তমান সময়ে আদর্শ পথ চলার দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তি ছোটদের অধিকার।

তাছাড়া আমরা জানি, কোমলমতি ছোট মানুষগুলো অনুকরণ, অনুসরণ প্রিয়। বড়দের তারা যে-যে কাজ করতে দেখে, যে পথে গমন করতে দেখে, যেভাবে কথা বলতে শুনে ঠিক সেভাবেই নিজেরা তা করতে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে। কাজেই ছোটদের আদর্শ চরিত্র ও সুষ্ঠু মন-মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং তাদের সৎ ও যোগ্য নাগরিক হওয়ার ব্যাপারে বড়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মনে রাখতে হবে এমনটি ছোটদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ বা করুণা নয়; এমন সুষ্ঠু ও আদর্শ পরিবেশ প্রাপ্তি ছোটদের হক বা অধিকার। অবশ্যই বড়দের এ ব্যাপারে সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে নতুবা আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড়াতে হবে এবং এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।

ছোটদের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও তাদের কল্যাণ কামনা

ছোটদের সঠিক পথের দিশা এবং সেই পথে গমন করে আদর্শ মানুষ হতে পারার লক্ষ্যে দু'আ করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা, সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করা বড়দের যেমন দায়িত্ব ছোটদের তেমনি হক। এ বিষয়ে প্রিয় নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লাম অত্যন্ত জোর দিয়ে বড়দেরকে তাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের নয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৬৯, বিআইসি)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না সে আমাদের নয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা.নং-১৮৭১, বিআইসি)

প্রকৃতপক্ষে বড়রা ছোটদের কল্যাণ কামনায় সবকিছু করবে, বলবে। আর এর নামই হচ্ছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثَ مَرَارٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لِلّٰه ولرسولهِ وَلِكِتَابِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

দীন হলো কল্যাণ কামনার নাম। তিনি একথা তিনবার বলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার কল্যাণ কামনা করা? তিনি বলেন : আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর কিতাবের, মুসলিম নেতৃবর্গের এবং মুসলিম সর্বসাধারণের। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা.নং-১৮৭৫, বিআইসি)

ছোটদের কাছে বড়দের হক

ছোট সব সময়ই ছোট। যদিও বা সে এক সময় হয় বড়; শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে এবং চাকুরি জীবনে হয় কর্মমুখর। তবুও যে বয়সে সে বড়; সে বয়সে বড় হয়ে যায় প্রৌঢ়– এ কথা সর্বজনবিদিত। আর তাইতো পাহাড়-পর্বত কেটে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বড়রা যখন সুন্দর আবাসস্থল গড়ে ছোটরা পরে এসে সেই আবাসস্থলেই দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি করে, সুফল ভোগ করে। আর এজন্যেই ছোটদের কাছে বড়দের যে রয়েছে অনেক চাওয়া, অনেক পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই ছোটদের প্রদি দয়া প্রদর্শনের কথা বলার পাশাপাশি বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথাও বলেছেন।

বড়দের প্রতি সালাম পেশ

ছোটরা যখন বড়দের দেখবে তখন তাদের প্রতি সালাম পেশ ইসলামের হুকুম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছোট বড়কে সালাম দেবে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম দেবে এবং কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান [প্রবেশানুমতি প্রার্থনা], হা. নং-৫৭৯০,আ.প্র.)

ইসলামে সালামের গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ সালামের মাধ্যমে মুসলিমরা যে বিনয়ী, ভদ্র-নম্র ও আদর্শ জাতি তা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এজন্যেই সালাম পেশকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرِو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন : অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হা. নং-৬৮, বিআইসি)

অবশ্য এই ক্ষেত্রে বড়দের নৈতিক দায়িত্ব হলো ছোটদের সালামের জবাব দেয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.

"তোমাদের যখন সালাম দেয়া হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম শব্দে সালামের উত্তর দাও অথবা (অন্তত) তার অনুরূপ উত্তর দাও। আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৮৬)

শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে খেয়াল রাখা, সভা-সেমিনারে তারা আসলে তাদেরকে সালামের সাথে বসতে দেয়া, হাসি মুখে কথা বলা, খোঁজ-খবর নেয়া ছোটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, আর বড়দের হক। আবার বড়রা কথা বলতে থাকলে তাদের কথা শেষ হতে না হতেই ছোটরা কথা বলতে শুরু করা বা তাদের কথার মাঝখানে না বুঝে, না শুনেই তাদেরকে কথা দিয়ে আঘাত করা– যা বেয়াদবীতুল্য, এমনটি না করাই উত্তম।

আর এমনভাবে কথা বলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও পছন্দ করতেন না। তাইতো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَوْ حَدَّثَا أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَتَيَاخَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِبْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوْا فِيْ أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ..................."

রাফে ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) ও মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ (রা) খাইবারে আসলেন এবং একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনে সাহল খুন হলেন। তখন 'আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং ইবনে মাসউদের (রা) দুই পুত্র হুয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা নাবী

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাদের সাথীর (হত্যার) ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন। 'আবদুর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি এ দলে সবার ছোট ছিলেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৭০৩, আ.প্র.)

অন্যদিকে এভাবে বড়দের মাঝে আগে কথা বলার চেষ্টা করা আদবের বিপরীত। কেননা কথা বলার আঘাত পিস্তলের গুলির চেয়েও মারাত্মক। আর তাই ছোটদের উচিত সব সময় কান পেতে কথা শুনা কিন্তু বড়দের মাঝে কথা বলে প্যাঁচ লাগানোর চেষ্টা না করা। আর যদি বলতেই হয় তাহলে বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে সুন্দর করে স্পষ্ট ভাষায় স্পষ্ট কথা বলা উত্তম।

সেই সাথে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার খুব পছন্দ। আর এটাই হচ্ছে সমাজ নামক সংগঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল। যে সমাজে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো হয় না সে সমাজে বিশৃঙ্খলা নিশ্চিত। সামাজিক উন্নয়ন হয় স্থবির অথবা মন্থর। সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে ছোটরা যখন বড়দের হক আদায় করে না তেমনি ছোটরাও তাদেরকে আবার সম্মান করে না। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সেই সমাজে অমানুষের বিস্তৃতি ঘটে থাকে। আর তাই বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাকিদ দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ اِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُّكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ.

যে যুবক প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে তার প্রবীণ বয়সে সম্মান প্রদর্শন করবে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৯৭১, বিআইসি)

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে,কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৮১, বিআইসি)

বড়দের আদর্শ কথা মেনে নেয়া ও সুন্দর করে কথা বলা

বড়রা যখন যা বলে তা যদি নীতি বিরুদ্ধ বা অনাদর্শিক হয়, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও কাজ বিরোধী হয় তাহলে তা মেনে নিতে ছোটরা বাধ্য নয়, বরং তা না মানাই উচিত। কিন্তু বড়রা যখন আদর্শ কথা বলে, দিক-নির্দেশনাও জীবন গঠনমূলক কথা বলে তখন তা মাথা নত করে

বিনয়ের সাথে মেনে নেয়া ছোটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কখনো বড়দের সাথে যুক্তিতর্ক পেশ বা দ্বিমত পোষণ করা উচিত নয়। তাছাড়া একজন ছোট যদি নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় তাহলে এস.এস.সি ও তার পরবর্তী জীবন সম্পর্ক সে না জানারই কথা। এক্ষেত্রে এম.এ পাস করা বড় একজন তাকে যে কথা বলতে পারবে সে কথা তো সে হয়ত ভাবেইনি। আর তাই কখনো ছোটরা এমন ভাব করা উচিত নয় যে, তারা সবই জানে। ছোটদের জন্য এমন মনে করাই হচ্ছে আদবের খেলাফ বা বিপরীত।

বরং ছোটদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, ছোটরা সব সময়ই বড়দের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে থাকবে অত্যন্ত বিনয়ী মনোভাবসম্পন্ন ও জানার জন্যে উদগ্রীব।

বড়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বড়রা যখন ছোটদের সুন্দর পরামর্শ দেয়, জীবনধর্মী কথা বলে, যে কোন প্রয়োজনে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, জীবনের ভিশন সেট করে পথ চলতে হাত ধরে এগিয়ে দেয়, তখন অবশ্যই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আজকাল এক শ্রেণির লোক আছে বিপদে পড়লে খুব অনুনয়-বিনয় করে কিন্তু যখন বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন এ সাহায্যকারীকে আর চেনে না। অধিকন্তু পারলে তার ক্ষতি করতেও দ্বিধাবোধ করে না। যা আজকের সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত কয়েকটি বাক্য থেকেই বুঝা যায়, "উপকার করলে অপকার পেতে হয়।" "উপকারের বিপরীত শাস্তি অপকার।"

ফলে এক শ্রেণির মানুষ কারোর উপকারে এগিয়ে আসতে চায় না, তাদের সাহায্যার্থে নিজেদের হস্ত প্রসারিত করে না। এতে মানবতার অপমৃত্যু ঘটছে আর এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর আদর্শের বিপরীত। মুসলিমদের আদর্শ হলো অবশ্যই কোন ভাই যখন কারোর কোন উপকার করে, সেটা যে কোন ধরনের উপকারই হোক না কেন মুসলিম মাত্রই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ মুসলিমদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ.

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা.নং-১৯০৪, বিআইসি)

মেহমানের হক

মেহমান বলতে শহর, গ্রাম ও মহল্লা অতিক্রমকারী মুসাফির বা অন্যের কাছে

আগমনকারী যে কোন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। যদিও তারা একই শহরের অধিবাসী হোক না কেন। আবার যারা সাক্ষাৎ করতে আসে তারাও মেহমান। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান করলে সেখানে যারা-যারা আসবে তারাও মেহমান।
মেহমানের হক হলো তাদের সম্মান করা, হাসি মুখে কুশল বিনিময় করা, ভাল ভাল কথা বলা এবং যথাসম্ভব তাদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমাননকে সম্মান করে।

মেহমানের কাছে মেজবানের হক

মেহমান বা অতিথিদের যেমন মেজবান বা যার বাড়িতে/বাসায় বেড়াতে যাওয়া হয়েছে তার কাছে সুন্দর ব্যবহার, ভাল আপ্যায়ন তথা খাবার, শোবার ব্যবস্থা পাওয়া হক তেমনি মেজবানেরও হক রয়েছে মেহমানের কাছে। মেজবান মেহমানের খেদমত করবে, সাদর সম্ভাষণ জানাবে কিন্তু মেহমান কিছুই করবে না তাতো হতেই পারে না। বরং উভয়েরই রয়েছে একে অপরের প্রতি কিছু করণীয় যা হক বা অধিকার হিসেবে গণ্য।

দাওয়াত গ্রহণ

কেউ যদি কাউকে তাদের কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয় তাহলে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা দাওয়াত দাতা তথা মেজবানের হক। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَه وَمَنْ دَخَلَ عَلى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَّخَرَجَ مُغِيْرًا.

যাকে দাওয়াত দেয়া হয়, সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে কোন খানা খায়, সে যেন চোর হিসেবে সেখানে প্রবেশ করে এবং লুণ্ঠন করে ফিরে আসে। (আবু দাউদ, খাদ্যদ্রব্য, হা. নং-৩৬৯৯, ই.ফা)

তিন দিন বেড়ানো

মেহমানের জন্য উত্তম হলো তিন দিন মেজবানের বাড়িতে বেড়ানো। কেননা মেজবানের দায়িত্ব হলো মেহমানকে সম্মান করা, ভাল খাবার খাওয়ানো, বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা করা, তার সাথে সুন্দর করে কথা বলা– এক্ষেত্রে মেজবান যদি কর্মস্থলে তথা বাসায় না থাকে বা বাসায় থাকল কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকে (বিশেষ করে চাকুরিজীবিদের মাসের শেষে হাতে তেমন টাকা-পয়সা থাকে

না অনেকেই একটু কষ্টে শেষ সপ্তাহটা অতিক্রম করতে হয়), বাসায় বাজার করার মত লোক না থাকে, কেউ অসুস্থ থাকে, শহর এলাকায় বাসায় শোবার কক্ষের সমস্যা, বাথরুমের সমস্যা, পর্দা লঙ্ঘন হওয়ার আশংকা, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা তথা পরীক্ষার সময় বাসায় মেহমান থাকলে শিক্ষার্থীরা পড়ায় মনোযোগী হতে চায় না– এমন ক্ষেত্রগুলোতে মেজবানের হক হলো মেহমান নিজেই খেয়াল করে বেড়ানোর সময়টা হয় সময় সুযোগ বুঝে করবে নতুবা একান্তই করতে হলে সংক্ষিপ্ত করে নেবে। অন্যথায় দু'জনেই আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ হয়ে যাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيُكْرِمَ ضَيْفَه جَائِزَتُه يَوْمُه وَلَيْلَتُه الضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَّمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَّلاَ يَحِلُّ لَه اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَه حَتّٰى يُحَرِّجَه.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত হবে এক দিন এবং এক রাত তার মেহমানের উত্তমরূপে সম্মান করা। আর মেহমানের হক হলো এক দিন এবং এক রাত। আর যিয়াফত বা মেহমানী হলো তিন দিনের জন্য, পরে তা সাদাকা হবে। আর মেহমানের জন্য উচিত নয় যে, সে মেজবান (গৃহস্বামী) কে কষ্ট দেয়ার জন্য অধিক দিন সেখানে থাকবে। (আবু দাউদ, খাদ্যদ্রব্য, হা. নং-৩৭০৪, ই.ফা)

মেজবানের জন্য দু'আ

মেহমানের কাছে মেজবানের আরেকটি হক হলো মেজবান যে মেহমানকে ত্যাগ স্বীকার করে মেহমানদারী করেছে সেজন্য বেশি বেশি করে দু'আ করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَنَعَ اَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ اللنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَه فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ اَثِيْبُوْا اَخَاكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا اِثَابَتُهُ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَه فَاَكَلَ طَعَامَهُ وَيَشْرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَذٰلِكَ اِثَابَتُهُ.

জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবুল হাইছাম ইবন তাইহান (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খানা পাক করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের দাওয়াত দেন। সকলের খাওয়া শেষ হলে তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিনিময় প্রদান কর। সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার জন্য বিনিময় কি?

তখন তিনি বলেন : যখন কোন ব্যক্তি কারো বাড়িতে গিয়ে তার খাবার খায় এবং পানি পান করে, তখন তার জন্য দু'আ করে। এ হলো তার বিনিময়। (আবু দাউদ, খাদ্যদ্রব্য, হা. নং-৩৮১০, ই.ফা.)

ইয়াতীমের হক

ইসলাম সকল মানুষকে একে অপরের প্রতি সদাচারের শিক্ষা বিশেষ করে সমাজের ইয়াতীম, দুঃস্থ, অসহায়, মিসকীন ও মজলুম মানুষের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করার প্রতি আল্লাহ খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীম সম্পর্কে। আপনি বলুন : তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তবে তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে হিতকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২২০)

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّه كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

"তোমরা ইয়াতীমদের দেবে তাদের সম্পদ এবং বদল করবে না মন্দকে ভালোর সাথে, আর গ্রাস করবে না তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে, নিশ্চয় এ হলো মহাপাপ।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ০২)

এবার যারা ইয়াতীমের হক আদায় করে না বরং তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করে তাদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ط فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ.

"তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।" (সূরা আল-মাউন, ১০৭ : ০১-০২)

ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং তাদের লালন-পালনে যারা এগিয়ে আসবে তাদের লক্ষ্য করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন :

مَنْ قَبَضَ يَتِيْمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ لَهُ.

কেউ মুসলিমদের কোন ইয়াতীমকে এনে নিজের পানাহারে শরীক করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ না করে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা.নং-১৮৬৭, বিআইসি)।

ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করা

পিতার আদরমাখা ডাক, সোহাগ ভরা হাসি, দু'গাল ও কপালে চুমো আর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর্শের সাথে পথ চলার আহ্বান বঞ্চিত ইয়াতীম শিশুরা যখন দেখে তার সমবয়সী অন্যরা বাবার হাত ধরে স্কুলে, মসজিদে, ঈদগাহে যায় কিন্তু আজ সে তা পাচ্ছে না তখন দু'চোখ গড়িয়ে কার না পানি ঝরবে? আর তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইয়াতীম হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমগ্র মানুষের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কুরআনুল কারীমে বলেছেন :

اَلَم يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاوَى وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنَى فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ.

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন। সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না।" (সূরা আদ-দুহা, ৯৩ : ০৬-০৯)

ইয়াতিমের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযত করা

পিতার মৃত্যুতে পিতার ভাই চাচা, ঘরের চারপাশের প্রতিবেশী এবং পিতার বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয়দের দায়িত্ব হলো তাদের কাছে যদি মৃতের কোন ধন-সম্পদ থাকে তাহলে তা স্ব-প্রণোদিত হয়ে ফেরত দেয়া। মৃতের সন্তান ছোট হলে তাদের বলা হয় ইয়াতীম, নাবালক; আর এ অবস্থায় তাদের আদর করে অভয় দেয়া, সান্ত্বনা দেয়া, সুন্দর ভবিষ্যতের কর্মসূচি গঠনে সহায়তা করা, তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযত করা, তাদের স্নেহ-ভালবাসার শৃঙ্খলে রেখে আদর্শ মানুষ হওয়ার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বালেগ হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া সকলের কর্তব্য। আল-কুরআনুল কারীম ও আল-

হাদীসের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শ অনুসারে এ কর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করা ইয়াতীমের হক।

যারা ইয়াতিমের সম্পদকে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাদের অশুভ পরিণতির কথা জানিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتمى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

"যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১০)

মিসকীন ও অভাবীদের হক

মিসকীন হচ্ছে যাদের ঘরে জীবিকা বা আহার উপযোগী খাবার নেই, সন্তানের পড়ালেখা করানোর মত অর্থ-সম্পদ নেই, কন্যা বিবাহ দেয়ার সামর্থ্য নেই, রোগে চিকিৎসা করা বা ঔষধ কেনার সামর্থ্য নেই এমন। এ সকল লোকজন দারুণ দুঃখ-কষ্টে জীবন ধারণ করে। তারা কারোর কাছে মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারে না, আবার যা ইচ্ছা তা করতেও পারে না।

আর এজন্যেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে যাকাত ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করার জন্য সমাজের বিত্তশালীদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الاُكْلَةُ وَالاُكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِىْ لاَيَجِدُ غِنًى وَلاَ يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ.

মিসকীন সে ব্যক্তি নয় যে এক লোকমা বা দু'লোকমার এবং একটা-দুটা খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ফেরে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার কোন সহায়-সম্বল নেই আর লোকেরাও তার অবস্থা জানে না যে, তাকে সাহায্য করবে। (সুনানু নাসাঈ, যাকাত, হা. নং-২৫৭৫, ই.ফা.)

তারপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রশ্নের জওয়াবে মিসকীনদেরকে সাহায্য করার তাকিদ দিয়ে বলেন :

اِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلى بَابِىْ فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَمْ تَجِدِىْ شَيْئًا تُعْطِيْـهِ اِيَّاهُ اِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ اِلَيْهِ.

কখনো কোন মিসকীন আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার মত তখন কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন যে, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত একটি ঝলসানো খুর ব্যতীত আর কিছুই না পাও তবে তাকে তাই দাও। (সুনানু নাসাঈ, যাকাত, হা. নং-২৫৭৬, ই.ফা.)

আর যারা মিসকীনকে সাহায্য-সহযোগিতা না করে তাকে উপহাস করে সমাজে কোণঠাসা করে রাখে, সমাজের কোন অঙ্গনে তাকে স্থান দিতে চায় না, কথায়-কথায় অপমান লাঞ্ছনা করে, কখনো সাহায্য করলে তা বলে বেড়ায়, খোঁটা দেয়, অন্যদেরকে সাহায্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেন এই বলে ঃ

وَلاَ يَحُضُّ عَلى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

"তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।" (সূরা আল-মাউন, ১০৭ : ০১, ০৩)

আর যারা মিসকীনদের সাহায্য করবে তাদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর দাও আত্মীয়কে তার হক এবং মিসকীন ও পর্যটককেও। এটা শ্রেয় তাদের জন্য, যারা আকাঙ্ক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা আর-রূম, ৩০ : ৩৮)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মিসকীনদের মহব্বত করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে

উত্থিত করো। (সুনান ইবনে মাজাহ, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হা. নং-৪১২৬, আ.প্র.)

করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) দাতা ও গ্রহীতার হক

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে-ফিরতে প্রতিনিয়ত মানুষকে একে অপরের মুখোমুখি হতে হয়। একে অপরের কাছ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে বা অভাবের কারণে করজে হাসানা গ্রহণ করতে হয়। এর কারণে মানুষের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর সে সম্পর্ককে সুদৃঢ়করণ এবং দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে ইসলাম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে করজ দাতা ও গ্রহীতার হক নির্ধারণ করে দিয়েছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ প্রয়োজনে মানুষকে করজে হাসানা দানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বলেন :

رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلى بَاب الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لاَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ اِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

মিরাজের রাতে আমি জান্নাতের একটি দরজায় লেখা দেখলাম, দান-খয়রাতে দশ গুণ সাওয়াব এবং করজ বা ঋণ প্রদানে আঠারো গুণ। আমি বললাম : হে জিবরাঈল! করজ দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন, ভিক্ষুক নিজের কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায়, কিন্তু করজদার প্রয়োজনের তাকিদেই কর্জ চায়। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪৩১, আ.প্র.) অন্যদিকে এমন বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যিনি উপকার করার জন্য টাকা বা যা প্রয়োজন তা নিয়ে এগিয়ে আসলেন তখন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও আল্লাহর নাবী নির্দেশ দেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ اللهَ.

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৯০৪, বিআইসি)

করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেয়া মানে আল্লাহকে দেয়া

সমাজ-সামাজিকতার অঙ্গনে প্রতিদিনকার চাহিদা পূরণে কেউ যখন কোন সমস্যার মুখোমুখি তখন সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। আর একনিষ্ঠভাবে

সাহায্য চাইতে থাকে পরম স্রষ্টা সকলের সকল সমস্যার সমাধান দাতা আকাশ ও জমিনের মালিক সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার মনে কার কাছে থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এটি উদ্রেক করে দেন। ফলে সে অনেকের মধ্য থেকে কাউকে মনে মনে স্থির করে এগিয়ে যায় আর আল্লাহ তখন ঐ ব্যক্তির মনেও দেয়ার ইচ্ছা শক্তি দান করেন। কারণ আল্লাহ তাকে সম্মানজনক পুরস্কার দিতে চান। তাই আল্লাহ সম্পদশালী সামর্থ্যবান লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন :

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"যদি তোমরা আল্লাহকে করজে হাসানা দাও, তবে তিনি তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ মহা গুণগ্রাহী, অতিশয় সহনশীল।" (সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১৭)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ধনীদেরকে করজে হাসানা দেয়ার জন্য ডেকে-ডেকে বলছেন :

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"সে ব্যক্তি কে, যে করজে হাসানা দেয় আল্লাহকে? আল্লাহ তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন তার জন্য। আর আল্লাহ সংকুচিত করেন এবং সম্প্রসারিত করেন, তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৪৫)

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَه لَه وَلَه اَجْرٌ كَرِيْمٌ.

"সে ব্যক্তি কে, যে করজে হাসানা দেয় আল্লাহকে? আল্লাহ তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" (সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ১১)

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا.

"আর তোমরা দাও আল্লাহকে করজে হাসানা।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ যে করজে হাসানা চাচ্ছেন তা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথার দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ধনী শ্রেণিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের বিপদে-আপদে করজে হাসানা চাইলে তা দেয়ার জন্য পরোক্ষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ এ কথা সকলেই জানে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের মুখাপেক্ষী নন সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর তাই সকলের সবকিছুর দাতা

মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই হওয়ায় তিনি ধনীদের মাধ্যমে অসহায়দের সম্পদের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং যারা কাউকে করজে হাসানা প্রদান করবে তারা যেন পরোক্ষভাবে মহান আল্লাহকেই করজে হাসানা প্রদান করল।

করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) দাতার করণীয়

ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ প্রয়োজনভেদে সম্পদশালীরা করজে হাসানা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে দাতার হক হলো করজে হাসানা প্রদানে যে সকল শর্ত বা কথোপকথনে গ্রহীতা যে ওয়াদা করবেন তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। বিশেষ কোন কারণে ওয়াদা অনুযায়ী পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ দাতার সাথে যোগাযোগ করে অসুবিধার কথা তাকে বুঝিয়ে বলা। কিন্তু কোনভাবেই ঋণ নেয়ার পর ওয়াদা অনুযায়ী পরিশোধ না করা, দেখা-সাক্ষাৎ না করা, যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া, মোবাইলে ফোন করা হলে রিসিভ না করা, ফোন না করা, সীম কার্ড পরিবর্তন করে নেয়া, অন্যকে দিয়ে ফোন রিসিভ করানো, সত্য-মিথ্যা এবং আজে-বাজে কথা বলা মানে ঋণ দাতাকে কষ্টা দেয়া ঋণ দাতার হক হরণেরই শামিল। আর এমন ক্ষেত্রে ইসলাম ঋণদাতা তথা পাওনাদারকে কড়া কথা বলার অধিকার দিয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা তার সম্মানের উপরে হস্তক্ষেপ ও শাস্তি বৈধ করে। সুফিয়ান বলেছেন, তার সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ বৈধ করার অর্থ হল একথা বলা যে, তুমি দেরি করেছ; আর শাস্তির অর্থ বন্দী করা। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল এসতেকরাদ, অনুচ্ছেদ ১৪, খণ্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৪৫৫, আ. প্র.)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একজন লোক আসে এবং তাঁকে কড়া তাগাদা করে। সাহাবীরা লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্ধত হলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল এসতেকরাদ, হা. নং-২২২৬, আ.প্র.

করজে হাসানা আদায়ে কোমল ব্যবহার

ঋণের টাকা উসূল করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার সাথে কোমল ব্যবহার ও

বিনীতভাবেই তাগাদা প্রদান করা উত্তম। কেননা কেউ সমস্যা ছাড়া ঋণগ্রহণ করে না। ফলে ঐ সমস্যা সমাধানে আপনার হস্ত প্রসারিত করার তাওফীক যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদান করেছেন যেহেতু মহান আল্লাহর কাছে আরো বেশি-বেশি রহমত প্রত্যাশা করাই উত্তম। সেই সাথে সুন্দর ভাষায় তার অবস্থানভেদে তাকে তাগাদা দেয়া ইসলাম সমর্থন করে। প্রিয় নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِيْ عَفَافٍ وَافٍ اَوْ غَيْرِ وَافٍ.

কোন ব্যক্তি পাওনা আদায়ের তাগাদা দিলে যেন বিনীতভাবেই তাগাদা দেয়, তাতে পাওনা আদায় হোক বা না হোক। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪২১, আ.প্র.)

خُذْ حَقَّكَ فِيْ عَفَافٍ وَافٍ اَوْ غَيْرِ وَافٍ.

তুমি তোমার পাওনা ভদ্র ও বিনীতভাবে গ্রহণ করো, তা পূর্ণরূপে আদায় হোক বা না হোক। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪২২, আ.প্র.)

করজে হাসানা পরিশোধে অবকাশ দেয়া

সমাজ জীবনে কেউ ঋণ গ্রহণ করে একান্তই নিরূপায় হয়ে জঠর জ্বালা বা লজ্জা নিবারণের জন্য, বস্ত্র অথবা চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য, কেউবা ঋণ গ্রহণ করে গাড়ি-বাড়ি কেনা বা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণের প্রত্যাশায়– এ দু'জন ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ পলিসি এক হওয়ার নয়। এক্ষেত্রে প্রথম যে লোক তাদের নিত্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য হলো যদি তারা যথাসময়ে ঋণের টাকা শোধ করতে অপারগ হয় বা পুরো অংশ ফেরত দিতে অসমর্থ হয় তাহলে ঋণ দাতা সম্ভব হলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের পুরস্কৃত করবেন। প্রিয় নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ.

যে ব্যক্তি অস্বচ্ছল (ঋণগ্রস্ত) ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪১৭, আ.প্র.)

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّظِلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا اَوْ لِيَضَعْ لَهُ.

যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ার নিচে স্থান দিন, সে যেন ঋণগ্রস্ত

ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথব. ত'র দেনা মাফ করে দেয়। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪১৯, আ.প্র.)

করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) গ্রহীতার স্মরণীয়

করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) গ্রহণকারীর জন্যে উত্তম হলো তিনি যে বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে ঋণ গ্রহণ করেছেন তা থেকে মুক্তির পর-পরই আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করে দেয়া। করজে হাসানা দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং সবশেষে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে কল্যাণ কামনা করা ঋণ দাতার হক। আর যিনি ঋণদাতার কাছে দ্রুত তার পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন ইসলামের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও উত্তম ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে করজ পরিশোধ করে। (সুনান নাসাঈ শরীফ, ক্রয়-বিক্রয়, হা. নং-৪৬৯৩, ই.ফা)

اِنَّ خَيْرَكُمْ (اَمْ مِنْ خَيْرِكُمْ) اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪২৩, আ.প্র.)

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করজে হাসানা গ্রহীতাকে করজ পরিশোধ করতে না পারা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে এ থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন :

عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ اَللّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

'উরওয়াহ থেকে বর্ণিত যে, আয়িশা (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এই বলে দু'আ করতেন : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি।" একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণ থেকে এত বেশি পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল এসতেকরাদ, হা. নং-২২২২, আ.প্র.)

অন্যদিকে যে ব্যক্তি করজ গ্রহণ করলো কিন্তু তা পরিশোধের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা বা পরিশোধ করতে হবে এমন মনে করে না আল্লাহর রাসূল তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪১১, আ.প্র.)

করজ (ঋণ) আদায়ে বিলম্ব না করা

করজ আদায়ে সামর্থ্য হওয়ার পর অহেতুক বিলম্ব করা করজ দাতার কাছে তার অবস্থান ও মান-সম্মানকে বিনষ্ট করার শামিল। এমন অবস্থা করজ গ্রহীতার জন্য কখনোই শুভকর নয়। আর এমন ক্ষেত্রে করজ দাতার হক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

ধনবান লোক যদি করজ আদায় করতে দেরি করে, তাহলে করজ দাতার অধিকার রয়েছে তার অনিষ্ট সাধন করার, শাসক তাকে বন্দীও করতে পারে। (সুনানু নাসাঈ, ক্রয়-বিক্রয়, হা. নং-৪৬৮৯, ই.ফা)

অন্যদিকে ধনী ব্যক্তির করজ পরিশোধে টালবাহানা করাকে যুলুমের সাথে তুলনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مطْلُ الغني ظُلْمٌ.

ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা অত্যাচারের শামিল। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল এসতেকরাদ, হা. নং-২২২৫, আ.প্র.)

আল্লাহর পথে শহীদ হলেও করজ (ঋণ) থেকে মুক্তি না পাওয়া

আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় যারা আন্দোলন করে কাফির-মুশরিক বা ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে নিহত হয় তারাই শহীদ। তাদের মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে অনেক বেশি। তাদের জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত। কিন্তু যদি তারা দুনিয়ার জীবনে কারোর কাছ থেকে কখনো কোন করজ নিয়ে থাকে এবং তা পরিশোধ না করে থাকে তাহলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হয়ে উঠেন কঠোর। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ الدَّيْنَ.

আল্লাহর পথে নিহত হওয়া সমস্ত গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কিন্তু ঋণ (মাফ হয় না)। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৬৩২, বিআইসি)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلى جَبْهَتِهِ ثُمَّ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَاَلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذَا التَّشْدِيْدُ الَّذِىْ نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ رُجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ اُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ اُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ.

মুহাম্মাদ ইবন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠান, পরে তাঁর হাত ললাটের উপর স্থাপন করে বলেন : সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো। আমরা ভয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। পর দিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ কঠোরতা কী ছিল, যা অবতীর্ণ হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, আবার জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার উপর করজ থাকে, তবে সে করজ আদায় না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সুনানু নাসাঈ, ক্রয়-বিক্রয়, হা. নং-৪৬৮৪, ই.ফা)

জানাযার আগেই করজ (ঋণ) আদায়ের ঘোষণা দেয়া

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে মৃত্যুর পর তার সম্পদ যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়া বা তার জানাযার নামায আদায়ের পূর্বেই তা পরিশোধের কথা বলা উত্তম। আর যদি এ ঋণ পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার নিকটাত্মীয় কেউ ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার সংকল্প করলে আল্লাহ তার প্রতি খুশি হন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوْا عَلى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَا اَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا.

এক মৃত ব্যক্তিকে জানাযার জন্য নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি তার ঋণের জামিন হচ্ছি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পরিশোধ করার জন্য তো? তিনি বলেন, পরিশোধ করার জন্য। তার ঋণের পরিমাণ ছিলো আঠার বা ঊনিশ দিরহাম। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪০৭, আ.প্র.)

এবার ঐ ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, তার নাবালিগ সন্তান থাকে আর ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকে এবং কেউ তা দিতে সম্মতও না হয় তাহলে এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব দেশের সরকারের। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তিনিই এ ঋণ গ্রহীতার পক্ষে পরিশোধ করার দায়িত্ব নিতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রেখে গেল তা তার উত্তরাধিকারীর এবং যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেল তা আদায় করা আমার দায়িত্ব। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল এসতেকরাদ, হা. নং-২২২৩, আ.প্র.)

করজ (ঋণ) পরিশোধকারীর ব্যাপারে জান্নাতের ঘোষণা

করজ পরিশোধ করার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা হয় সুদৃঢ়। মানুষ হয় একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়া-মায়া, ভালবাসা ও মমত্ববোধে একে অপরের সঙ্গী। সেই সাথে আল্লাহর জান্নাতে যাওয়াও হয় তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ;

مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِئٌ مِّنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ.

তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে তার প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে : অহংকার, আত্মসাৎ ও ঋণ। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪১২, আ.প্র.)

অন্যদিকে যারা করজ যথাযথভাবে আদায় করবে না তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা হলো :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ اَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَّلاَدِرْهَمٌ.

কোন ব্যক্তি তার যিম্মায় এক দীনার বা এক দিরহাম পরিমাণ ঋণ রেখে মারা গেলে (কিয়ামাতের দিন) তার নেক আমলের দ্বারা তা পরিশোধ করা হবে। আর সেখানে কোন দীনারও থাকবে না, দিরহামও থাকবে না। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা নং-২৪১৪, আ.প্র.)

তিন কারণে দেনাদার হলে তার পক্ষ থেকে দেনা পরিশোধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَىْ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا مَاتَ اِلاَّ مَنْ يَّدِيْنُ فِيْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَسْتَدِيْنُ يَتَقَوّى بِهِ لِعَدُوِّ اللهِ وَعَدُوِّهِ وَرَجُلٌ يَمُوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيْهِ اِلاَّ بِدَيْنٍ وَرَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلى دِيْنِهِ فَاِنَّ اللهَ يَقْضِيْ عَنْ هؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে কিয়াম্নাতের দিন তার থেকে ঋণ কর্তন করা হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে ঋণ করে, তার দ্বারা সে আল্লাহর দুশমন এবং নিজের দুশমনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। (দুই) কোন ব্যক্তির নিকট কোন মুসলিম মারা গেলে তাকে দাফন করার জন্য সে ঋণগ্রস্ত হলে। (তিন) যে ব্যক্তি অবিবাহিত, দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহর দীন থেকে বিপথগামী হওয়ার আশংকায় ঋণ করে বিবাহ করে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাদের পক্ষ থেকে তাদের ঋণ শোধ করবেন। (সুনান ইবনে মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪৩৫, আ.প্র.)

চাকর-চাকরানীর হক

পারিবারিক পরিমণ্ডলে পরিবারের সকল কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে গৃহ পরিচারিকা বা চাকর-চাকরানীর প্রয়োজনীয়তা অনেকে উপলব্ধি করে থাকে। বাসায় চাকর-চাকরানী রাখাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। তবে ফাতিমা (রা) একবার কাজের সাহায্যকারী হিসেবে একজন লোক চাইলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, যতটা সম্ভব যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের কাজ নিজেরা করতে চেষ্টা করাই উত্তম। তবু যদি চাকর-চাকরানী বাসায়

রাখতেই হয় তাহলে তাদের হকের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اخِرُ كَلَامِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةُ الصَّلَاةُ وَاتَّقُوا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সর্বশেষ কথা ছিলো : সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে) এবং তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। (আবু দাউদ, নিদ্রা সম্পর্কীয়, হা. নং-৫০৬৬, ই.ফা)

উত্তম আচরণের তাকিদ

যারা বাসা-বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করে ইসলাম তাদের সাথে উত্তম আচরণের তাকিদ দেয়। কারণ পরিবার সংগঠনে যারা গৃহকর্ত্রীকে কাজের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করেন তারা আসলে অন্য সংগঠনের কাজের লোকের মত দক্ষ অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত কেউ নন। তাই তাদের উপর সংসারের অনেক কাজের ভার দেয়া বা সুষ্ঠু সমাধান আশা করাটা সমীচিন হবে বলে মনে হয় না। ফলে যা দায়িত্ব দেয়া হবে তা অবশ্যই ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। অনেক সময় কথার মাধ্যমে বুঝালে যদি তারা না বুঝতে পারে তাহলে বলার পাশাপাশি প্রথম-প্রথম কাজটি নিজ হাতে করে দেখিয়ে দিলে তাদের কাছ থেকে হয়তোবা প্রত্যাশার কাছাকাছি মানসম্মত কাজ করিয়ে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো কেউ যদি মনে করে তারা আমার অধীন আমি যখন যা বলব ঠিক তখনি তা-তা করতে বাধ্য, তারা রাতে সবার শেষে ঘুমাবে, সকালে সবার আগে ঘুম থেকে জেগে উঠবে; সে ঘর কন্যার কাজ করবে, দোকানে বা বাজারেও যাবে, ড্রয়িং রুমে অভ্যাগত অতিথিদের জন্য নাস্তা তৈরি ও পরিবেশন করবে, কলিং বেল বাজলেই দৌড়ে গেট খুলতে যাবে, কাপড় ইস্ত্রি করবে, জুতা কালি করবে, গাড়ি মুছবে, ছোটদেরকে নিয়ে স্কুল-কলেজে যাবে ইত্যাদি তাহলে এত দিকে খেয়াল রাখতে যেয়ে তার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং তাদেরকে এত কাজ করতে না দিয়ে মূলতঃ গৃহকর্ত্রীর কাজের পরিপূরক হিসেবে মনে করলেই বোধহয় ভাল হবে। তাছাড়া তাদের হকের ব্যাপারে সচেতন করতে যেয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

"আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন, নিকট প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পথচারী, সঙ্গী, মুসাফির এবং দাস-দাসীদের প্রতি ইহসান বা মানবিক আচরণ কর। আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত লোকদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَّسُوْءُ الْخُلُقِ شُوْمٌ.

দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উত্তম এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা দুর্ভাগ্যের কারণ। (আবু দাউদ, নিদ্রা সম্পর্কীয়, হা. নং-০৫৭২, ই.ফা)

ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ اَعَادَ اِلَيْهِ الْكَلاَمَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ اعْفُوا عَنْهُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

'আব্বাস ইবন জুলায়দ হাজারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, একবার এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গোলামকে কতবার ক্ষমা করবো? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলে সে ব্যক্তি আবার একই প্রশ্ন করে। তখনও তিনি চুপ থাকেন। লোকটি তৃতীয়বার একই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তাদের প্রত্যহ সত্তর বার ক্ষমা করবে। (আবু দাউদ, নিদ্রা সম্পর্কীয়, হা. নং-৫০৭৪, ই.ফা.)

যা খাবে, পরিধান করবে তাদেরকে তাই দেবে

চাকর-চাকরানীদের হকের ব্যাপারে মানবতার নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য পরিষ্কার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اِذَا صَنَعَ لاَحَدِكُمْ خَادِمُه طَعَامًا ثُمَّ جَاءَه بِه وَقَدْ وَلِىَ حَرَّه وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَه

فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً اَوْ أُكْلَتَيْنِ.

যখন তোমাদের কারো চাকর খাবার তৈরি করে আনে এবং সে তা পাকাবার সময় তাপ ও উত্তাপ সহ্য করে, তখন মনিবের উচিত, তাকে নিজের সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ানো। আর যদি খাবারের পরিমাণ কম হয়, তবু তাকে এক বা দুই লোকমা খাদ্য দেয়া উচিত। (আবু দাউদ, খাদ্যদ্রব্য, হা. নং-৩৮০৩, ই.ফা)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍ الْغِفَارِيَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ اِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِيْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ.

মারূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবু যার আল গিফারী (রা) কে দেখলাম তিনি এক জোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন এবং তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছে। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস) গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি কি তার মায়ের কথা বলে তাকে লজ্জা দিয়েছো? তারপর বলেন, তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই থাকলে সে নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান করাবে। তাদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য কর। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইতক ওয়াল ফাদালাহ, হা. নং-২৩৬০, আ.প্র)

কাজের লোককে মারধর না করা

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলাম ধর্মেই ধনী-দরিদ্র, চাকর-মনিব থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে সকলের হক বা অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই কোনভাবেই কাজের লোককে মারধর করা ইসলাম সমর্থন করে না। যদি চাকর-চাকরানীদের পছন্দ না হয়, প্রয়োজন পূর্ণ না হয় তাহলে তাদেরকে ত্যাগ করায় ইসলাম অনুমতি

দেয়। কিন্তু রেখে সামান্য ভুল-ক্রটিতে বকাবকি করা, এক পর্যায়ে মারধর, বেতনের টাকা কেটে রাখা, তাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে না দেয়া বা দিলেও পাতিলের শেষ বা নিচের দিকে যদি কিছু থাকে তাহলে তারা খাবে। আবার যদি ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে তাহলে ধমক, পাশে দাঁড়ালেও কোথাও বলতে শুনা যায় দাঁড়িয়ে কি দেখস? তোকে না বলছি এমনভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবি না– যা ঐ দিকে ইত্যাদি। সারাক্ষণ দূর-দূর ছে-ছে এসব করা ঠিক নয়। প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আর এক্ষেত্রেও জবাব দানের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

চাকর-চাকরানীর কাছে মালিকের হক

বাসার অন্দর মহল থেকে শুরু করে সকল কক্ষে যারা অবাধে বিচরণ করে ড্রয়িং থেকে ডাইনিং টেবিল সর্বত্র পরিবারের সদস্যরা যখন যা বলে তা সবকিছু যারা শুনে তাদের মধ্যে অন্যতম বাসার কাজে নিয়োজিত চাকর-চাকরানী। যারা পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য। তাই তাদের কাছে মনিব বা বাসার মালিকের অনেক হক বা অধিকার– যা নিম্নরূপ :

❖ তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মত কর্তা ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত সবকিছু শুনে থাকেন তাই তা আমানত রাখা বা বাসার বাইরে কারোর কাছে তা বলে না দেয়া।

❖ মনিবের সকল সম্পদ ও সকল কিছুর যথাযথ হিফাযত এবং কোনভাবেই যেন নষ্ট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

❖ মনিবের ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে তাদের দিকে খেয়াল রাখা।

❖ বাসার সকল সদস্যের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাস যখন তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে (উত্তমরূপে তার খেদমত করে ও নির্দেশ পালন করে) এবং তার রবের (আল্লাহ তা'আলার) ইবাদাতও অতি উত্তমরূপে আদায় করে তখন সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়।(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইত্ক ওয়াল ফাদলাহ, হা. নং-২৩৬৫, আ.প্র)

❖ কোন কিছু যেন ভেঙে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা বা যত্নশীল হওয়া।

❖ কোন কিছু লুকিয়ে নেয়ার চেষ্টা না করা।

❖ চাকর-চাকরানী তার মালিকের কল্যাণ কামনায় দু'আ করা।

❖ অন্যের উস্কানীতে মনিবের সাথে খারাপ আচরণ বা মনিবের বদনাম না করা। এখানে উস্কানী দাতা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ مَمْلُوْكَه فَلَيْسَ مِنَّا.

যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী বা দাস-দাসীকে, তার স্বামী বা মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ, নিদ্রা সম্পর্কীয়, হা. নং-৫০৮০, ই.ফা)

প্রতিবেশির হক

গ্রামে বা শহরে বাড়ির পাশে বাড়ি, বাসার পাশে বাসা, একটি পরিবারের পাশে আরেকটি পরিবার অবস্থিতির মাধ্যমেই পাড়া বা মহল্লা গড়ে উঠে। আর এভাবে যারা কাছাকাছি বাস করে তারা পরস্পরের প্রতিবেশী। তদ্রূপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যার সাথে একত্রে সফরে যাওয়া হয় বা বিদেশে এক সঙ্গে সফর করা হয়, থাকা হয় এমন সফর সঙ্গী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সাথে পড়ালেখা বা হোস্টেলে, হলে অবস্থানসহ অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যে কোন কর্মস্থলে এক সঙ্গে যারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবস্থান করে তারাও প্রতিবেশির আওতাভুক্ত। যদিও তারা খুবই সীমিত সময়ের জন্য থাকে তবু ততক্ষণের জন্য প্রতিবেশির নির্ধারিত অধিকার তাদের প্রাপ্য।

মানুষ মানুষের জন্য। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন এক সৃষ্টি। কিন্তু এ মানুষকে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে পশু তথা বানরের শ্রেণিভুক্ত বলে মনে করা হয় বলে তথায় না পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব স্বীকৃত, না পাড়া-প্রতিবেশির হক নিয়ে রয়েছে কোন চিন্তা-ভাবনা। সেখানে ঘরের পাশে এমনকি নিজ ফ্লাটের অপর পাশে কে বসবাস করে তা জানা নেই। জীবনের শেষ পর্যন্ত হয়তো একটি ভবনের বা বাড়ির দু'দিকে বসবাসকারী দুই ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে কোন সাক্ষাৎ বা সুসম্পর্কও গড়ে উঠে না।

কিন্তু ইসলাম হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের আদলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে একটি পরিবার পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থানকারী মানুষের মধ্যে যেমন পারস্পরিক সহৃদয়তা, মহানুভবতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমনি একই পাড়ার অধিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ সহৃদয়তা আন্তরিকতা গড়ে তোলা মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। এই কারণে মানুষের জন্য তাঁর রচিত বিধানে এক আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়ার পরপরই

পিতা-মাতা ও নিকটতম পাড়া-প্রতিবেশিদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

"এবং দাসত্ব কবুল কর এক আল্লাহর এবং তাঁর সাথে এক বিন্দু শিরক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর। সদাচরণ কর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৩৬)

আমাদের প্রিয়নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশী সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় নারীদের ভূমিকার কথাও বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ পুরুষরা কর্ম ব্যস্ততার কারণে অবস্থান করেন দেশের বা বাসার বাইরে আর নারীরা থাকেন বাসায়। ফলে প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক আর দ্বন্দ্ব দুটো ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই বেশি। এজন্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে নিজেদের মাঝে উপঢৌকন আদান-প্রদানে উৎসাহ দিতেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تَهَادُوْا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسَنِ شَاةٍ.

তোমরা একে অপরকে উপহার দাও। উপহার মনের ময়লা দূর করে। এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর পায়ের এক টুকরা ক্ষুর হলেও তা উপহার দিতে যেন অবহেলা না করে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ওয়ালা ওয়াল হেবা, হা. নং-২০৭৭, বিআইসি)

প্রতিবেশির শ্রেণিভেদ

প্রতিবেশিদের অবস্থান ও আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সূরা আন-নিসার ৩৬তম আয়াতের ভিত্তিতে যথাযথভাবে প্রতিবেশির হক আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিবেশিদেরকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

০১. আত্মীয় প্রতিবেশী।
০২. অনাত্মীয় প্রতিবেশী।
০৩. নিকট প্রতিবেশী– যারা একেবারেই ঘরের পার্শ্বে।

০৪. দূর প্রতিবেশী– যারা একই মহল্লার।
০৫. মুসলিম প্রতিবেশী।
০৬. অমুসলিম প্রতিবেশী।

কোন প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী অধিক হকদার

বাড়ি বা বাসার পাশে অবস্থিত প্রতিবেশিদের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ও অধিক হকদার কারা এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلى أَيِّهِمَا أَهْدِيْ قَالَ إِلى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। উপঢৌকন তাদের দু'জনের মধ্যে কাকে দেব? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুস সালাম, হা. নং-২০৯৯, আ.প্র)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশির ব্যাপারে আমাকে বরাবর অসিয়ত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশিকে তিনি উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৫৮০, আ.প্র)

বস্তুত প্রতিবেশির হক এর উপর কত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলে তাকে উত্তরাধিকারী বানানো হতে পারে বলে ধারণা হতে পারে, তা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। উত্তরাধিকারী হয় সাধারণত রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রতিবেশির সাথে সেরূপ কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তার হককে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখার বা আলোচনা করার পশ্চাতে খুব বড় একটি বিষয় রয়েছে– সেটি হলো ঈমান। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৫৮৪, আ.প্র)
উল্লেখিত এ হাদীসে প্রতিবেশির সাথে ভাল আচরণ এবং তার কল্যাণ করার কাজটিকে মৌলিক ঈমানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশির হক

আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসে বর্ণিত প্রতিবেশির হক বা অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কড়া নির্দেশের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা মুসলিম হিসেবে বা ঈমান আছে এমন দাবিদার হিসেবে আমাদের কর্তব্য। আর তাই প্রতিবেশির হক বা অধিকারের কথা মাথায় রেখে প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

০১. প্রতিবেশির সুখ-দুঃখে, বিপদ-আপদে, বিশেষ কোন প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা চাইলে তা করা। এ সাহায্য হতে পারে কখনও কোন কাজ করে দেয়া, অভাবী হলে আর্থিক সাহায্য করা বা সুন্দর পরামর্শ ও ভাল কথার মাধ্যমে সাহায্য করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ اَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلاَ اَشُكُّ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

আদী ইবনে হাতিম (রা) বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। পুনরায় তিনি জাহান্নামের উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। শোবা (রহ) বলেন : তিনি দুইবার এরূপ করেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক টুকরা খোরমা দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর তাও যদি না পাও তবে উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৫৮৯, আ.প্র)

০২. প্রতিবেশী কখনও করজে হাসানা বা বিশেষ প্রয়োজনে কয়েক দিনের জন্য অর্থ ধার চাইলে তা দেয়ার চেষ্টা করা।

০৩. অসুখ হলে সেবা-যত্ন করা, যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেয়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ

وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيْ.

আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।' (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৩৭, আ.প্র)

০৪. দীন দরিদ্র প্রতিবেশিকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশিকে খাবার দেয়া প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। প্রতিবেশী অভুক্ত হতে পারে বা অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করতে পারে এভাবে– কোন কোন প্রতিবেশী একদম হত-দরিদ্র হওয়ার ফলে খাবারের যোগান দিতে পারেনি, বাচ্চারা ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকাটি করছে, ছটফট করছে। আবার শহরে বাসা পরিবর্তন করে নতুন বাসায় এসেছে এক্ষেত্রে রান্নার চুলা সেটআপ করাসহ অন্যান্য ঝামেলায় রান্না করতে না পারায় অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করতে হচ্ছে অথবা কারোর পরিবার-পরিজন শহরে বসবাস করে এ অবস্থায় গৃহকর্তা গ্রামের বাড়িতে গৃহ নির্মাণ বা কোন উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে ১/২ মাস অবস্থান করছেন। এ সময় গৃহকর্ত্রী ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা বা পরীক্ষার কারণে গ্রামের বাড়িতে যেতে না পারায় রান্নার সমস্যা তো স্বাভাবিক। তবে সেখানকার প্রতিবেশিরাও হয়তো অনেক সচেতন। তারা খাবার খাওয়ানো থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনও পূরণ করতে নাখোশ নন। কিন্তু গৃহকর্তা প্রতিবেশির বাসায় লজ্জায় বার-বার খাওয়া বা খুঁজে খেতে অভ্যস্ত নন। ফলে অভুক্ত থেকে রাত্রি যাপন করা, অকস্মাৎ কেউ অসুস্থ হওয়া, দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া বা আপনজনের কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে বাসায় রান্না না হওয়ার ফলে এমনটি হতে পারে। এমন ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিবেশিরা খোঁজ-খবর নিয়ে এগিয়ে আসলে তারা যেমন খুশি হবেন তেমনি খুশি হবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا امَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُه جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ.

যে লোক পেট ভরে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করল এবং সে জানলো যে তার প্রতিবেশী না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি। (বাইহাকী, সূত্র : মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪২৪)

০৫. প্রতিবেশির কষ্ট হবে এমন কোন কাজ না করা। যেমন :

❖ প্রতিবেশির ছোট ছেলে-মেয়ে, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী দ্বারা কোন কিছু নষ্ট বা ক্ষতি সাধন হয়ে যাওয়ার পূর্বে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তারপরও হয়ে গেলে সহ্য করা, ধৈর্যধারণ করা।

❖ প্রতিবেশির ঘরের পাশে বা বাড়ির সামনের দিকে গো-শালা তৈরি না করা।

❖ বাথরুম তৈরি না করা।

❖ মোরগ-মুরগীর খামার তৈরি না করা বা করলেও বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ও রোগ-জীবাণু যেন ছড়াতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

❖ প্রতিবেশির বাড়ির উঠানে ছায়া পড়ে বিভিন্ন শস্য রৌদ্রের অভাবে শুকাতে সমস্যা হবে এমন বড় গাছ বা বাঁশ ঝাড় বাড়িতে না লাগানো।

❖ বাড়ির ভিতরে চলাচলের পথ বন্ধ করে না দেয়া।

❖ প্রতিবেশির বাসায় মেহমান আসলে তাদের শুনিয়ে পাশের ঘরে গালাগালি বকাবকি ও মারামারি না করা। পুত্র-কন্যার বিয়ের ব্যাপারে নতুন মেহমান বাড়িতে আসলে পাশের ঘর থেকে সজোরে তাদের সত্য-অসত্য দোষ-ত্রুটি আলোচনা না করা।

❖ দিন-রাত্র মাইক দিয়ে শব্দ করে কোন আনন্দ-অনুষ্ঠান উপভোগ বা কুরআন খতমের অনুষ্ঠান না করা। এতে প্রতিবেশির কেউ অসুস্থ থাকলে তার আরো বেশি কষ্ট হতে পারে। শিশুদের ঘুমের ক্ষতি হতে পারে, প্রতিবেশী কোন শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হতে পারে।

❖ সজোরে টেপ রেকর্ডারে বা কম্পিউটারে ওয়াজ বা গানের সিডি না বাজানো, গভীর রাত্র পর্যন্ত টেলিভিশনে প্রোগ্রাম অবলোকন না করা বা এমনভাবে টেলিভিশনে ছবি বা নাটক না শোনা– যা পাশের বাসার বা প্রতিবেশির সন্তানদের পড়ালেখার মনযোগকে বাধাগ্রস্ত করে।

❖ সর্বোপরি আমার বাড়িতে বা জমিতে আমি পুকুর কাটব তাতে প্রতিবেশির কী– এমন বলে প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়ার চেষ্টা করা। এখানে কেউ যদি কারোর বাড়ি বা জমিতে পুকুর কাটতে চায় তাহলে নিয়মানুযায়ী করা হলে কোন সমস্যা নেই। এবার এ নিয়ম কী হবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

حَرِيْمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا.

কূপের চতুঃসীমা হবে কূপ থেকে পানি তোলার রশির দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ। (সুনান ইবন মাজাহ, বন্ধক, হা. নং-২৪৮৭, আ.প্র.)

حفَرَ بِئْرًا فَلَهُ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ.

যে ব্যক্তি কূপ খনন করেছে সে তার গবাদি পশুর পানি পান করানোর সুবিধার্থে কূপের চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গা পাবে। (সুনান ইবন মাজাহ, বন্ধক, হা. নং-২৪৮৬, আ.প্র.)

প্রতিবেশির সাথে মিলেমিশে থাকা তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ্ সকল প্রকারের ও সকল পর্যায়ের প্রতিবেশির সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের প্রিয়নাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেন :

وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে লোক মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে লোক মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন : যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৫৮২, আ.প্র.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَلاَيُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوِ لْيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ ও কিয়ামাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামাতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নয়তো চুপ করে থাকে। (আবু দাউদ, নিদ্রা সম্পর্কীয়, হা. নং-৫০৬৪, ই.ফা.)

مَنْ ضَارًا اَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেবে আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দেবেন। (সুনান ইবন মাজাহ, বিচার ও বিধান, হা. নং-২৩৪২, আ.প্র.)

০৬. প্রতিবেশির প্রতি সহানুভূতি তথা বিশেষ প্রয়োজনে তাদের বাড়ি-ঘর ফাঁকা থাকলে সেদিকে খেয়াল রাখা, গৃহকর্তা কর্মস্থল তথা শহর বা বিদেশে থাকলে তাদের সন্তান-সন্ততির দিকে খেয়াল রাখা, বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যতটা সম্ভব কিনে দেয়ার চেষ্টা করা, তাদের হাঁস-মুরগী, গাছপালা, ফুল-ফল থাকলে তা হিফাযত করার চেষ্টা করা।

০৭. প্রতিবেশির খুশীর সংবাদ জানতে পেলে, যেমন ছেলে-মেয়েরা ভাল ফলাফল অর্জন করেছে বা জীবনের যে কোন স্তরে সফলতা অর্জন করেছে, এতে প্রথমে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে তাকে ধন্যবাদ জানানো, আদর

করা, ভবিষ্যতে যাতে আরো এমন সুফল বয়ে আনতে পারে সেজন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করা ও তাকে উৎসাহ দেয়া উচিত।

০৮. প্রতিবেশির কোন দুঃখের খবর শুনলে সমবেদনা প্রকাশ করে তাকে আল্লাহর নামে সান্ত্বনা দেয়া, আল্লাহ মাফ করে দেবেন বলে শক্তি, সাহসের যোগান দেয়া, ধৈর্যধারণ করার কথা বলা এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ রহমত প্রত্যাশা করে দু'আ করা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

لاَتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

তোমার কোন ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। অন্যথায় আল্লাহ তাকে দয়া করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে নিক্ষিপ্ত করবেন। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, হা.নং-২৪৪৪, বিআইসি)

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلى قَالَ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও সাদকার চাইতে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব? সাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। কারণ পরস্পর সুসম্পর্ক না হওয়ার অর্থ হল দীন ধ্বংস হওয়া। (আত-তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, হা. নং-২৪৪৯, বিআইসি)

০৯. প্রতিবেশির ঘরের কাছে বা পেছনে জানালার পাশে আড়ি পেতে তাদের কোন গোপন কথা বা পরামর্শ শুনার চেষ্টা না করা।

১০. প্রতিবেশিদের মাঝে রান্না করা সামগ্রী বিতরণ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِذَا عمِلْتَ مَرَقَةً فَاكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْتَرِفْ لِجِبْرَانِكَ مِنْهَا.

তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে ঝোল বেশি দিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তা পৌঁছিও। (সুনান ইবন মাজাহ, আহার ও তার শিষ্টাচার, হা. নং-৩৩৬২, আ.প্র)

১১. আপনার বাড়ির বা গাছের ফুল-ফলেও প্রতিবেশীর হক রয়েছে। কাজেই তাদেরকে তা দেয়া উত্তম, ঠিক এভাবে পথিকদের গমনযোগ্য পথের পাশে ফুল ও ফলের গাছ থাকলে তাতেও পথিকের হক রয়েছে।

১২. প্রতিবেশির সাথে সমঝোতা ব্যতীত উঁচু দেয়াল বা ইমারত বানিয়ে তার বাড়িতে আলো-বাতাস প্রবেশ বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা না করা, অবশ্য শহর এলাকার কথা ভিন্ন। এখানে জায়গার দাম বেশি আর ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়।

১৩. প্রতিবেশির অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ির আশে-পাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলে দুর্গন্ধের মাধ্যমে তাকে কষ্ট না দেয়া।

১৪. প্রতিবেশির গমন পথে বাচ্চাদের পায়খানা, প্রস্রাব, ঘর বাড়ি তৈরির উপকরণ রেখে রাস্তা বন্ধ করে না দেয়া, ঘরের উপর আরেক প্রতিবেশীর গাছ বা গাছের ডাল-পালা কাটার ফলে পড়ে গিয়ে যেন ঘর ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

১৫. প্রতিবেশির বাড়ির পাশ দিয়ে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি নির্গত করার নামে হাঁটু সমান গভীর ড্রেন না কাটা। কারণ এতে বৃষ্টির সময় মাটি ভেঙ্গে ড্রেনে পড়ে প্রতিবেশির ঘর ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৬. প্রতিবেশির কেউ মৃত্যুবরণ করলে সকলে এগিয়ে এসে কাফন-দাফন ও আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রতিবেশী মুসলিম বা অন্যান্য মতাবলম্বীসহ যে কোন বর্ণের এবং যে কোন আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন সর্বাবস্থায় প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি ইসলাম প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সকল মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা।

প্রতিবেশির বাড়ি-জমি ক্রয়ে প্রতিবেশির হক

প্রতিবেশী যদি তার জমি-বাড়ি বা যে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা ক্রয় করার ব্যাপারে তার নিকটতম প্রতিবেশিই বেশি হকদার। এক্ষেত্রে প্রতিবেশির মধ্যে যদি কেউ ক্রয় করার মত সামর্থ্যবান না থাকে তাহলে তাদের সাথে পরামর্শ করে মতামতের ঐক্যের ভিত্তিতে দূর প্রতিবেশী বা আরো দূরের লোকের কাছে তা বিক্রি করে দেয়া যাবে। অন্যথায় সে জমি কোন দূরবর্তী লোক ক্রয় করলে উভয়পক্ষেরই কষ্টের কারণ হতে পারে। কাজেই এ অবস্থা থেকে উভয়পক্ষকেই রক্ষা করতে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ.

সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বাড়ির প্রতিবেশী উক্ত বাড়ির (ক্রয়ের ব্যাপারে) অগ্রাধিকার পাবে। (আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল আহকাম, হা. নং-১৩০৭, বিআইসি)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّيْ فِيْ دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ مَا ابْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ لاَأَزِيْدُكَ عَلى أَرْبَعَةِ الافٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةٍ قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ وَلَوْلاَ أَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا أربعَ الافٍ وَأَنَا أُعْطِيْ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

'আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট দাঁড়ানো ছিলাম। তখন মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) সেখানে এসে তাঁর হাত আমার কাঁধের উপর রাখেন। এমন সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে (রা) এসে বলেন, হে সাদ! আপনার বাড়িতে (মহল্লায়) আমার যে দু'টো ঘর রয়েছে তা আমার কাছ থেকে খরিদ করুন। সাদ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো ওটা খরিদ করব না। তখন মিসওয়ার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে ঐ (ঘর) দুটো অবশ্যই খরিদ করতে হবে। সাদ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামের বেশি দেব না, তাও কিস্তিতে কিস্তিতে। আবু রাফে (রা) বলেন, আমাকে তো ওটার জন্য ৫ শত (পাঁচশত) দীনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, 'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তিতে সর্বাধিক হকদার' তবে আমি আপনাকে চার হাজার দিরহাম (চারশ দীনার) মূল্যে ওটা দিতাম না, যখন আমাকে পাঁচশ দীনার দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি তাকেই (সাদকে) ওটা (ঘর দু'টো) দিয়ে দিলেন।' (বুখারী, কিতাবুস সালাম, হা. নং-২০৯৮, আ.প্র)

উল্লেখিত হাদীস অনুসারে এমন ক্রয়-বিক্রয়কে হক্কে শুফআ' বলা হয়ে থাকে। এ হক্কে শুফআ' বলতে তিন শ্রেণীর প্রতিবেশির ক্রয়ের অধিকারকে বুঝায়। যেমন :

❖ শরীক ফিদ-দার বা অংশীদার মালিক। বাড়ি বা জমি বিক্রয়ের সময় এ অংশীদারকে জানাতে হবে।

❖ শরীক ফিল-জার– প্রতিবেশির হক অর্থাৎ বাড়ি বা জমি বিক্রয়ের সময় শরীক না থাকলে প্রতিবেশিকে জানাতে হবে।

❖ শরীক ফিত-তরীক– একই রাস্তায় চলাচলকারী বা একই আইলে যাতায়াতকারী ব্যক্তির হক। বাড়ি বা জমি বিক্রির পূর্বেই এদের জানিয়ে দিতে হবে। নতুবা তারা বিচারকের শরণাপন্ন হলে সে বিক্রিত সম্পদ তাদের হাতে আসবে। অবশ্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

মাসজিদের হক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকেই মাসজিদ মুসলিমদের দৈনিক সম্মেলন বা মিলন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কেননা প্রতিদিন পাঁচবার এলাকার সকল মুসলিম জনগোষ্ঠী আল্লাহর এ ঘরে এসে মিলিত হন। এভাবে জুমাবার এলাকাভিত্তিক বড় মাসজিদগুলোতে সাপ্তাহিক সম্মেলন এবং সবশেষে প্রতি বছর একবার সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের উপস্থিতিতে মক্কার মাসজিদে হারামকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে মহাসম্মেলন– যা ইসলামের অন্যতম রুকন হজ্জ হিসেবে খ্যাত।

মাসজিদ নির্মাণ করা

মাসজিদ নির্মাণ করে দেয়া দুনিয়ার সকল উত্তম কাজের মধ্যে একটি। যারা বৈধ আয়ে নিজস্ব অর্থায়নে নিজস্ব জমিতে মাসজিদ নির্মাণ করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, হা. নং-৭৩৫, আ.প্র)

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا مِنْ مَّالِهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহর জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, হা. নং-৭৩৭, আ.প্র)

اَمَرَ بِالْمَسْجِدِ اَنْ تُبْنَى فِي الدُّوْرِ وَاَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ.

মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে খোশবু ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, হা. নং-৭৫৮, আ.প্র)

মাসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে ব্যস্ত না হওয়া

মাসজিদকে অত্যধিক কারুকাজ খচিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় না করাই উত্তম। ইহুদী-নাসারাগণ গীর্জাকে যেমন কারুকাজ খচিত করে, সে রকম করে মুসলিমদের মাসজিদ নির্মাণ করতে আল্লাহর রাসূল নিরুৎসাহিত

করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُوْنَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِيْ كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُوْدُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارٰى بِيْعَهَا.

আমার মনে হয়, তোমরা আমার পরে তোমাদের মাসজিদসমূহকে ইহুদীদের সিনাগগ ও নাসারাদের গীর্জার ন্যায় কারুকার্য খচিতরূপে তৈরি করবে। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, হা. নং-৭৪০, আ.প্র)

مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ اِلاَّ زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ.

কোন জাতির মাসজিদসমূহকে স্বর্ণ খচিত করা কত মন্দ কাজ। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, হা. নং-৭৪১, আ.প্র)

মাসজিদ আবাদ করা

মাসজিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর। এ ঘরে প্রবেশ এবং 'ইবাদাত করার অধিকার শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাসীগণেরই আছে। একথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ.

"মাসজিদ আবাদ করা তথা তাতে 'ইবাদাত করার কোন অধিকার মুশরিকদের নেই।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ১৭)

এ ঘরে প্রবেশের অধিকার কিয়ামাত পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে মুসলিমদের জন্য। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বলেন :

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللهَ قف فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

"আল্লাহর মাসজিদগুলোর আবাদকারী তো ঐসব লোকই হতে পারে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্বন্ধেই আশা করা যায়, তারা সঠিক পথে চলবে।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ১৮)

কিন্তু আজ অপ্রিয় হলেও সত্য, মুসলিমরা একমাত্র জুমু'আ বার জুমু'আ নামায

ছাড়া অন্য সময় খুব কমই মাসজিদে গমন করে। অথচ এলাকায় যে মাসজিদ আছে সেই মাসজিদের দাবিই হলো প্রতিদিন মাসজিদ থেকে মুয়াযযিন যখন সুউচ্চ কণ্ঠে এলাকাবাসীকে মাসজিদে আসার জন্য ডাকে তখন সব কাজ ফেলে মাসজিদে এসে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই তাদের সকল দাবি-দাওয়া পেশ করবে, আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাইবে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মাসজিদে আদায় করা ছাড়াও আল্লাহর দীনের পথে মানুষকে আহ্বান এবং সকলের কল্যাণে কাজ করার ঘোষণা, কিভাবে করা যায় তা আলোচনা, পর্যালোচনা এবং শারী'আতসম্মত রীতি-নীতি ও আইন-কানুন জেনে নেয়ার স্থান এ মাসজিদ– যা আজ মুসলিমদের গাফলতে সবার পরে যাওয়া সবার আগে বেরিয়ে পড়া আর শুধু একটু সিজদা কোন রকমে দেয়ার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّهُمَّ ارْحَمْهُ لاَيَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى صَلوَاةٍ مَّا كَانَتِ الصَلوةُ تُحْبِسُهُ لاَيَمْنَعُهُ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلى اَهْلِه اِلاَّ الصَّلوةُ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি অযু সহকারে নামাযের অপেক্ষায় মুসাল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতরা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকেন : 'হে আল্লাহ! তুমি ওকে মাফ করে দাও, তার ওপর রহম কর।' আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির নামাযই তাকে বাড়িতে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাযে রত আছে বলে গণ্য হবে। (সহীহ আল-বুখারী, আযান, হা. নং-৬১৯, আ.প্র)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ، اَلاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَّشَاءَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَال فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّى لاَتَعْلَمُ شَمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (এই সাত প্রকার লোক হচ্ছে)–

০১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।

০২. যে যুবক তার প্রভুর (আল্লাহর) 'ইবাদাত করতে করতে বড় হয়েছে।

০৩. যে ব্যক্তির মন মাসজিদের সাথে বাঁধা।

০৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে– তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়।

০৫. যে ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্না রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি"।

০৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কী খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং

০৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে। (সহীহ আল-বুখারী, আযান, হা. নং-৬২০, আ.প্র)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় যতবার মাসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তত বারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরি করে রাখেন। (সহীহ আল-বুখারী, আযান, হা. নং-৬, আ.প্র)

মাসজিদকে শারী'আতসম্মত সকল সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা

মাসজিদে যিনি নেতৃত্ব দেন তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও জ্ঞানী 'আলিম। আর তাই মাসজিদের মুসল্লীরা যখন কোন সমস্যায় পড়বে তখন ইমাম সাহেবের কাছে শারী'আতসম্মত সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করা এবং পাওয়া তাদের হক বা অধিকার।

আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের ভিত্তিতে মানব জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত মানুষ যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয় তার ফায়সালা মাসজিদের মিম্বারে বসে যখন মুসল্লীদের উপস্থিতিতে প্রয়োজনে তাদের মতামতসহ নিয়ে প্রদান করা হবে তখন তাতে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে এবং মানবতার কল্যাণে আসবে। এবার মাসজিদে যে সমস্ত কাজ করা মাকরূহ সে প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوْا عَلَى اَبْوَابِهَا الْمُطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِى الْجُمَعِ.

তোমরা তোমাদের মাসজিদসমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ,

হৈ-চৈ, দ্বন্দ্ব কার্যকরকরণ ও উন্মুক্ত অস্ত্র বহন থেকে হিফাযত করো। তোমরা তার দরজাসমূহের কাছে শৌচকর্মের জন্য ঢিলা রাখো এবং জুমু'আর দিন তাকে সুগন্ধময় করো। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, হা. নং-৭৫০, আ.প্র)

মাসজিদে মুসল্লীদের ডিঙ্গিয়ে ও সামনে দিয়ে হাঁটাচলা না করা

জুমাবার মাসজিদে খতীব সাহেবগণ যে আলোচনা পেশ করেন তা শুনা এবং খতীব সাহেবকে দেখার লক্ষ্যে অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে মাসজিদে আগমন করেন। সেই সাথে জুমু'আর নামাযে প্রত্যেক এলাকার মাসজিদই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে যারা মাসজিদে আগে আসেন তাদের জন্য উত্তম হলো সামনের কাতারগুলো পূরণ করে সুশৃঙ্খলভাবে বসা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা ঠিকমত না হওয়ায় দেখা যায়, পরে এসেও অনেক মুসল্লী অন্য মুসল্লীকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে চায়। এতে যাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের মন খারাপ ও আলোচনা শুনায় মনোযোগে যেমন বিঘ্ন হয় তেমনি একাগ্রতাও ভঙ্গ হয়– যা মাসজিদের আদাবের বরখেলাফ বলেই গণ্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে মাসজিদ আল্লাহর ঘর। এখানে ধনী-গরীব, সাদা-কালো, রাজা-প্রজা, রিকসাওয়ালা সকলেই সমান হকদার এবং সকলেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার অধিকারী। আর তাই যে যখন আসবে সে তখন যেখানে বসার জায়গা পাবে সেখানেই বসে পড়া উত্তম। পরে এসে কাউকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার নীতি অবশ্যই মাসজিদের আদাবের বরখেলাফ। তাই শিক্ষিতজন মাত্রই এমনটি না করা উত্তম। কিন্তু তবু যারা ডিঙ্গিয়ে যায় তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ.

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি বস, তুমি (অন্যকে) কষ্ট দিয়েছ এবং অনর্থক কাজ করেছ। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাব ইকামাতিস সালাত, হা. নং-১১১৫, আ.প্র)

مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا اِلَى جَهَنَّمَ.

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছে, (কিয়ামাতের দিন) তাকে জাহান্নামের পুল বানানো হবে। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাব ইকামাতিস সালাত, হা. নং-১১১৬, আ.প্র)

আবার কখনো দেখা যায়, মুসল্লীরা নামায পড়ছে তাদের সামনে দিয়ে অন্যরা অবাধে হাঁটাচলা করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَاَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত তার কত বড় গুনাহ হয়, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা নিজের জন্যে উত্তম মনে করত। আবু নাদর বলেন, তিনি (আবু জুহাইম) কি চল্লিশ দিনের না চল্লিশ মাসের না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

لاَنْ يَّقِفَ اَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ.

তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে একশত বছর অপেক্ষা করা অধিক কল্যাণকর। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, হা.নং-৩১৪, বিআইসি)

কাজেই এক্ষেত্রে যিনি পেছনে নামায আদায় করবেন তারও সচেতন হওয়া উচিত। কেননা সামনে যিনি নামায আদায় করছেন তার কোন জরুরি প্রয়োজনও থাকতে পারে। তাই সেদিকে খেয়াল রেখে কেউ যখন বেশি নামায আদায় করতে চান তিনি একটু সরে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় বা একদম সামনে গিয়ে বা মাসজিদের ভিতরে পিলার থাকলে এটাকে সামনে রেখে দাঁড়াবেন যাতে তার দ্বারা অন্যকে পাপগ্রস্ত হতে না হয়। অন্যদিকে সামনে যিনি থাকবেন তিনিও একটু সময় সম্ভব হলে অপেক্ষা করে পেছনের মুসল্লী সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন– এটাও উত্তম। উল্লেখ্য যে, নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার অর্থ তার সাজদার স্থানের ভেতর দিয়ে যাওয়া।

মাসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

মাসজিদে প্রবেশে জুতা একটার পিঠে আরেকটা লাগিয়ে বাম হাতে করে মাসজিদে নির্ধারিত বক্সে রাখাসহ এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সামগ্রিকভাবে

খেয়াল রাখা মাসজিদে আগত সকল মুসল্লীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ঝড়-বৃষ্টির দিনে মাসজিদের দরজা-জানালা বন্ধ রাখা, নামায শেষে বিদ্যুতের যেন অপচয় না হয় তাই ফ্যান ও লাইটের সুইচ অফ করে বের হওয়া মুসল্লীদের কর্তব্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন :

اَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ.

মহল্লায় মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ছড়াতে । (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল আযান, হা. নং-৭৫৯, আ.প্র)

মাসজিদের ভেতরে এসে মুসল্লীগণ বাইরে থু-থু ফেলতে চাইলে এর আদব শেখাতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَاِذَا بَزَقَ لاَيَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَعَنْ يَمِيْنِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ.

আনাস (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : 'তোমরা নামাযের সিজদায় এ'তেদাল বা ভারসাম্য সৃষ্টি কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত তার দুই বাহু ছড়িয়ে না দেয়। আর যখন থু-থু নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হবে তখন সে সামনে বা ডানে থু-থু নিক্ষেপ করবে না। কেননা নামায অবস্থায় সে তার প্রতিপালকের সাথে আলাপরত থাকে।' (সহীহ আল-বুখারী, কিতাব মাওয়াকীতুস সালাত, হা. নং-৫০১, আ.প্র)

ইমাম সাহেবের হক

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। মুসলিম জগতে এ এক পরিচিত শব্দ। কারণ ইমাম হলেন বিশ্ব অঙ্গনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর নামে পরিচিত ভূ-পৃষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান মাসজিদের প্রধান নেতৃত্বদানকারী; আদর্শ চরিত্রের অনুসারী; আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালনাকারী; জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।

তবে ইসলামে ইমাম বা নেতা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ইমাম শুধু মাসজিদে নামায পড়াবেন এমনটি নয়; ইমাম সাহেব মানবতার কল্যাণে আল্লাহ তা'আলার বিধান আল-কুরআনুল কারীম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত তথা কথা, কাজ ও জীবন ধারণের সকল দিকসমূহ যথাযথভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরে মানুষকে আদর্শ পথে চলতে উৎসাহিত

করবেন, প্রয়োজনে হাত ধরে মানুষকে সে পথে চলতে সহায়তা করবেন। কেননা আল্লাহ্ বলেন :

بَلْ هُوَ آيتٌ بَيِّنتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

"জ্ঞানের অধিকারী লোকদের অন্তরে তো এগুলো উজ্জ্বল নিদর্শন।" (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৪৯)

আর তাইতো আল্লাহ সমাজ থেকে সকল কলুষতা দূর ও আল্লাহমুখিতার পথে মানুষকে আহ্বান করার জন্যে ঐ সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষকে তাঁর ঘরের প্রধান নিযুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহনাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِنَّ اللهَ اصْطَفـــهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَه بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِيْ مُلْكَه مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"(নাবী জবাব দিলেন,) 'আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের বদলে তাকেই মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে যথেষ্ট যোগ্যতা দান করেছেন।' আর এটা আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ বড়ই প্রশস্ততার অধিকারী এবং সবকিছু তাঁর জানা আছে।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৪৭)

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُه.

"আল্লাহ তাঁর ঘরসমূহের আদব ও সম্মান বৃদ্ধি এবং তাঁর নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৬)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسجدَ اللهِ ... اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسجدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَاَقَامَ الصَّلوةَ وَاتَى الزَّكوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللهَ فَعَسى اُولئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

"মাসজিদ আবাদ করা তথা তাতে 'ইবাদাত করার কোন অধিকার মুশরিকদের নেই।... তারাই মাসজিদে 'ইবাদাত করার অধিকার রাখে যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হবে।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ১৭-১৮)

কাজেই আল্লাহর এ ঘরে দাঁড়িয়ে বা মিম্বারে উঠে বসা বা দাঁড়ানোর সুবাদে মুহতারাম ইমাম সাহেবগণ যখন আদর্শের কথা বলেন তখন মুসল্লীসহ সকল মহলের উচিত সে কথা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদহীন একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

ইমাম সাহেব যখন খুতবা দেন তখন তা নীরবে শোনা মাসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদের কাছে ইমাম সাহেবের হক। ইমামের খুতবা শুনা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সাথীকে বললে, 'চুপ কর' তখন তুমি অনর্থক কাজ করলে। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাব ইকামাতিস সালাত, হা. নং-১১১০, আ.প্র)

শ্রদ্ধাভাজন ইমামগণ আল-কুরআন ও আল-হাদীস ভিত্তিক পথনির্দেশ দেবেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুহতারাম ইমাম সাহেবদের পথনির্দেশ মেনে চলার প্রতি লোকজনদেরকে তাকিদ প্রদান করেছেন :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيَةِ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ.

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'গুনাহ বা অন্যায় কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ এবং পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি গুনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দান করা হয় তাহলে সেই অবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্য নেই। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হা. নং-২৭৩৭, আ.প্র)

মুয়াযযিনের হক

আল্লাহর ঘর মাসজিদ থেকে প্রতিদিন পাঁচবার যিনি আল্লাহ মহান, আল্লাহ বড় বলে স্বীকৃতি দিয়ে মানুষকে কল্যাণ ও আদর্শের পথে আসার আহ্বান জানান; সালাত আদায় করতে মাসজিদে আসতে বলেন তিনিই মুয়াযযিন। মুয়াযযিন সাহেবও ইমাম সাহেবের মতই সমাজের আদর্শবান দীনী ইলম সমৃদ্ধ দায়িত্বশীল একজন। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيُؤَمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যকার উত্তম ক্বারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ইমামতি করবে। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল আযান, হা. নং-৭২৬, আ.প্র)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ

النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন মুয়াযযিনগণ লোকদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল আযান, হা. নং-৭২৫, আ.প্র)

প্রকৃতপক্ষে মুয়াযযিন এলাকাবাসীর সালাত ও সিয়াম পালনকারীর ইফতার যথাসময়ে আদায় করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তাই ইমামকে মুসলিমদের যিম্মাদার আর মুয়াযযিনকে আমানতদার হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করে বলেন :

اَلإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

ইমাম হলো (নামাযের) যামিন এবং মুয়াযযিন হল আমনতদার। হে আল্লাহ! ইমামকে সৎপথ দেখাও এবং মুয়াযযিনকে ক্ষমা কর। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, হা. নং-১৯৮, বিআইসি)

ইসলামে মুয়াযযিনের অবস্থানই নির্দেশনা দেয় এলাকাবাসীর কাছে মুয়াযযিনের হক কতটুকু! তাছাড়া মুয়াযযিনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া আর সম্মান প্রদর্শন যেন আমাদের প্রয়োজনেই করা উচিত।

বন্ধুর কাছে বন্ধুর হক

মানুষ সামাজিক জীব। কেউ একা বাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষকে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হয়, বন্ধু নির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে। কারণ বন্ধু জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভাগিদার হয়। বন্ধুই পারে আত্মার মধ্যমণি হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুঃখকে ভুলিয়ে রেখে একটু স্বস্তি দিতে, একটু সান্ত্বনা দিতে। আর তাইতো বন্ধু হতে হবে সে রকম ঠিক যেমনটি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বন্ধু হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ. وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকারের বন্ধু হবেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই

সফলকাম হবে।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৫৫-৫৬)

উল্লেখিত আয়াতে মানব জাতির প্রকৃত বন্ধুদের তালিকায় তিন প্রকারের বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়া হয়েছে। যথা :

০১. মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

যার কাছে সবকিছু বলা যায়, যিনি সবকিছু দেখেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, সব সময় আমাদের পাশে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। দুনিয়া ও আখিরাতের বুকে এত আপনজন আর কাউকে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর বুকে আল্লাহই হচ্ছেন মানুষের উত্তম বন্ধু, যিনি মানুষের কল্যাণে সবকিছু সাজিয়েছেন, সবকিছু আল-কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। অধিকন্তু মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে হয়তো জান্নাতও উপহার দেবেন। আর তাইতো স্বয়ং আল্লাহই যখন মানুষের বন্ধু হওয়ার ঘোষণা দিলেন তখন সত্যিই এ বন্ধুর কথা মনে রেখে জীবন পরিচালনা করা উত্তম।

০২. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যিনি জীবনের ৬৩ বছরের একটি মুহূর্তও নিজের জন্য ব্যয় করেননি, যা করেছেন তা মানবতার কল্যাণের জন্যই করেছেন। আর এজন্যে তিনি হচ্ছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পর মানুষের পরম বন্ধু। একমাত্র তিনিই মানবতাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান আর অকল্যাণ থেকে মুক্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আর তিনি হবেন আগামী দিনেও অর্থাৎ আখিরাতের ময়দানেও মানবতার একমাত্র মুক্তির দূত।

০৩. ঈমানদার মুমিন বা আদর্শ মানুষ

যারা আল্লাহ ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অনুযায়ী চরিত্র গঠন করেন, জীবন পরিচালনা করেন; একমাত্র তাঁরাই হতে পারেন দুনিয়ার অঙ্গনে বর্তমান সময়ে সকলের আদর্শ বন্ধু। উত্তম বন্ধু, প্রিয় বন্ধু। তাই এমন বন্ধুর কাছে রয়েছে বন্ধুর অনেক হক বা অধিকার। আসুন সে সম্পর্কে জেনে নিই।

- ❖ বন্ধু বন্ধুর বিপদ-আপদে এগিয়ে আসবে জীবনের প্রথম পর্যায়ে পড়ালেখায় একে অপরের পরিপূরক হবে।
- ❖ যে কোন বিষয়কে ভাল দৃষ্টিতে দেখবে, পজিটিভ ধারণা করবে।
- ❖ আদর্শ জীবন গঠনে আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসে পাকের গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী একে অপরের জীবনে বাস্তবায়ন ঘটানোর চেষ্টা করবে।
- ❖ শয়তান বা নাফসে আম্মারার প্ররোচনায় একজন বন্ধু কোন কাজে ভুল করতে

দেখলে তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভবপর সবকিছু করবে।

❖ পাড়ায়-মহল্লায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকা অবস্থায় এক সাথে মাসজিদে গমনসহ ভাল-ভাল কাজগুলো এক সাথে করার চেষ্টা করবে।

❖ আদর্শ শিক্ষা অর্জন ও সচ্চরিত্র গঠনের টার্গেট নিয়ে আদর্শ লেখকের বই অধ্যয়ন ও সে অনুযায়ী জীবন গঠনে একে অপরকে উজ্জীবিত করবে।

❖ প্রিয় জন্মভূমি ও মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনের চেষ্টা করবে।

❖ দলবদ্ধভাবে ভাল কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর খারাপ বা মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত করে মন্দ কাজ থেকে মানবতাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করবে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ভেবে-চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। কারণ–

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلى دِيْنِ خَلِيْلِه فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ, হা. নং-২৩১৯, বিআইসি)

প্রতিবন্ধীদের হক

প্রতিবন্ধী! শব্দটা শুনলেই অদৃশ্য একটা আবেদন যেন নিজের অজান্তেই হৃদয়ের মাঝে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। দৃষ্টির আলো নেই– অন্ধ, পা নেই– ন্যাংড়া বা লুলা, হাত নেই-খঞ্জ, নিষ্কর্মা, মুখ থাকতেও কথা বলার শক্তি সামর্থ্য নেই– বোবা, কান থাকতেও শ্রবণ ক্ষমতা নেই– বধির, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল- এরাই প্রতিবন্ধী।

এরা জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করতে অক্ষম, দারিদ্র্যের কষাঘাতে এদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, এরা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা সবার করুণার ভিখারী।

মূলতঃ প্রতিবন্ধী হতে কেউ চায় না। নিজে তো নয়ই, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন কেউ হোক তাও কেউ কামনা করে না। তারপরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি মানুষের মাঝে কত প্রতিবন্ধী! কত বিচিত্র রকমের

প্রতিবন্ধী। এ সবই মহান কুশলী স্রষ্টার সৃজন কারিশমা। সে রহস্য কেবল তিনিই জানেন, কোন প্রতিবন্ধিতায় কাকে, কেন আবদ্ধ রেখেছেন?

তবে একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এরাও এই সমাজেরই মানুষ। এরা বোঝা নয়, জঞ্জাল নয়। এরা অপরাপর সমাজের সকল মানবগোষ্ঠীর কাছে হকদার।

এমতাবস্থায় তাদের প্রতি অবজ্ঞা, তাদেরকে বোঝা মনে না করে প্রথমত প্রত্যেক পিতা মাতারই উচিত সন্তানদের সুন্দর জীবন যাপনের সমূহ ব্যবস্থা করা, সন্তান প্রতিবন্ধী বলে তাদের প্রতি অসম আচরণ না করা, সমাজের লোকদের উচিত অন্য আট-দশজন মানুষের মতই তাদের গুরুত্ব দেয়া, তাদের মেধা, চিন্তা-চেতনা বিকাশের সুযোগ দেয়া, দেশের সরকারের উচিত তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ অভিজ্ঞ ও কর্মঠ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে স্বনির্ভরশীল হওয়ার উপযোগী করে তোলা।

প্রতিবন্ধী প্রসঙ্গে ইসলামের বক্তব্য

ইসলাম বলে প্রতিবন্ধীর সেবা হচ্ছে পুণ্যের আধার। অন্ধকে একটু হাত ধরে রাস্তার এপার থেকে ওপারে পৌঁছিয়ে দিয়ে বা পথের সন্ধান দিয়ে, খঞ্জকে লাঠি দিয়ে, কাউকে দু'একটি টাকা দিয়ে, কাউকে সামান্য শ্রম দিয়ে বিভিন্নভাবে একটু সেবা দিয়ে আমরা অনায়াসেই অর্জন করতে পারি অনেক সাওয়াব; অর্জন করতে পারি আল্লাহর রেজামন্দি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিশ্বের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবন্ধীর সেবা ও সাহায্য দানের প্রতি তাকিদ ও গুরুত্বারোপ সত্ত্বেও আমরা তা বাস্তবে করছি না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সম্মান হারানোর ভয়ে এদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছি না, সেবার হাত বাড়াচ্ছি না। মানবতার আবেদন এটা নয়। মানবতার দাবি হচ্ছে মানুষ-মানুষের জন্য। এ দাবি কেবল প্রতিবন্ধী দিবসে আমাদের মুখের শোভাবর্ধন করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর রূপায়ণ দেখা যায় না। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সেবার অর্থে সেবাকারীর সংখ্যা-সংস্থা কমই। আন্তরিকদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য– যা দুঃখজনক।

সুতরাং মনে রাখতে হবে প্রতিবন্ধীরাও মানুষ। তারা আমাদেরই পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য। এ রাষ্ট্রে রয়েছে তাদেরও হক। আর সে হকের প্রতি আমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত।

প্রতিপক্ষ বা শত্রুদের হক

ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থার নাম যা সকলের প্রতি ইহসান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে প্রতিপক্ষ বা শত্রুদেরও শত্রু অবস্থায় বিপরীত পক্ষের কাছে হক রয়েছে। অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শত্রুদের সম্পর্কে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ০৮)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদেকে নির্দেশ দিয়েছেন কেউ যদি শত্রুও হয় তবু তাদের প্রতি সুবিচার করতে হবে, তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা যাবে না, যদি কেউ করে তাহলে তা হবে তাকওয়ার তথা আল্লাহভীতির পরিপন্থী। তারপর আল্লাহ বলেন, তোমরা যা কর আমি তা সবই খবর রাখছি। অর্থাৎ এ নির্দেশের পরও যদি কেউ শত্রুদের সাথে শত্রুভাবাপন্ন বা শত্রুতার ন্যায় শত্রুর মত বা প্রতিশোধমূলক আচরণ করে; সুবিচার না করে তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের পাকড়াও করবেন।

অন্যদিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও শত্রুদের সাথে কেমন আচরণ করা যাবে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেন :

قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا.

যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, লাশ (নাক-কান কেটে) বিকৃত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না। (সুনান ইবন মাজাহ, জিহাদ, হা. নং-২৮৫৭, আ.প্র)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى امْرَاَةً مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা

করতে নিষেধ করেন। (ইবন মাজাহ, জিহাদ, হা. নং-২৮৪১, আ.প্র)

لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَّلاَ عَسِيْفًا.

তোমরা কখনো শিশু ও শ্রমিককে হত্যা করো না। (সুনান ইবন মাজাহ, জিহাদ, হা. নং-২৮৪২, আ.প্র)

اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বয়স্ক মুশরিকদের হত্যা কর তবে তাদের বাচ্চাদের হত্যা করবে না। (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হা. নং-২৬৬১, ই.ফা)

চুক্তিবদ্ধদের হক

ইসলাম যারা একে অপরের সাথে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সজ্ঞানে চুক্তিবদ্ধ হয় তাদের উভয়পক্ষকে সেই চুক্তির শর্ত পুংখানুপুঙ্খরূপে মেনে চলার তাকিদ দেয়। সেই সাথে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের শাস্তির ঘোষণাও দিয়েছে। সুতরাং চুক্তিবদ্ধদের হক হলো, চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষ চুক্তির ব্যাপারে যত্নশীল হয়ে তা বাস্তবায়নে তৎপর হবে।

মুসলিমদের সাথে মুসলিমদের চুক্তি

কোন ব্যক্তি, জাতি-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান যখন কোন বিষয়ে কারোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন চুক্তির বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ করা, চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ সম্পাদন করা চুক্তিবদ্ধদের হক। এবার যদি চুক্তির ফলে কোন পক্ষের কোন ক্ষতিও হয়, সে যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে দেশীয় আইনে তো অবশ্যই সে দণ্ডনীয় হবে সেই সাথে আল্লাহর আদালতেও চুক্তিভঙ্গকারীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের চুক্তি

ইসলাম মুসলিমদের সাথে অমুসলিম বা অন্য মতাদর্শের অনুসারী যখন পারস্পরিক কোন প্রয়োজন পূরণে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন সে চুক্তি পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। কোনভাবেই তাদেরকে অমুসলিম মনে করে কোণঠাসা করা, বকাবকি করা, তাদেরকে হক থেকে বঞ্চিত করা ইসলাম সমর্থন করে না।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনীতে আমরা দেখি তিনি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশায় অমুসলিমদের সাথে যত চুক্তি করেছেন তা তিনি সব সময় সকল মুসলিমদেরকে মেনে চলার নির্দেশ দিতেন।

এমনকি তারা কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِيْ غَيْرِ كُنْهِه حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হা. নং-২৭৫১, ই.ফা)

শ্রমিক-কর্মচারীদের হক

মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যারা শ্রম বিক্রি করে তথা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক পাক্ষিক বা মাসিক বেতনের চুক্তিতে কাজ করে তারাই শ্রমিক-কর্মচারী। নারী-পুরুষ ভেদে এমন শ্রমিক-কর্মচারীদের আয়ের উপর অনেক সময় পিতা-মাতা ও ছোট ভাই-বোনেরাও নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষের কাছে তাদের সোজা কথায় হক বা অধিকার হচ্ছে যথাসময়ে যথাযথ বেতন, বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি, চাকরির স্থায়িত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সুন্দর মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে কাজ করতে পারা।

ন্যায্য বেতন, বোনাস ও ওভারটাইমের পারিশ্রমিক প্রাপ্তি

মানুষ কাজ করে, বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। এ পাওয়া তাদের হক বা অধিকার। মানুষ যেহেতু মেশিন নয় আর মেশিনেরও আজকাল বিরাম দিয়ে দিয়ে কাজ করতে হয় সেহেতু দীর্ঘক্ষণ মানুষ কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু তবু এ কষ্ট উপেক্ষা করে নিজেদের প্রতিদিনকার প্রয়োজন পূরণে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে মালিক পক্ষের মুনাফা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে তাদের ন্যায্য বেতন, বোনাস ও ওভার টাইমের পারিশ্রমিক যথাযথ সময়ে পাওয়া তাদের হক। এ হক যদি যথাযথভাবে আদায় করা হয় তাহলে কখনোই শ্রমিক মনে অসন্তোষের নামে নানা আন্দোলন, অধিকার আদায়ের নামে ট্রেড ইউনিয়ন বা মে ডে-এর সূচনা হত না। প্রকৃতপক্ষে এই মে ডে-র সূচনাই হয়েছে অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক মিছিলের বুকে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ অধিকার হরণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হরণকারীদের হাতে ভুখা মানুষের জীবন দেয়াই মে ডে-র মূল

কথা। ১৮৮৬ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এক শ্রেণীর মালিক পক্ষ শ্রমিকদের অধিকার হরণে তৎপর থেকে প্রতি বছর ১ মে দিবসে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের নামে আন্দোলন করতে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করতে থাকে– যা মূলতঃ অধিকার হরণেরই প্রতিচ্ছবি। অথচ পৃথিবীর বুকে শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে হক যথাযথভাবে আদায়ের লক্ষ্যে সেই সাড়ে ১৪ শত বছর পূর্বে আমাদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করে গিয়েছেন :

ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِه اَجْرَهُ.

কিয়ামাতের দিন আমি তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো, তার বিরুদ্ধে জয়ী হবো। তারা হলো : যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করে, পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্য স্বাধীন মানুষ বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু তর পূর্ণ মজুরী দেয় না। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুর রাহূন [বন্ধক], হা. নং-২৪৪২, আ.প্র)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوا الاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ.

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুর রাহূন [বন্ধক], হা. নং ২৪৪৩, আ.প্র.)

কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ প্রাপ্তি

শ্রমিক-কর্মচারীরা যেখানে কাজ করে সেখানে নিরন্তর কাজের স্বার্থেই প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিবেশ সংরক্ষণ। এখানে সুষ্ঠু পরিবেশ বলতে বুঝানো হয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখা, আলো-বাতাস নিয়মিত প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা, খুব বেশি চাপাচাপি করে মেশিন টুলস স্থাপন না করা, স্বাস্থ্যহানিকর কেমিকেলস সরাসরি যেন হাত দিয়ে না ধরতে হয় সেজন্য গ্লাভস (দস্তানা) ব্যবহার করতে দেয়া, প্রচণ্ড উত্তাপে কাজ করতে না দেয়া, রোগের সংক্রমণ হতে

পারে এমন পরিবেশ না হওয়া ইত্যাদি।

দুর্ঘটনা ও কর্মে অক্ষম হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া

অনেক কঠিন কাজ শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত করে থাকে। এতে অনেকেই দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত হওয়াসহ অঙ্গহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। এভাবে দুর্ঘটনায় আহত-নিহত পরিবারের দিকে লক্ষ্য করে মালিক পক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের চিকিৎসা খরচের যোগানসহ এককালীন কিছু টাকা প্রদান করাও শ্রমিকদের হকের আওতাভুক্ত।

চাকুরি বা কাজের স্থায়িত্ব দেয়া

চাকুরি বা কাজের স্থায়িত্ব শ্রমিক কর্মচারীদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ও কাজের প্রতি যত্নশীল, মনোযোগী বা আন্তরিক করে তোলে– যা মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকেই মজবুত ও গতিশীল করতে সহায়ক হয়ে থাকে। পক্ষান্ত রে যেসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরি সকালে আছে তো বিকেলে নেই; আজ আছে তো কাল নেই সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করার যেমন আগ্রহ থাকে না তেমনি প্রতিষ্ঠানও লাভবান হওয়ার দিকে ধাবিত হতে পারে না। শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে কথায়-কথায় চাকরি শেষ, কাজ ছেড়ে দাও বা যেভাবে বলছি সেভাবে করতে হবে নতুবা কাজ ছেড়ে চলে যাও এমন আচরণ যেসব প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার বা উৎপাদন ব্যবস্থাপক করে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিক কাজ করতে যেয়ে আনন্দবোধ করে না। কারণ তারা যখন দেখে এখানে উপরস্থ কর্মকর্তারা কর্মচারীদের সাথে দায়িত্বশীল আচরণ করে না, এখানে চাকরি যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে, নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করার কোন সুযোগ নেই তখন তারাও অন্যত্র চাকরি খুঁজতে থাকে। এতে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই শ্রমিক-কর্মচারীদের এ হকগুলো পরিপূর্ণ করার প্রতি মালিক পক্ষ যত্নশীল ও সচেতন হলে আশা করা যায় যে কোন প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

শ্রমিকদের কাছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও প্রধানদের হক

একটি দেশের অর্থনীতি ত্বরান্বিতকরণ ও বেকার সমস্যা লাঘবে সেই দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন অত্যাবশ্যক। বিশ্বের বুকে উন্নত দেশ বলতে যে সমস্ত দেশগুলোর নাম প্রথমেই আসে সে সমস্ত দেশগুলো মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশ। আর তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এ শতাব্দীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোও শিল্প

প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অবশ্য না যেয়ে উপায়ও নেই। একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে কোন দেশ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হলে যে পিছিয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাইতো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রত্যয়ে প্রত্যেক দেশেরই উচিত তাদের কাঁচামাল ও অন্যান্য শিল্পের সহায়ক উপকরণগুলোর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নত যন্ত্রপাতি সম্বলিত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

তবে যে কথা না বললেই নয় তা হলো, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সহজ কথা নয়। একদিকে মূলধনের যোগান অন্যদিকে ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা এ দু'টির মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা কঠিন। সেই সাথে দক্ষ শ্রমিক ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার বিষয়টিও বিচার্য।

অন্যদিকে অর্থনীতির ভাষায়, উৎপাদনের উপকরণ চারটি। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এসবগুলোর মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে অনেক ঝুঁকির মাঝেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদ্যোক্তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকেন। তাদের লক্ষ্য জনগণের চাহিদা পূরণ করে সেবার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বহু লোকের কর্মসংস্থান করে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। এ লক্ষ্য পূরণ হতে পারে :

❖ যদি মালিক ও শ্রমিকদের পরিশ্রমের মাঝে সমন্বয় করা যায়;

❖ সবাই যদি মনোযোগী হয়ে চুক্তি মুতাবিক মালিকের দেয়া কাজ অত্যন্ত আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে পালনে ব্রতী হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَابَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ.

"তাদের একজন বলল, হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ২৬)

❖ প্রতিষ্ঠানের কাজকে নিজেদের কাজ মনে করা।

❖ কোন সমস্যা দেখা দিলে তা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সমাধান করা।

❖ প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের মনে করে তার সকল কিছুর প্রতি যত্নবান হওয়া।

❖ শ্রমিকদেরকে সব সময় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা।

❖ কাজে ফাঁকি না দেয়া।

❖ সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে কাজ করা ইত্যাদি।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকরা নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করবে এটা উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের হক। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, এরপর সে এ কাজ শুধু নিজ অভাব মোচনের জন্যই করবে না, বরং আখিরাতে সফলতার আশাও রাখবে। কেননা নিজের হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা নাবীগণের সুন্নাত ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুম।

কুলি, মজুর ও রিক্সা চালকের হক

ন্যায্য মজুরী

অন্যের বোঝা মাথা ও ঘাড়ে বহন করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে যারা তারাই সমাজে কুলি, মজুর নামে পরিচিত। অন্যদিকে মানুষ ও অন্য কিছুকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার যে বাহন তার নাম রিক্সা। আর বাহনটি যারা দু'পায়ের শক্তি দ্বারা প্যাডেল ঘুরিয়ে চালিয়ে থাকে এবং বাহনটির চলার শক্তির উৎস হলো মানুষের শরীরের শক্তি সে বাহনটি যারা চালায় তারাই রিক্সা চালক।

কুলি, মজুর ও রিক্সা চালক উভয় শ্রেণীই এককথায় দীন দরিদ্র। ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যে এ শ্রেণীর মানুষগুলো কাজের অন্বেষণে জনবহুল স্থান তথা বাজার, বাসস্ট্যান্ড ও রাস্তায় নেমে আসে। প্রতিদিন কাজের বিনিময় হিসেবে যা আয় করে তা দিয়ে দিনের শেষে তারা খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে বাড়ি ফেরে। এতে বাড়িতে অবস্থানরত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মুখে অন্ন, গায়ে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, রোদ-বৃষ্টি থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে মাথা গুঁজে থাকার জন্য একটু শেড তৈরি, আগামী বংশধর বা সন্তানদের দিনগুলো সুন্দর করে গড়তে তাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন আর সকলকে গতিশীল ও কর্মোদ্দমী রাখতে সুস্থ থাকার প্রয়োজনে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে প্রতিদিন যন্ত্র চালিত ইঞ্জিন বা মেশিনের সাথে পাল্লা দিয়ে তারা কাজ করে থাকে। কাজেই যে আয়ের অর্থ তাদের সকলের মৌলিক অভাব পূরণ বা জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজন পূরণের সোপান তা যথাসময়ে যথাযথভাবে নিজেদের বিবেক খাঁটিয়ে প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ ন্যায্য মজুরী প্রাপ্তিই তাদের হক বা অধিকার। ইসলাম এমন খেটে খাওয়া ব্যক্তিদের পারিশ্রমিক পরিশ্রম করার পূর্বেই নির্দিষ্ট করে

নেয়ার জন্য তাকিদ প্রদান করেছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اِذَا اسْتَأْجَرْتَ اَجِيْرًا فَاَعْلِمْهُ اَجْرَهُ.

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তুমি কোন শ্রমিকের দ্বারা পরিশ্রম করাতে ইচ্ছা কর, তখন তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নিও। (সুনান নাসাঈ, কৃষিতে বর্গা ও চুক্তির শর্ত, হা. নং-৩৮৬১, ই.ফা)

আর মজুরী নির্ধারণ না করে কাউকে কাজে খাটানো বা তার রিক্সায় চলাচল না করা উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি অপছন্দ করতেন।

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ اَجْرَهُ.

আল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে, তাকে মজুর হিসেবে নিয়োগ করাকে অপছন্দ করতেন। (সুনান নাসাঈ, কৃষিতে বর্গা ও চুক্তির শর্ত, হা. নং-৩৮৬২, ই.ফা)

কাজের মর্যাদাদান

প্রয়োজনীয়তাই পথ তৈরি করে দেয়। সমাজে উঁচু শ্রেণীর লোকজনদের সেবার প্রয়োজনেই কুলি, মজুর ও রিক্সা চালকের অবস্থান। আদর্শ সমাজ গঠনে সমাজে বসবাসরত সকল শ্রেণীর পেশাজীবিদের কাজের মর্যাদা দান আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে অন্যের সম্পদ চুরি, জোর-জবরদস্তি করে ছিনতাই বা ডাকাতি, চেয়ারে বসার সুবাদে বিভিন্ন কৌশলে ফাইল ঠেকিয়ে ঘুষ ও দুর্নীতি এবং সুদের ব্যবসায়ী, ভেজাল ও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফাখোরীসহ অপরের সম্পদ হরণকারী হওয়া থেকে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্তকে পানি করে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে তাদের কাজ অনেক উত্তম, অনেক ভাল এবং হালাল ও বৈধ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الاِسْلاَمِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ.

ফাদালা ইবন 'উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করা হয়েছে এবং যার জীবিকা ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক এবং তাতেই সে তুষ্ট। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ, হা. নং-২২৯১, বিআইসি)

সুতরাং কাজের অবমূল্যায়ন করে শ্রমজীবি মানুষকে সমাজে কোণঠাসা করা,

সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাদেরকে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া, তারা বয়সে বড় হলেও তাদেরকে নাম ধরে ডাকা, তাদের সুন্দর নামকে অসুন্দর বা ব্যঙ্গ করে ডাকা, তুই-তুমি করে সম্বোধন করা, তাদের সন্তানদের সাথে নিজেদের সন্তানদের মিশতে না দেয়া, এককথায় তাদেরকে মানুষ হিসেবে মর্যাদার চোখে না দেখা– তাদের হক হরণ করার শামিল।

পথচারীদের হক

পথিক পথের উদগাতা। আর সে পথে যে বা যারা যুগ-যুগ ধরে গমন করে তারাই পথচারী। স্বভাবতই পথে গমনকারী হিসেবে পথের কাছে তারা হয়ে পড়েন হকদার।

মূলতঃ পৃথিবীর উন্নয়ন, পৃথিবীবাসীর এগিয়ে যাওয়া সবকিছুর সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে আজ বেড়েছে মানুষের কর্মচঞ্চলতা; মানুষের পথ চলা। আজ জনগুরুত্বপূর্ণ ও উন্নয়নে অপ্রতিরোধ্য বাধা হিসেবে ধরা দিয়েছে পথ মাড়িয়ে ভবন নির্মাণের অপচেষ্টা, পথ সংকুচিত করে দেয়া, পথের পাশে অনিয়ম করে গাড়ি পার্কিং করা, ভবন নির্মাণের উপকরণ রাখা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা পরিচালনা করা, পায়ে হাঁটার ফুটপাত ছেড়ে গাড়ি চলাচলের স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে চলা, ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে পথ অতিক্রম না করে যানবাহনে চলাচলের পথ দিয়ে পারাপার হওয়া, ধাক্কাধাক্কি করে পথ চলা, এক পাশ হয়ে না হেঁটে কয়েকজন মিলে গল্প করতে করতে পুরো পথ জুড়ে হাঁটা, অন্যদের চলাচল বন্ধ করে কারোর কারোর পথ চলা ইত্যাদি সবই অন্য পথিকদের স্বাভাবিক চলাফেরার যে হক তা হরণের শামিল।

পথ কতটুকু হওয়া উচিত

মানুষের স্বাভাবিক চলাচল উপযোগী পথ বা রাস্তা পাওয়া পথিকের হক বা অধিকার। তবে বাড়ির মধ্যে নিজেদের চলাচলের পথ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানের অভাবহেতু একটু সংকুচিত হতে পারে, কিন্তু পথ না দেয়া বা বন্ধ করে দেয়া ইসলামী শারীয়াহ কোনভাবেই সমর্থন করে না। আজকাল শহর এলাকায় দেখা যায় সামনের প্লটের বাড়ির মালিক পেছনের প্লটে যাওয়ার জন্যে পথের জায়গা দিতে চায় না। এক্ষেত্রে পেছনের প্লটে যিনি বা যারা বসবাস করবেন তারা কিভাবে বাসা-বাড়িতে আসা-যাওয়া করবেন? কোন পথে গমন করবেন এ যৌক্তিক বিষয়টিকেও অনেক সময় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য থাকায় উপেক্ষা করা হয়। যা হক হরণ করারই শামিল। যা মুসলিম নীতি বিরুদ্ধ কাজ। কেননা

মুসলিম মাত্রই এ কথা জানে ও বুঝে, যে জায়গা, জমি ও বাড়ি আমার-আমার বলে দাবি করছি আসলে সে জায়গা-জমি প্রকৃত অর্থে আমার নয়। এ জায়গা-জমি স্রষ্টার; পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি ছিল আজও আছে, কিয়ামাত পর্যন্তও থাকবে। অন্যের অধীনে ছিল, আজ আমার অধীনে, কাল অবশ্যই অন্যের অধীনে থাকবে, কিন্তু আমাকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিতে হবে। পৃথিবীর সকল মানুষ জানে জন্ম যেহেতু আমাদের হয়েছে সেহেতু মৃত্যু নিশ্চিত, তবে কখন, কোথায় মৃত্যুবরণ করব তা অজানা। তাই এ নিশ্চিত মৃত্যুর পথযাত্রী মানুষ দুনিয়ার জীবনে সম্পদ-জায়গা-জমি ভোগের অধিকার হেতু গর্ব-অহংকার করে অন্যদের পথ বা রাস্তা বন্ধ করে দেয়া কখনোই বিবেকবান ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়পক্ষের মধ্যে রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে রাস্তা কতটুকু হবে সে সম্পর্কে বলেন :

اِجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ.

তোমরা রাস্তা সাত হাত পরিমাণ চওড়া করো। (সুনান ইবন মাজাহ, বিচার ও বিধান, হা. নং-২৩৩৮, আ.প্র)

اِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ.

তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো। (সুনান ইবন মাজাহ, বিচার ও বিধান, হা.নং-২৩৩৯, আ.প্র)

পথে না বসা এবং পথের হক আদায় করা

পথিকের চলার পথে না বসাই উত্তম। তাছাড়া মুরব্বিরা যখন পথের দু'পাশে বসে গল্প-গুজব করতে থাকে তখন তাদের সামনে বা মাঝ দিয়ে পথ চলায় অনেকেই বিব্রত বোধ করে, সেই সাথে নারীদের তো সমস্যা হওয়াই স্বাভাবিক। আবার কোথাও কোথাও দেখা যায়, স্কুল-কলেজ ছুটি হলে যখন শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ফিরে আসতে শুরু করে তাদের পথে এক শ্রেণীর লোকজন বসে নানা ধরনের আলোচনা করতে শুরু করে, যা শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পথচলায় বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। আর এ জন্যই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে পথে বসতে নিষেধ করেছেন। এবার তারপরও যদি কেউ পথে বসে তাহলে সে যেন রাস্তার হক আদায় করে এ ব্যাপারে তিনি নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ

فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اَبَيْتُمْ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّه قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো রাস্তার উপর বসেই কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তা জরুরি হয়, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার হক কী? তিনি বলেন, রাস্তার হক হলো– দৃষ্টি নত রাখা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। (আবু দাউদ, আদব, হা.নং-৪৭৪০, ই.ফা)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রাস্তার হক হলো : বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং যারা পথ হারিয়ে ফেলে, তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়া। (আবু দাউদ, আদব, হা. নং-৪৭৪২, ই.ফা)

ম্যানহোলের মুখ খোলা না রাখা

পথে ম্যানহোলের মুখ যেন খোলা না থাকে সেদিকে সকলের খেয়াল রাখা উচিত। বিশেষ করে যারা আশেপাশে আছেন তাদের দায়িত্ব বেশি। কেননা বৃষ্টির পানিতে ম্যানহোলের গর্ত তলিয়ে গেলে পথিক পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খাওয়াসহ বড় ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারেন, তাই বৃষ্টি হলে বা বর্ষাকালে যদি অকস্মাৎ ম্যানহোলের মুখ খোলা থেকেই যায় তাহলে কোন কিছু দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দেয়া উত্তম– যাতে দূর থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্যদিকে ছোট ছেলে-মেয়েরা না বুঝে গর্তে কী দেখা যায় এমনভাবে তাকাতে যেয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে পারে সেদিকেও আমাদের সকলের খেয়াল রাখা এবং যত দ্রুত সম্ভব তার মুখ ঢেকে দেয়ার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম।

অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা না কাটা

দেশে সেবা ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির নামে পানি উন্নয়ন বিভাগ, ড্রেনেজ বা ময়লা নিষ্কাশন বিভাগ, গ্যাস ও টেলিফোন বিভাগসহ রাস্তা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যদি সমন্বিতভাবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে তাহলে পথিকের পথ চলার কষ্ট লাঘব হবে। এতে সংরক্ষিত হবে পথিকের হক বা অধিকার; সংরক্ষিত হবে রাষ্ট্রের শত-সহস্র কোটি টাকা অপচয়– যা আবার কোটি-কোটি মানুষেরই হক।

আবার কোথাও কোথাও দেখা যায়, বাড়িতে পানির সংযোগ ও বাড়ির ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পথ কেটে পথিকের পথ চলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার দশা– যা হয়তো প্রয়োজনেই করা হয় কিন্তু সদিচ্ছার অভাবে দ্রুত পথ চলাচলের উপযোগী করে না দেয়ায় পথিক কষ্ট পেতে থাকে তাও হক হরণের পর্যায়ভুক্ত।

নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি পার্কিং করা

বাণিজ্যিক ভবন, এপার্টমেন্ট, হাসপাতালসহ সকল সুউচ্চ ভবনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গাড়ি পার্কিং সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আছেও। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ ভবনগুলোর মালিকেরা সম্পদশালী, ক্ষমতাবান হওয়ার সুবাদে কেউ বা নীচতলায় দোকান ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালের ক্ষেত্রে রিসিপশন ও ফার্মেসী ইত্যাদির নামে দখল করে টাকা উপার্জনের নেশায় মেতে থাকে। আর তাদের গাড়িগুলোকে পার্কিং করে রাখে ফুটপাতে বা রাস্তার পাশে এখানে সেখানে। ফলে যানজট বাধছে প্রতিনিয়ত প্রত্যেক স্থানে।

কষ্টদায়ক বস্তু, ময়লা রাস্তায় বা পাশে না ফেলা

মানুষকে কষ্ট দিতে পারে যদি রাস্তায় কাঁটা জাতীয় কিছু যেমন বরই কাঁটা, খেজুর গাছের কাঁটা, মান্ধার কাঁটা, পিচ্ছিল জাতীয় কিছু যেমন কলার ছোলা, আম-কাঁঠালের ছোলা, হঠাৎ করে সুউচ্চ ভবন থেকে রাস্তার দিকে ঢিল ছুঁড়ে ময়লা আবর্জনা, পানি, এমন কিছু ময়লা যা সত্যিই লজ্জাজনক ও ঘৃণাজনক, পয়ঃনিষ্কাশিত ময়লাসহ পচা-গলা কোন প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ, ভবন তৈরির উপকরণ ইত্যাদি মানুষের চলাচলের রাস্তায় না ফেলা।

আবার এগুলো রাস্তায় বা রাস্তার পাশে ফেলে শুধু যে পথিককে কষ্ট দেয়া হচ্ছে তাই নয় পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। এতে মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে; রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে। পরিণামে জীবন হচ্ছে অসুস্থ এবং হুমকির সম্মুখীন। এ ধরনের কাজ থেকে সকলেই বিরত থাকা উচিত।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

রাস্তা সকলের জন্য; তাই রাস্তা দিয়ে সকলের অবাধ গমনাগমন নির্বিঘ্ন হতে হবে। তাই যারা রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করবে তারাই হবে এর হিফাযতকারী এবং হকদার। কাজেই রাস্তায় পথিকের কষ্ট হবে এমন কোন বস্তু ফেলে রাখা কোনভাবেই সমীচীন নয়। অনেকে মনে করে, বাড়ির সামনের রাস্তার দাবিদার আমরা নিজেরাই। সুতরাং আমরা আমাদের প্রয়োজনে রাস্তায় এটা-সেটা রাখব তাতে কার কী– আসলে বিষয়টি কিন্তু এমন নয়, ঠিক আছে রাস্তায় যে স্থানটুকু

ব্যবহৃত হচ্ছে তাও হয়তো এক সময় আপনাদের আয়ত্তাধীনেই ছিল। কিন্তু আজ যখন তা রাস্তায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেহেতু আজ এর অধিকার কিন্তু ঐ রাস্তা দিয়ে যে বা যারা, যখন চলাচল করবে তাদেরই এ কথা মাথায় রাখতে হবে। আর তাই একেবারেই অনন্যপায় ছাড়া রাস্তায় পথিকের কষ্টদায়ক কোন কিছু না ফেলা বা রাখাই উত্তম। কিন্তু যদি ফেলাও হয় বা রাখাও হয় তাহলে নমনীয় হয়ে, দুঃখ প্রকাশ করে যত দ্রুত সম্ভব তা যথাস্থানে সরিয়ে ফেলা বা হিফাযত করে পথিকের পথ চলার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

كَانَ عَلَى الطَّرِيْقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِى النَّاسَ فَاَمَاطَهَا رَجُلٌ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ.

এক রাস্তার উপর একটি গাছের ডাল এসে পড়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিতো। এক ব্যক্তি তা সরিয়ে ফেললে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। (সুনান ইবন মাজাহ, শিষ্টাচার, হা. নং-৩৬৮২, আ.প্র)

عُرِضَتْ عَلَىَّ اُمَّتِىْ بِاَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا فَرَاَيْتُ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الاَذى يُنَحّى عَنِ الطَّرِيْقِ وَرَاَيْتُ فِىْ سَيِّءِ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِى الْمَسْجِدِ لاَتُدْفَنُ.

আমার উম্মাতের ভালো ও মন্দ কার্যাবলী আমার সামনে পেশ করা হলে, আমি তাদের ভালো কার্যাবলীর মধ্যে যাতায়াতের পথ থেকে তাদের কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম এবং তাদের নিকৃষ্ট কার্যাবলীর মধ্যে মাসজিদে থু-থু ফেলাও অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম যা (মাটি দিয়ে) ঢেকে দেয়া হয়নি। (সুনান ইবন মাজাহ, শিষ্টাচার, হা. নং-৩৬৮৩, আ.প্র)

রাস্তায় গাড়ি চলাচলের হক

এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি কোন্‌টি আগে?

মুমূর্ষ রোগী বহনকারী যানবাহন এ্যাম্বুলেন্স আর অগ্নি নির্বাপক তথা দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতিরোধক কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এ দু'ধরনের যানবাহনের চলাচলের উদ্দেশ্য বা প্রকৃতিই বলে দেয় কে আগে যাবে? কার হক বেশি! এ্যাম্বুলেন্স একজনকে রক্ষা করতে নিয়োজিত আর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি বহুজন, বহু অর্থ-কষ্ট লাঘবে নিয়োজিত– এজন্য এ দু'টো যানবাহনই ট্রাফিক সিগন্যালের আওতামুক্ত।

অন্যদিকে রাস্তায় যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এমন যানবাহনগুলোকে দ্রুত তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যেতে ব্যবস্থা করে দেয়া; এ গাড়িগুলোর সাইরেন বা উচ্চ সতর্কীকরণ শব্দ শুনামাত্র অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য সাইড দিয়ে দেয়া।

ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের গাড়ি

একটি দেশ গঠন ও পরিচালনায় যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হোন তারাই ভিভিআইপি ও ভিআইপির মর্যাদাসম্পন্ন। তারা দেশের জনগণের সেবক, দেশের পতাকাকে সুউচ্চে মর্যাদার আসনে সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংগঠক। সুতরাং দেশ ও দশের চিন্তা, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কামনা, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথে বলীয়ান– এ সংগঠকদের সময়ের মূল্য অনেক বেশি নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কাজেই সময়, নিরাপত্তা, সুষ্ঠ চিন্তা-চেতনার সমন্বয়, কাজে একনিষ্ঠতা, বিরামহীন গতি এসব কিছুর জন্যে তাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের ব্যবস্থা করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয়– ভিভিআইপি যখন মেকাপ কক্ষে তখন থেকেই নিরাপত্তা কর্মীরা রাস্তায় অন্যান্যদের গাড়ির চাকা বন্ধ করে রাখে অথবা ভিভিআইপি রাস্তায় আসার অর্ধ ঘণ্টা আগে থেকে জনগণের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়, এদিকে এ্যাম্বুলেন্সে রোগী মৃত্যু শয্যায় শায়িত বা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর সময় অতিবাহিত বা বিমানে বিদেশগামী যাত্রীর বিমান ছাড়ার সময় আগত তখন বিষয়টি কেমন হবে ঐ ব্যক্তিদের জন্য! বিবেচনার ভার অতীতে যারা ভিভিআইপি ছিলেন, বর্তমানে যারা আছেন, ভবিষ্যতে এ জাতির পক্ষ থেকে যারা হবেন, তাদের বিবেকের কাছে ছেড়ে দিলাম।

পাবলিক বাসে চলাচলে একে অপরের হক

ড্রাইভার, কনডাকটর ও হেলপারের কাছে যাত্রীদের হক

ব্যস্ততার এ যুগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ, বাস, ট্যাক্সিক্যাব, সিএনজি ও রিক্সাসহ নানা পরিবহন ব্যবহার করছে। প্রথমেই বলব বাসের কথা, যাত্রীতে পরিপূর্ণ এ বাসের দায়িত্ব চালকের। আজকাল সবকিছুর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যে অনেক যাত্রী প্রাণ হারাচ্ছে। হ্যাঁ, একজন মুসলিম হিসেবে আমরা জানি মৃত্যু একদিন আসবেই। কিন্তু এমন অপঘাতে মৃত্যু যেন না হয় সেজন্য একটু সচেতন তো আমরা থাকতে

পারি। বিশ্লেষকদের মতে সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছে ড্রাইভারদের অদক্ষতা, অযোগ্যতা, গাড়ি চালনাতে অমনোযোগিতা, অন্য গাড়ির সাথে প্রতিযোগিতা, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা, বেখেয়ালী হওয়া, নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে গাড়ি চালানো, কোন সময় যন্ত্র বিকল বা ব্রেক ফেইল করা ইত্যাদি। এ সবগুলো বিষয় একজন যোগ্যতম ড্রাইভার ইচ্ছা করলে প্রতিহত করে যাত্রীদের সুন্দর ও নিরাপদ গমনের সুযোগ করে দিতে পারেন। আর এজন্যেই ড্রাইভারের কাছে যাত্রীদের হক বেশি।

ড্রাইভার যেখানে সেখানে হঠাৎ করে গাড়ি থামানোর ক্ষেত্রে যদি খেয়াল রাখেন যে এ রাস্তায় আমার পেছনে গাড়ি আছে হঠাৎ থামালে পেছনের গাড়িটা ব্রেক করতে না পারলে নিশ্চিত দুর্ঘটনা। কাজেই আমি নির্দিষ্ট স্টপেজে বাম দিকে চাপিয়ে থামাব তাহলে রাস্তার হক আদায় হয়ে যাবে।

কনডাকটর ও হেলপারের কাছে যাত্রীদের হক হলো নির্দিষ্ট স্টপেজে সুন্দর করে গাড়ি থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়ার প্রতি খেয়াল রাখা। যাত্রীদের সাথে সুন্দর করে কথা বলা, ঝগড়া, বাক-বিতণ্ডা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা, উত্তম সেবা ও ব্যবহার, আচার-আচরণ প্রদর্শন করা।

যাত্রীদের কাছে ড্রাইভার, কনডাকটর ও হেলপারের হক

অধিকাংশ বাসেই কনডাকটর কম বয়স্ক একজন ছেলে মানুষ হয়ে থাকে। একটু ভাবি সে তো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, অশিক্ষিত ছেলেটি সুন্দর করে কথা বলতে তো পারার কথা নয়। আবার সূর্য উদয় থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত শত-সহস্র লোকের সাথে কথা বলতে বলতে কত ধৈর্য আর সহনশীলতা কনডাকটরের থাকবে বলুন, কাজেই আসুন আমরাই একটু সহনশীল ও সহমর্মিতার দৃষ্টিতে সুন্দর করে কথা বলে লোকাল বাসের কনডাকটর, ড্রাইভার ও হেলপারের আচরণকে সামগ্রিকভাবে সুন্দর করতে চেষ্টা করি।

যাত্রীদের কাছে যাত্রীদের হক

পাবলিক বাসে চলাচলের ক্ষেত্রে যাত্রীদেরও পারস্পরিক হক রয়েছে; যা একটু সচেতন ও সহনশীল হলেই পরিপূর্ণ করা সম্ভব। এবার প্রশ্ন আসতে পারে যাত্রীরা তো স্বল্প সময়ের জন্য বাসে আরোহণ করে নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে যায়, তাহলে তাদের কাছে আবার হক কেমন? একটু লক্ষ্য করুন :

০১. বাসের সিটে বসেই জানালার কাঁচটা পুরো ধাক্কা দিয়ে সামনে বা পেছনে অর্থাৎ নিজের সুবিধামত ঠেলে না দেয়া; যে প্রয়োজনে আপনি ঠেলে দিচ্ছেন সেই প্রয়োজনটা আপনার সামনে ও পেছনের সিটে বসা ভাইয়েরও থাকতে পারে,

সেদিকে খেয়াল রেখে সব সময় কাঁচটা মাঝামাঝি রাখা উত্তম।

০২. কখনো বিশেষ প্রয়োজনে ধাক্কা দিতে হলে সামনে বা পেছনে যে সকল যাত্রীরা বসে আছেন তাদের হাত ও মাথা যেন সরিয়ে রাখতে পারে সেজন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালার কাঁচটা ঠিক মাঝামাঝি রাখা।

০৩. যেখানে সেখানে হাত উঠিয়ে গাড়ি থামানোর জন্য ইঙ্গিত দিয়ে আরোহণরত যাত্রী ভাইদের কষ্ট না দেয়া। গাড়ি থামানো যে শুধু ড্রাইভারের দোষ তা নয় এতে আমাদের স্বার্থপরতাও দায়ী। একটু কষ্ট করে হেঁটে নির্দিষ্ট স্টপেজে গেলে, যেখানে সেখানে গাড়ি থামিয়ে যাত্রী উঠানোর মত যাত্রী না পেলেই ড্রাইভার হেলপারের চরিত্র সংশোধন হয়ে যাবে।

০৪. বাসের সিটে বসে একদম জোরে-জোরে এমন গল্প শুরু করে না দেয়া যা অন্যের জন্য বিরক্তির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে অফিসের ছুটির সময় তথা বিকেলে সবাই যখন ক্লান্ত বাসায় ফিরতে ব্যস্ত তখন গাড়িতে বসে জোরে-জোরে কথা অন্যের মাথা ব্যথা ও বিরক্তির কারণ হতে পারে।

০৫. টিকেট কেটে কাউন্টার থেকে বাসে আরোহণের ক্ষেত্রে যিনি আগে টিকেট কেটেছেন তাকে আগে উঠতে দেয়া।

০৬. বাসে উঠে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্য ভাইদের কষ্ট আর মনের অজান্তেই পকেটমারদের সুযোগ করে না দেয়া। ভেতরের দিকে যাওয়া এবং অন্য যাত্রীদের বিশেষ করে অফিস সময়ে অফিসে যাওয়া আসার সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে একটু ত্যাগ স্বীকার করার চেষ্টা করা।

০৭. গাড়িতে বসে মোবাইল ফোনে গল্প করতে শুরু না করা। এতে অন্য যাত্রীদের কষ্ট হয়।

০৮. পাশে বসার জায়গা থাকলে অন্য ভাইদের বসতে সুযোগ দেয়া। জানালার অংশ একদম বন্ধ করে গাড়িতে না বসাই উত্তম।

দায়িত্বশীলদের কাছে অধীনস্থদের হক

যিনি বা যারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব অঙ্গনে বা স্ব-স্ব গোত্রের অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন তারাই দায়িত্বশীল। মূলতঃ এ দায়িত্বশীলগণ অধিক জ্ঞানী এবং অনেক ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে থাকেন। এমন দায়িত্বশীল সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه فَالاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَّهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلى اَهْلِ بَيْتِه وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلى

بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِه وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلى مَالِ سَيِّدِه وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه.

সাবধান! তোমরা সকলে রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল এবং (কিয়ামাতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমীর (নেতা) হয়েছে, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, (সে তার অধীনস্থদের সাথে) কিরূপ ব্যবহার করেছে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আর স্ত্রী, তার স্বামীর ঘর-সংসার ও তার সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, তাকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই তোমরা সকলে দায়িত্বশীল, রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের সকলকে তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, হা. নং-২৯১৮, আ.প্র)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِه وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

দীন হল কল্যাণ কামনার নাম। তিনি একথা তিনবার বলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লার রাসূল! কার কল্যাণ কামনা করা? তিনি বলেন : আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, মুসলিম নেতৃবর্গের এবং মুসলিম সর্বসাধারণের। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৭৫, বিআইসি)

এখানে "আল্লাহর কল্যাণ কামনা" অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের প্রতি নিষ্কলুষ ঈমান এবং তাঁর একনিষ্ঠ ইবাদাতের সংকল্প বুঝায়। "আল্লাহর কিতাবের কল্যাণ কামনা" অর্থাৎ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন ও তদনুযায়ী কাজ করা বুঝায়। "মুসলিম নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনা" অর্থাৎ সৎকাজে তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা বুঝায়। "সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা" অর্থাৎ তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান এবং উপকার সাধন বুঝায়।

সুতরাং দায়িত্বশীলদের দায়িত্বই হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র অঙ্গনে যে যেখানে দায়িত্বশীল সেখানকার অধীনস্থদের সম্পর্কে সামগ্রিক খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব হলে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে দীনের সুফল ছড়িয়ে দেয়া। আর এভাবেই কায়েম হতে পারে আদর্শ সমাজ তথা সম্মিলিতভাবে আদর্শ রাষ্ট্র। দায়িত্বশীল বা নেতার কাছ থেকে অধীনস্থরা সব সময় যে শুধু উপদেশ, আদেশ নির্দেশই পাবে

বিষয়টি ঠিক এমন নয়। বরং এগুলো পাবে; মানবে; মানার চেষ্টা করবে। কিন্তু পাশাপাশি তাদের প্রয়োজন মত আর্থিক ও মানসিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রশান্তিও পাবে। আর তা সম্ভব না হলে অন্তত ধৈর্যধারণ করে অধীনস্থের কথা শুনে, তাকে সুন্দর হাসি মুখে ভাল ভাল কথা দিয়ে সান্ত্বনা এবং বিশেষ দু'আ পাওয়া অধীনস্থদের হকের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তা না করে কেউ যদি অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা চমৎকার।

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৯৬, বিআইসি)

অধীনস্থদের কাছে দায়িত্বশীলদের হক

দায়িত্বশীলদের হক কী হবে বা কেমন হবে তা বুঝাতে গিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ اَطَاعَ الاِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الاِمَامَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহরই অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি নেতার অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (সুনান ইবন মাজাহ, জিহাদ, হা.নং ২৮৫৯, আ.প্র)

উল্লেখিত এ হাদীস দ্বারা অধীনস্থদের দ্বারা দায়িত্বশীলদের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং তাদের কথা মেনে নেয়ার ব্যাপারে তাকিদ এসেছে।

এবার স্বাভাবিকভাবেই অধীনস্থদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে– দায়িত্বশীল যদি তাদের মনগড়া মতবাদ বা দুনিয়াবী চিন্তা-চেতনার দিকে জ্ঞান দেয় বা এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়; তারপরও কি তাদের কথা মেনে নেব? আসুন, এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন জেনে নেই। বিশ্ব নেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ক্ষেত্রে বলেন :

اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ.

নাক-কান কর্তিত কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয়, তবুও তোমরা তার নির্দেশ শোনো ও আনুগত্য করো, যতক্ষণ সে

তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী পরিচালনা করে। (সুনান ইবন মাজাহ, জিহাদ, হা. নং-২৮৬১, আ.প্র)

দায়িত্বশীল যদি নিজে আদর্শবান হন এবং কুরআনিক আদর্শের দিকে, প্রিয় নেতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শের দিকে আহ্বান জানান তাহলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, মানার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে অনুপস্থিত ভাইদের কাছে দায়িত্বশীলের এ কথা বা আহ্বান নিজ দায়িত্বে জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোন মতদ্বন্দ্ব হলে তা দায়িত্বশীলের কাছ থেকে জেনে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের অধীনস্থরা সম্মান করবে, তাদের কথা মানার জন্যে চেষ্টা করবে কিন্তু কোনভাবেই অন্ধের ন্যায় যে কোন দায়িত্বশীলের মনগড়া বা মানবতার বিরোধী, দেশ বিরোধী, আল্লাহ বিরোধী, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরোধী কথাবার্তা বা আহ্বানে সাড়া দেবে না। আর যদি কেউ দেয় তাহলে তাদের দেখে বুঝতে হবে, হয় তারা আদর্শ জ্ঞানের অভাবে এমনটি করছে নতুবা তারাও আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরোধী জোটে দলবদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের অনুজ বা আগামী আগন্তুক সন্তানেরা তাদের অনুসরণ করা কোনভাবেই যৌক্তিক হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

سَيَلِيْ اُمُوْرَكُمْ بَعْدِىْ رِجَالٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُوْنَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ اَفْعَلُ قَالَ تَسْاَلُنِىْ يَا ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَاطَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ.

অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের নেতা হবে, যারা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদ'আতের অনুসরণ করবে এবং নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাদের (যুগ) পাই, তবে কী করবো? তিনি বলেন : হে উম্মু আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কী করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচরণ করবে, তার আনুগত্য করা যাবে না। (সুনান ইবন মাজাহ, জিহাদ, হা. নং-২৮৬৫, আ.প্র)

সরকার প্রধানের কাছে দেশবাসীর হক

দেশের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জনগণের ভাল-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখার মানসে, সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোন দেশে সরকার প্রধান নির্বাচন করা হয়। যার প্রধান কাজ হচ্ছে এ

পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, রিযকদাতা, পালনকর্তা, শাসক ও বিধাতার ঘোষণা অনুযায়ী অন্তত তাঁর আয়ত্তাধীন সীমানায় বসবাসরত জনগণের হক বা অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শাসক নয় সেবক হিসেবে কাজ করা। আর তাহলেই শাসক ও শাসিতের মাঝে গড়ে উঠবে সুসম্পর্ক, দূর হবে বিচ্ছেদের দেয়াল এবং সরকার প্রধান যা-যা করবেন তা হবে জনগণের জন্য কল্যাণমূলক।

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান

আল্লাহর আকাশের নিচে এই ভূখণ্ডে যে শিশুরা প্রতি মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করছে তাদের থেকে শুরু করে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাভাবিক জীবনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা সরকার প্রধানের কাছে জনগণের হক। এখানে নাগরিক বলতে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ আরো অন্যান্য মতাবলম্বীর ধনী-গরীব নির্বিশেষে গাছ তলায় যে মানুষটি ঘুমিয়ে রাত যাপন করে তারও বেঁচে থাকা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য। মূলতঃ জনগণকে তাদের নিজেদের জীবনসহ অন্য মানুষের জীবন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পবিত্র আমানত তা বুঝিয়ে তাদের মাঝে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারলেই তারা মারামারি, কাটাকাটি বা হত্যার মত জঘন্য খারাপ কাজে জড়াবে না। সেই সাথে তাদের মাঝে প্রচার করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে মহান আল্লাহর এ বাণী :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

"নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে কেউ হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীর প্রাণ রক্ষা করলো।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৩২)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ.

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৩)

এখানে যথার্থ কারণ (সংগত কারণে হত্যা) বলতে ছয়টি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে :

❖ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করা (কিসাস)।

❖ জিহাদের ময়দানে সত্য দীনের পথে প্রতিবন্ধকতাকারীদের হত্যা।
❖ ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পতনের চেষ্টায় লিপ্তদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।
❖ বিবাহিত নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা।
❖ ধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা।
❖ ডাকাতি, রাজপথে রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমের সূরা আন'আম-এর ১৫২ নং আয়াত, সূরা আল-বাকারা-এর ৬৮ নং আয়াতে এতদসম্পর্কিত নির্দেশগুলো প্রদান করেছেন।

মানব ইতিহাসের প্রাথমিক যুগেই মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের নিরাপত্তা বিধানের এ নীতি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। আর মানুষকেও মানুষের অধিকার সম্পর্কে করেছেন অবহিত।

ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান

দেশ পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের বিশাল যোগান যারা দেয় তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণী অন্যতম। তাছাড়া জনগণের বেঁচে থাকা ও সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে সকল প্রকার চাহিদা পূরণ ও ভোগ ব্যবহারের উপাদান যারা হাতের নাগালে এনে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আবার জনকল্যাণে, জনগণের জীবন রক্ষার্থে, হালাল-হারাম পণ্য ভেদে ব্যবসার অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান করাও সরকারের কর্তব্য। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশে প্রকাশ্যে যেখানে সেখানে হারাম পণ্যের ব্যবসা তথা অবাধে বেচাকেনা করা মানে জনগণের সর্বনাশ করা। আর তাই জনগণের হক হলো জনগণের প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের ব্যবসাকে সহজসাধ্য করার সর্বতো ব্যবস্থা করে দেয়া, হারাম বা অস্বাস্থ্যকর জনস্বাস্থ্য বিরোধী সকল ধরনের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে দেয়া, ব্যবসায়ীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা। ব্যবসায়ী অপহরণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানির কবল থেকে সকল ব্যবসায়ীদেরকে হিফাযত করার প্রচেষ্টা চালানো। যে সকল পণ্য দেশে উৎপাদন হচ্ছে না বা উৎপাদন হলেও চাহিদা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না তা বিদেশ থেকে আমদানী করার ক্ষেত্রে আমদানী নীতি সহজ করা এবং ব্যবসায়ীদের সার্বিক দিকে খেয়াল রাখা।

মেধা মূল্যায়নের নিশ্চয়তা

মেধা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি বিশেষ দান। এ

মেধা দিয়েই মানুষ আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে নানা সাজে সাজানোর চেষ্টা করছে। এ দেশেও এমন অনেক মেধাবী মানুষ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো এ মেধা ও মেধাবীদের সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার কারণে তারা আজ তাদের মেধা দিয়ে গড়ে দিচ্ছে অন্যদের। যাকে আমরা "ব্রেন ড্রেন" বা মেধা পাচার বলে থাকি। দেশের মেধাবী এ শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলোকে যদি সরকার উদ্যোগ নিয়ে তাদের মেধার বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা করত এবং দেশের প্রয়োজনে কাজে লাগাতো তাহলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে খুব দ্রুত উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারত।

দেশের কৃতি ও মেধাবী মানুষগুলোকে দেশের উন্নয়নে মেধা খাটানোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এটা আজ সরকারের কাছে সমগ্র জনগণের হক।

বেকার সমস্যা লাঘবে নতুন পলিসি ও উদ্যোগ গ্রহণ

'বে' অর্থ নেই, 'কার' অর্থ কাজ সুতরাং 'বেকার' অর্থ 'নেই যার কাজ' বা 'যার কাজ নেই'। এমন লোক বর্তমানে এ দেশে অনেক। এবার প্রশ্ন যার বা যাদের কাজ নেই সরকার তাদের জন্য কী করতে পারে? সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান তথা ইন্ডাষ্ট্রি তৈরি করে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। নতুন কর্মক্ষেত্রের যোগান বৃদ্ধি করে দেশের সমগ্র লোকজনকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মের ব্যবস্থা করতে পারে। নানাভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বহির্বিশ্বের শ্রম বাজারে শ্রমিক হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে। বেসরকারিভাবে জনগণকে সহজ শর্তে অর্থের যোগান দিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

জনগণের হক হচ্ছে সরকার প্রধান দেশের জনগণের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী কর্মের ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে সমাজে বেকার সমস্যা প্রকট হলে লোকজন কর্মহীন হওয়ায় তাদের মেধা ও চিন্তা-চেতনাকে কর্ম অনুপযোগী করে তোলে। পরিণামে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়। মানুষ কর্মের অভাবে স্বভাবে অমানুষ হওয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে, যা সুষ্ঠু সুন্দর শান্তিময় পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হক

অন্যায় মানেই যে কোন ব্যক্তির হক হরণ। আর তাই জনগণের হক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে নাগরিকদের অন্যায় আচরণকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা থাকা উচিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ। দেশে অন্যায়ভাবে রাজপথে জনগণকে হত্যা করা, বিভিন্ন স্থানে ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি প্রতিহত করার চেষ্টা করা সরকারের দায়িত্ব এবং এটি জনগণের হকের আওতাভুক্ত।

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানের হক

রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যদি যোগ্যতা থাকে তাহলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থে কথা বলা, সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করা, পর্যালোচনা করে তার ফলাফল ব্যক্ত করা রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তেমনি আবার রাষ্ট্রের স্পর্শকাতর বিষয়ে তথ্য গোপন রেখে পলিসি গ্রহণে সরকারকে সাহায্য করাও নাগরিক হিসেবে কর্তব্য।

পানি, বিদ্যুৎ গ্যাসসহ সকল জনগুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের সেবা সকলের জন্য নিশ্চিতকরণ

পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতি মূল্যবান সম্পদ। সভ্য নাগরিক হিসেবে সভ্যতার সাথে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ও জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এগুলোর বিকল্প নেই। এক সময় পানির অপর নাম জীবন বলা হতো। আর আজ বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় জীবনকে যথাযথভাবে সাজাতে এবং প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পানির সাথে সাথে বিদ্যুৎ ও গ্যাসকে জীবনের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে এগুলোর অপর নামও জীবন বললে ভুল হওয়ার কথা নয়। জীবনের একটি অংশ হিসেবে তার সেবা সকলের চাওয়াই স্বাভাবিক। আর এ চাওয়া অনুযায়ী পাওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতাভুক্ত। এ জন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এর অভাব পূরণে তথা জনগণের হক আদায়করণের লক্ষ্যে সেখানকার জনগোষ্ঠী সংঘটিত উপায়ে সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে সরকারের কাছে এসব কিছুর দাবি পেশ করে থাকে। সরকার দিতে টালবাহানা করলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাধে। কাজেই সরকারের কর্তব্য জনগণের স্বার্থে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, অপচয় রোধে নানা বিজ্ঞাপন প্রচার এবং জনগণের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আরো প্লান্ট স্থাপন ও উৎপাদনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল রেখে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের ঘাটতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা।

রাষ্ট্রের অর্থ উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয়

রাষ্ট্রের অর্থ মানে জনগণের অর্থ। আর জনগণের অর্থ মানে দেশের সামষ্টিক উন্নয়ন। বিশ্বের যে কোন দেশে ফুটপাত, গাছতলা-বটতলা এভাবে সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাসরত লোকজন থেকে শুরু করে রাস্তার ভিক্ষুক, কুলি, দিনমজুরসহ সকলের অর্থেই গড়ে উঠে রাষ্ট্রের অর্থ তহবিল। উদ্দেশ্য জনকল্যাণ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক খাত তথা সকলের প্রয়োজনে এ

অর্থ ব্যয় করা সকলের দাবি। এখানে উন্নয়নমূলক খাত বলতে যে কোন খাতকে গুরুত্বের সাথে নেয়া যাবে না। অর্থাৎ বিনোদন কেন্দ্রের পরিচর্যা, রাস্তার মাঝপথে ডিভাইডার তৈরি ও গ্রিল দেয়া, ফুলের টবে ফুল গাছ লাগানো, লেকের উন্নয়ন, লেকের উপর ঝুলন্ত ব্রিজ তৈরি, উদ্যানের নাম পরিবর্তন আর লাইটিংকরণ ইত্যাদিও হয়তো উন্নয়নমূলক। কিন্তু তা শহর এলাকায় বসবাসরত কতিপয় জনগোষ্ঠীর জন্য হওয়ায় তার পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করা কতটা যুক্তিযুক্ত তা রাষ্ট্র পরিচালককে ভেবে দেখার দাবি পেশ করে। পক্ষান্তরে দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন এলাকায় ব্রিজ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরিকরণ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সার ও বীজ সংকট দূরীভূতকরণ, সকলের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, অত্যাধুনিক মানের শিল্প-কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা লাঘব ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণসহ সকল জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় করা হলো জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক খাত।

সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া

রাষ্ট্রের প্রত্যেক উন্নয়নমূলক কাজে নাগরিকগণ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সমান ভিত্তিতে পাওয়ার হকদার। আল-কুরআনুল কারীম মানুষকে জন্মগতভাবে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে;

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ.

"হে মানব জাতি! আমরা তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্র ও বংশে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

উল্লেখিত আয়াতের মর্মকথা বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখেও উচ্চারিত হয়েছিল। সেদিন তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব। কোন কালোর উপর সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন সাদার উপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব; তবে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া।

আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই

বাণীসমূহের আলোকে আদর্শ রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সমস্ত মানুষ আইনের চোখে সমান মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক জীবনেও তাদের মধ্যে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের কোন মানদণ্ড নেই। রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে এক সমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আর ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলিমদেরকে পরস্পর ভাই-ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

ন্যায়বিচার পাওয়া

নাগরিক মাত্রই দেশের বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার পাওয়ার হকদার। অর্থাৎ যালিমের শাস্তি মজলুমের মুক্তি এটা স্বাভাবিক। এটাই উভয়পক্ষের যথার্থ পাওনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুবিচারের পতাকাবাহী এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষী হও, পক্ষদ্বয় বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্তির অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে স্মরণ রাখ, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর রাখেন।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৩৫)

উল্লেখিত আয়াতে মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা শুধু ন্যায়বিচারের অর্থই স্পষ্ট তুলে ধরেননি, বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্তাবলীও উল্লেখ করেছেন। এর কোন একটি শর্ত বাদ পড়লে ন্যায়বিচার আর ন্যায়বিচার থাকবে না, তা অবিচারে পরিণত হবে।

শর্তগুলো নিম্নরূপ :

০১. ন্যায়বিচার শুধু প্রতিষ্ঠাই করবে না, বরং ন্যায়বিচারের পতাকাও সমুন্নত রাখবে। যেখানেই ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হবে সেখানে তো সমুন্নত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। এ অবিচারের প্রতিবাদ করতে হবে।

০২. আদালতে কোন পক্ষের হার-জিতের জন্য সাক্ষ্য নয় বরং শুধু আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সাক্ষ্য দিতে হবে। কেননা সত্য সাক্ষ্য ব্যতিরেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সত্য সাক্ষ্য দিলে যদি নিজেদের স্বার্থে আঘাত আসে অথবা পিতা-মাতার প্রতিকূলে যায় কিংবা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থে আঘাত লাগে তবুও তা পরোয়া করবে না।

০৩. সাক্ষ্যদানের সময় আত্মীয় সম্পর্ক ব্যতীত মামলার উভয়পক্ষের সামাজিক মর্যাদা এবং তাদের আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। কেননা কারও জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া ঠিক নয়। সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে বিপরীত নজীর স্থাপন করা হিতাকাঙ্ক্ষা নয়, বরং তা স্পষ্ট যুলুম ও দ্বন্দ্ব-কলহ ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর।

০৪. সাক্ষ্য দানের সময় প্রকৃত ঘটনা যথার্থভাবে বর্ণনা করা উভয়পক্ষের হক। এতে নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাকে মিশ্রিত করা ঠিক নয়। কেননা প্রবৃত্তি ঘটনার প্রকৃতরূপ বিকৃত করে দেয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণকারী (বিচারক) ঘটনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায় না– এতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধাগ্রস্ত হয়।

০৫. কেউ যদি কোন পক্ষকে শাস্তি থেকে মুক্তি কিংবা অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, তথ্য গোপন করে, নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করে এবং নির্ভেজাল ও নিরপেক্ষ সাক্ষ্য থেকে পিছু হটে গিয়ে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অবিচার ও যুলুম করে তাহলে তাদের মনে রাখা উচিত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকলের গোপন খবর রাখেন এবং তাঁর সামনে হাজির হলে নিজেদের কৃত অপরাধের শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

সুতরাং আদালতের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, সরকার ও অন্যান্য পক্ষের যাবতীয় প্রভাব থেকে বিচারককে মুক্ত থাকা যাতে তার উপর কোন প্রভাব কার্যকর না হয়। সেই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচারকার্য অনুষ্ঠানের সময় তার পরিপূর্ণ হক আদায় করার তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَى اَلاَّ تَعْدِلُوْا. اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى.

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এ তো তাকওয়ার নিকটতর।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ০৮)

اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالعَدْلِ.

"তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৫৮)

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"তুমি তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করলে সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৪২)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচারকদেরকে বিচার করার ক্ষেত্রে ন্যায় রায় দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও বর্তমান প্রেক্ষপটে হত-দরিদ্র মানুষেরা অর্থের অভাবে আদালতে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ন্যায় বিচার পায় না। কিন্তু যারা মামলা চালাতে সক্ষম নয় বা দেশের দরিদ্র জনগণের পক্ষে দেশের সরকার যদি রাজকোষের অর্থ থেকে মামলার ব্যয়ভার নির্বাহ করে তাহলে দেশে অন্যায় আচরণ ও হত্যা সন্ত্রাস কমে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আর দরিদ্র জনগোষ্ঠী এমন বিচার পাওয়া তাদের হক। যদি এটি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে "বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে" এমন প্রবাদ প্রবচন আর শোনা যাবে না।

নিয়মতান্ত্রিক সভা-সমাবেশ করার সুযোগ

রাষ্ট্রে ন্যায়ের পক্ষে জনমত গঠন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে নাগরিকগণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সভা-সমাবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। এটা রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর হক। আল-কুরআনুল কারীমে মুসলিম জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই একটি আয়াতেই পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা ন্যায়ের আদেশ দেবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১১০)

এ হচ্ছে সমগ্র উম্মাতের সামষ্টিক দায়িত্ব। কিন্তু সমস্ত মুসলিম যদি সম্মিলিতভাবে একাগ্রচিত্তে মনোযোগের সাথে আগ্রহ ভরে এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে অন্ততঃ তাদের মধ্যে এমন একটি প্রাণবন্ত ও দায়িত্বশীল দল বর্তমান থাকা উচিত যারা এই কাজের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করে দেবে। তাদের ইঙ্গিত প্রদান করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ

করবে।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১০৪)

যদি কতিপয় লোক ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের কোন সুশৃঙ্খল সংগঠনের সদস্য করে নিতে চায় এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে তারা সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা অথবা জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে তারা তা পারবে। সেই সাথে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ, অভিযোগ খণ্ডন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন এবং সেই সংগঠনের সভা-সমাবেশের উপরও এই নীতি কার্যকর হবে। কখনোই দেশে বিশেষ কোন সংগঠনের জন্য একচোখা নীতি বা পক্ষপাতমূলক আচরণ কোন সরকারের জন্য শুভ নয়। যদি এমনটি করে তাহলে এখানেই হবে হক হরণ বা অধিকার হরণ– যা দুঃখজনক।

সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

সরকারের ধারণা, নেতৃত্বের পবিত্রতা এবং ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রে সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ দেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সরকার প্রধানকেই হতে হবে যথেষ্ট তৎপর এবং সচেতন। সরকার প্রধান যদি নিজেদের জবাবদিহিতা নেই মনে করে তাহলে সে রাষ্ট্রে নাগরিকদের মাঝে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভব নয়। আর তাই একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে সকলের মাঝে জবাবদিহিতার মনোভাব গড়ে দিতে হবে সবকিছুর আগে।

হাসীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه وَهُوْ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةِ عَلى بَيْتِ بعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের রাখালী (শাসন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম জনগণের রাখাল (শাসক বা নেতা), সে তার শাসিত অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের রাখাল বা অভিভাবক। সুতরাং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানের রাখাল (রক্ষণাবেক্ষণকারিণী)। সে

তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস তার মালিকের অর্থ-সম্পদের রাখাল (পাহারাদার)। সুতরাং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা সবাই রাখাল (শাসক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রাখালী (দায়িত্ব ও কর্তব্য) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) হা. নং-৪৫৭৬, বিআইসি)

আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা

সর্বপ্রথম জবাবদিহিতা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে– যা আখিরাতে দেয়া বাধ্যতামূলক। মহাজ্ঞানী সর্বদ্রষ্টা, সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মহান সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন আখিরাতে সকলের কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। আর দুনিয়ার জীবনেও তিনি মানুষের অতি নিকটে অবস্থান করছেন। আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ به نَفْسُه وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

"আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং আমি জানি তার প্রবৃত্তি তাকে যে কু-মন্ত্রণা দেয় তা, আর আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৬)

তারপরও মানুষ যা-যা করে তা লিখে রাখার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফিরিশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন :

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"স্মরণ রাখ! যখন দুই ফিরিশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কাজ-কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন প্রহরী তার কাছে উপস্থিত থাকে।" (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৭-১৮)

সুতরাং জীবন ও মৃত্যুর মালিক যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই এবং তার কাছে ফিরে যেয়ে জবাবও দিতে হবে তখন দুনিয়ার জিন্দেগীতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِيْ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ. يَوْمَ تَشَقَّقُ الاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرًا.

"আমিই জীবন দান করি এবং আমিই মৃত্যু দেই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। যে দিন জমিন তাদের উপর বিদীর্ণ হবে, সেদিন তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে। এটা আমার পক্ষে অতি সহজ।" (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৪৩-৪৪)

সেদিন প্রকাশ্যে বা নির্জনে যে যাই করুক না কেন তার জবাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দিতেই হবে। যদিও দুনিয়ার আদালতে মানুষ অনেক কিছু গোপন করে রাখতে পারে, না বলে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর আদালতে এমনটি করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"যখন তাদেরকে বলা হয়, যা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।" (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৪৫)

আখিরাতের জবাবদিহিতার এই অনুভূতি এমন এক অভ্যন্তরীণ নিয়ামক শক্তি যা সর্বতোভাবে মানুষের সাথেই লেগে থাকে। নির্জনে ও প্রকাশ্যে কোথাও সে তার নাগাল ছাড়ে না এবং সর্বক্ষণ তার প্রকৃতি ও স্বভাবে আত্মসমালোচনার কথা জাগ্রত রাখে। এই অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ধারণায় দুনিয়ার যদি কোন বাহ্যিক জবাবদিহিতা মানুষের সামনে নাও থাকে তবুও পথভ্রষ্ট হওয়া এবং যুলুম ও অন্যায়ের পথে চলার কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। এই জবাবদিহিতার অনুভূতির অপরিহার্য ফল এই ছিল যে, আবু বাকর (রা)-এর খিলাফতকালে 'উমার ফারূক (রা) প্রধান বিচারপতির আসনে দুই বছর নিয়োজিত ছিলেন। অথচ তার আদালতে একটি মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়নি। কেননা সরকার প্রধানসহ সমাজের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এমন নিখুঁতভাবে পালন করেছিলেন যার ফলে কোথাও কারোর হক বা অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠেনি।

আদালতের মাধ্যমে জবাবদিহিতা

আদালতের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল নাগরিকের জবাবদিহিতার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে আদালত সে আদালতের ঊর্ধ্বে সরকার নয়। সুতরাং সরকার যদি রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাষ্ট্রের পতাকা সমুন্নত থাকবে না এমন কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাকে সচেতন করে দেয়া এবং প্রয়োজনে প্রতিহত করে দেয়ার দায়িত্ব আদালতের উপর বর্তায়। আদালত এক্ষেত্রে যা সত্য হকপূর্ণ তা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেইফ গার্ড হিসেবে সরকার ও জনগণের হককে প্রতিষ্ঠা করায় সচেষ্ট থাকবে।

কেবিনেট সভার সদস্যদের কাছে জবাবদিহিতা

সরকার একক সিদ্ধান্তে কোন কাজ করেন না। আর কোন কাজ করলে তা যদি

জনগণের বিপক্ষে যাবে বলে মনে হয় তাহলে কেবিনেট সভার ... ও সচিবসহ যাদের মাধ্যমে কাজটি করানো হবে তাদের দায়িত্ব হলো সরকারকে তা অবহিত করে দেয়া। কেননা কেবিনেট সভার সদস্যগণ হচ্ছে জাতির মগজ এবং চক্ষু. তাদের সতর্ক দৃষ্টি সরকার প্রধানকে যেকোন ধরনের ক্ষতি থেকে এবং যে কোন দেশ বিরোধী ফাঁদে পা দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। মূলতঃ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক বিশেষ করে মুসলিমদের দায়িত্ব এবং আল্লাহ প্রদত্ত কর্তব্য এই যে, তারা সত্য কথা বলবে, কল্যাণের বিস্তার ঘটাবে, অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে এবং নিজেদের সমাজদেহকে ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাবে। আর এই অবশ্যই পালনীয় কাজটি সর্বাপেক্ষা গুরুতরভাবে কেবিনেট সভার সদস্যদের উপর বর্তায়। কেননা কেবিনেট সভার আয়োজনই করা হয়ে থাকে সরকারের করণীয় নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের ফর্মূলা ঠিক করার জন্য। আর তাইতো মহান আল্লাহ বলেন :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"আর সৎকাজে ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে একে অন্যের সাহায্য করবে না।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ০২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ৭১)

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ।" (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, হা. নং-২১২০, বিআইসি)

জনগণের কাছে জবাবদিহিতা

জনগণ একটি রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক। এ জনগণই রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে

সরকার প্রধান নির্বাচন করে, বিভিন্নভাবে সকলে মিলে অর্থ দিয়ে সরকারের অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলে। আর তাই এ অর্থ সরকার কখন, কোথায়, কী পরিমাণ ব্যয় করছে, তা রাষ্ট্রের বর্তমান জনগোষ্ঠীর জন্য কতটুকু কল্যাণকর হচ্ছে, আর ভবিষ্যতের জনগোষ্ঠী এ থেকে কতটুকু সুফল পাবে; এ সম্পর্কে চিন্তা করা, মতামত পোষণ করা এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর না হলে বিরোধিতা করা জনগণের অধিকার। কেননা একটি কথা সত্য, দেশের যে কোন নাগরিকের জন্য দু'টি জিনিস বাধ্যতামূলক তা হলো : ০১. ডেথ বা মৃত্যু, ০২. ট্যাক্স বা কর। অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যেমন বাঁচার কোন সুযোগ নেই তেমনি একজন মানুষ যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হোক না কেন তার ট্যাক্স প্রদান না করে কোন উপায় নেই। একদম ফুটপাতে পাগলের বেশে মানুষের কাছে হাত পেতে খুঁজে খাচ্ছে যে মানুষটি সেও খাবার খেতে যেয়ে ভ্যাট নামে সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করে থাকে। আর এমতাবস্থায় জনগণের অর্থ থেকে বেতন ভাতাসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এমনকি রাস্তায় চলার ক্ষেত্রেও নিরন্তর গতির সাথে ছুটে চলার ব্যবস্থা করে দেয়ার পরও সরকার জনগণের পক্ষে যদি কাজ না করে তাহলে সরকার যেমনি করে জনগণের অধিকার হরণের দায়ে দায়গ্রস্ত হবেন তেমনি যারা তার পাশে থাকেন তারাও সরকারকে সচেতন করে না দেয়ায় হক হরণের দায়ে দায়গ্রস্ত হবেন। সুতরাং জনগুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিষ্ঠান বা জনপ্রতিনিধি হয়ে কেউ যদি জনগণের অর্পিত দায়িত্ব শপথ বা ওয়াদামত পালন না করে তাহলে সে বা তারা দায়গ্রস্ত হবে। আর তাইতো ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বাকর সিদ্দীক (রা) তাঁর খিলাফতকালে বাই'আত অনুষ্ঠানের পরে জনতার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ভাষণে বলেছিলেন :

"তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে পারি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারি।" (মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কল, আবু বকর, উর্দূ অনু, লাহোর, ১৯৭৩. পৃষ্ঠা ৮৬)

আবু বকর (রা) আরো বলেছেন : "যিনি শাসক হবেন তাকে সর্বাপেক্ষা কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি শাসক নয় তাকে সহজতর হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তার জন্য সহজতর হিসাবের ভয় থাকবে। কেননা মুসলিমদের উপর যুলুম-নির্যাতনের সর্বাপেক্ষা বেশি সুযোগ ঘটে শাসকদের বেলায় এবং যারা মুসলিমদের উপর যুলুম করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা

করে।" (কানযুল উম্মাল, খ. ৫, হা. নং ২৫০৫)
কাজেই শাসক বা সরকার প্রধানকেই হওয়া চাই জনগোষ্ঠীর হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সোচ্চার। আর তা না হলে শাসক থাকবে হয়ত কিন্তু জনগণ যার যেভাবে সম্ভব সেভাবে হক হরণ করে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সকলে মিলে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে, যা কোন আদর্শ সরকার প্রধান সম্বলিত দেশের জন্য কাম্য নয়।

প্রত্যেক কাজ সর্বস্তরের স্বার্থে করা

সরকার প্রধানের কাছে জনগণের হক হলো যিনি বা যারা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন তারা যখন যা-যা করবেন সবকিছু সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যারা বিজ্ঞ-জ্ঞানী আছেন তাদের সাথে পরামর্শ করে করে তাদের দেয়া সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে করবেন। এতে সরকার প্রধান যে সমস্ত কাজ বাস্তবায়ন করবেন এবং বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবেন তা হবে বর্তমান ও আগন্তুকদের জন্য কল্যাণকর। আর তাহলেই নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর সরকার পরিবর্তন হলেও পরবর্তী নির্বাচিত সরকার আগের সরকারের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করবেন। এতে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা নষ্ট বা অহেতুক অপচয় হওয়ার সুযোগ থাকবে না।
অন্যদিকে বহিঃবিশ্বের সাথে যে কোন চুক্তি সম্পাদন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য সম্পর্ক, যোগাযোগের ধরনসহ সামগ্রিক চুক্তি দেশের স্বার্থে করা উচিত। চুক্তি কারক বা সরকার প্রধানকে মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে যেমন দলের স্বার্থ বড় তেমনি দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়। সুতরাং দেশের স্বার্থ ভূলুণ্ঠন হবে এমন কোন কাজ বা সিদ্ধান্তের জন্য সরকার প্রধান দায়ী থাকবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান ও আগতদের জন্য ভিশন সেটআপকরণ

বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের অদৃশ্যমান অগ্রগতিকে চোখের সামনে তুলে ধরে সরকার প্রধান যে কোন কল্যাণধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা জনগণের হক। সরকার প্রধানের কাছে অবশ্যই এটা পরিষ্কার থাকা উচিত– দেশের উন্নয়ন কতটুকু হচ্ছে আর আগামীতে দেশ কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! ভিশন টার্গেট সেটআপ না করে হ-য-ব-র-ল ভাবে দেশ পরিচালনা করতে চাইলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন না হয়ে অনুন্নয়ন হবে একথা বলা বোধহয় এ একবিংশ শতাব্দীতে আর দুরূহ নয়। কেননা একটি কথা আমরা সকলেই জানি, সেটি হলো

পরিকল্পনা উন্নয়নের রোডম্যাপ। কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে দেশের যে কোন উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সরকারের কাছে জনগণের হক বা অধিকার।

শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্তকরণ

শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। জাতি সত্তার উন্নয়নে দেশের পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরা আর আগামীদের আদর্শ ভূমি উপহার দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার বিকল্প নেই। আর তাই দেশের জনগোষ্ঠীকে উচ্চ শিক্ষিত করার প্রত্যয়ে শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া সরকার প্রধানের দায়িত্ব। অথচ অপ্রিয় হলেও সত্য, যে শিক্ষার এত গুরুত্ব বাংলাদেশে সরকারিভাবেই সেই শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজেহাল– এটা এ জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্য! এত সরকার আসল আর গেল কিন্তু আজও জাতি কী শিখবে, কী শিখছে আর কী শিখা প্রয়োজন তার সঠিক কোন দিশা পায়নি। সেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কয়েকবার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। রিপোর্টও পেশ হয়েছে কিন্তু যথাযথ ব্যক্তি ও তাদের সংকীর্ণতার জন্যে জাতি আজও একটি পরিপূর্ণ রিপোর্ট পায়নি। ফলে যা হবার তাই। একে তো শিক্ষার হার কম। আরেক দিকে কেউ কেউ হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীই অর্জন করছে কিন্তু আদর্শ মানুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। আর তাই আজ চারদিকে দুর্নীতি, পেট নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে দেশের অর্থনীতি ও সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে বার-বার খেসারত দিতে হচ্ছে যার জবাব কোন সরকারই দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সর্বশেষ ২০০৮ সালে নবম শ্রেণীর সিলেবাস নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হলো তাতে দেশের দরিদ্র মানুষগুলো যারা খাবার কিনে খেতেই হিমশিম খাচ্ছে তারা হয়তো অনেক কষ্ট করে শিক্ষার্থীদের বইগুলো ক্রয় করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা চার মাস পড়ালেখা করেছে কিন্তু এরপর চার মাসের শেষে এসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে নতুন এ পদ্ধতিতে বাংলা প্রথম পত্র ও ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা হবে বাকী বিষয়গুলো পূর্বের ন্যায় হবে। এতে এই চার মাস পর শিক্ষার্থীরা পুনরায় বই কিনতে হয়েছে। এই যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কোটি কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার দায়ভার তো অবশ্যই সরকারের কাঁধে পড়ে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্টার্জিত এ অর্থ, শিক্ষার্থীদের গত চার মাস ধরে পড়া, তাদের মন-মানসিকতা ইত্যাদি সব তো আজ বৃথা। সুতরাং সরকার যদি এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন তাহলে এমন ব্যয় বা অযথা

হয়রানি থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি নিশ্চিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

যদি কোনো বান্দাহকে আল্লাহ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের অধিকার হরণ করে এবং খেয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হা. নং-২৭১, বিআইসি)

আর তাইতো আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, অর্ধ পৃথিবীর খলীফা 'উমার ফারুক (রা)-এর অবস্থা ছিল এই : "ফোরাত নদীর কূলে যদি একটা ছাগল ছানাও না খেয়ে মারা যায়, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, এজন্য আল্লাহ আমাকে অভিযুক্ত করবেন।" (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, নং-২৫১২)

কাজেই এমন সরকার পাওয়ার জন্যে আজ জনগণকেই সোচ্চার হতে হবে। নির্বাচন করার চেষ্টা করতে হবে এমন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শের আলোকে নিজেদেরকে গড়তে চায়, যাদের কাছে জনগণের প্রত্যেকটা জিনিস আমানত হিসেবে রক্ষা পাবে। নতুবা জনগণের নির্বাচন ভুল হওয়ার কারণে যেমনি করে অসৎ সরকার তাদের ঘাড়ে চড়ে বসে তাদের অর্থ নিজেদের নাম ফুটানো আর স্বার্থে ব্যয় করতে উদ্ধত হবে তেমনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদের উপর শাসিত এলাকা বা রাষ্ট্রের জনগণের উপরে নেমে আসবে লানতপূর্ণ শাস্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا.

যখন তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোক তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ধনবানরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে, তখন ভূতলের তুলনায় ভূপৃষ্ঠই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোক তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের সম্পদশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী নারীদের উপর ন্যস্ত করা হবে তখন ভূতলকেই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম করা হবে (অর্থাৎ

জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম)। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, হা. নং-২২১২, বিআইসি)

দেশবাসীর কাছে সরকার প্রধানের হক

সরকার প্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনগণের সেবক অন্য অর্থে জনপ্রতিনিধি। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকার প্রধান দেশের পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরে জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে সেতু বন্ধন গড়ার কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখেন। তাইতো সরকার প্রধানের কাছে জনগণের যেমন হক বা অধিকার রয়েছে তেমনি জনগণের কাছে রয়েছে সরকার প্রধানের অনেক দাবি, অনেক হক।

দেশ পরিচালনায় সহযোগিতার মনোভাব পোষণ

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হোন সরকার। এবার যে সংগঠন বা দল থেকেই তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকুন না কেন যখনই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন তিনি আর সেই সংগঠনের একক সরকার নন, তিনি তখন সমগ্র দেশবাসীর সরকার; সকলের সরকার। এ সত্য বিষয়টি সরকারকে যেমন কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করতে হবে তেমনি সকল জনগণ তথা বিরোধী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সরকারের নিজ দলের সবাইকেও এটি মেনে নিতে হবে। অন্যথায় দ্বন্দ্ব যে নিশ্চিত এবং এ সমস্যাই আজ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে প্রকট আকার ধারণ করে আছে। আর এ জন্যে ব্যক্তির উন্নয়ন স্থবির না হলেও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উন্নয়ন যে স্থবির ও গতিহীন তা বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে সহজেই প্রতীয়মান।

সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন

সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার প্রয়োজনে দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারের প্রথম ও প্রধান হক হলো– যেহেতু সরকার সর্বাধিক জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই সমগ্র জনগোষ্ঠী তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে তার নেয়া সকল সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করবে এবং যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রদান করবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের পরেই রাষ্ট্র পরিচালকের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের দায়িত্বশীলদের।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৫৯)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ.

যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, যে আমীরের অবাধ্য হল সে আমার অবাধ্য হল। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব] হা. নং-৪৫৯৭, বিআইসি)

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى اَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ.

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নিয়োগকৃত) শাসকের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৫৯৯, বিআইসি)

সরকারের প্রতি সমর্থন পোষণ

দেশের সরকার প্রধান যদি মহান স্রষ্টা সকল কিছুর মালিক রাজাধিরাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতি আদর্শ বিরোধী কোন কথা বা কাজ করার নির্দেশ দেয় তাহলে তা কখনোই মানা যাবে না, মুসলিম দেশে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে মুসলিমদের ঈমানী বা বিশ্বাসে আঘাত করবে আর সরকার ক্ষমতায় থেকে তার বিচার বা প্রতিবাদ করবে না এটা সকল মুসলিমদের হক হরণ করারই শামিল। সরকার মুসলিম ধর্মাবলম্বী বা অন্য কোন মতাবলম্বী যাই হোক না কেন কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি উচ্চারণ করলে সরকারের উচিত অবশ্যই তা প্রতিহত করা, দ্রুত দেশের জনগণকে সান্ত্বনা দেয়া, আজ বিশ্বের এমন কোন স্থান নেই যেখানে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিপক্ষে কথা বললে প্রতিবাদ আসে না; প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠে না। আর তাই এমন ক্ষেত্রে সরকারের প্রতি সমর্থন করা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতার ধর্ম ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ স্বার্থকে সামনে রেখে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত কোন নাগরিক বা গোষ্ঠী বা দলের বিরুদ্ধে গেলেও তার প্রতি বিদ্রোহ করা ইসলাম সমর্থন করে না। সেই সাথে

সরকারের বিরোধিতা না করাই জনগণের কাছে সরকারের হক। প্রিয়নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

সুখে-দুঃখে, খুশীতে-অখুশীতে এবং যদিও অন্য কাউকে তোমার উপর প্রাধান্য দেয়া হয় তবুও সর্বাবস্থায় আমীরের নির্দেশ শোনা এবং তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৬০৪, বিআইসি)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ.

মুসলিমের উপর অপরিহার্য কর্তব্য শাসকের কথা শোনা এবং আনুগত্য করা– চাই তা তার মনঃপুত হোক বা না হোক। তবে যদি গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়া হয় (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। যদি গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৬১৩, বিআইসি)

তারপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরকারকে লক্ষ্য করে বলেন :

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ.

ইমাম বা নেতা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং (দেশ ও জাতিকে শত্রু থেকে) নিরাপদে রাখা হয়। যদি সে আল্লাহভীতির আদেশ করে এবং ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করে তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। যদি সে এর বিপরীত আদেশ করে তাহলে তাকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৬২১, বিআইসি)

সরকারের নির্যাতন ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ ও জনমত গঠন

দেশের সরকার যদি নির্যাতন ও স্বজনপ্রীতি করে তবে ধৈর্যধারণ করে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে হবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করা, জনগণের কপালে জঙ্গীবাদ আর সন্ত্রাসবাদের কালিমা লেপন করে দেয়া, হত্যা করার লক্ষ্যে গ্রেনেড ও বোমা হামলা করা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

আলকামা ইবন ওয়ায়েল আল-হাদরামী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইবন ইয়াযীদ আল-জুফী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নাবী! আপনার কী মত, যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যারা আমাদের থেকে তাদের হক (অধিকার) পুরাপুরি দাবি করে কিন্তু আমাদের হক প্রতিরোধ করে রাখে– এ অবস্থায় আমাদের কী করার আদেশ করেন? তার কথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ২য় বা ৩য় বার জিজ্ঞেস করল। আশআস ইবন কায়েস (রা) তাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাদের কথা শ্রবণ কর এবং তাদের আনুগত্য কর। প্রকৃতপক্ষে তাদের বোঝা তাদের উপরই চেপে বসবে। আর তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর চেপে বসবে।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৬৩১, বিআইসি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

তাঁদের (শাসকদের) কথা (বা আদেশ) শ্রবণ কর এবং তাঁদের আনুগত্য কর। তাদের বোঝা তাদের ওপরই চাপবে এবং তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর চাপবে (অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দায়ী)। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমরাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা. নং-৪৬৩২, বিআইসি)

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا مَاتَ فَمِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে, তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় এবং এ অবস্থায় মারা যায়– এটা জাহেলী মৃত্যু বলে গণ্য হয়। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ [প্রশাসন ও নেতৃত্ব], হা.নং-৪৬৩৯, বিআইসি)

অনর্থক সরকারের দোষ-ত্রুটি প্রচার না করা

জনগণের কাছে সরকারের হক হলো যখন তখন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সরকারের দোষ-ত্রুটি প্রচার না করা। কারণ তাতে ঐ সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিলে তার চেয়ে আরও বেশি মানবতা বিরোধী কঠোর মনোভাবের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

অন্যদিকে জনগণ যখন সরকারের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু করে দেয় তখন প্রতিবেশী বা বিদেশী অপশক্তি সরকারের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশকে দখল করে নিতে পারে অথবা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কাজেই সরকারের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কিছু কাজ খারাপ লাগলেও তার বিরুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি না করে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এরপর জনগণের ঐক্যবদ্ধ মতামত তার বিরুদ্ধে হলে সে অটোমেটিকেলি ক্ষমতা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হবে।

রাজস্ব বিভাগে কর, ভ্যাট যথাযথভাবে প্রদান করা

সম্পদশালীদের অর্জিত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত হওয়ার পর দেশের সরকার প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত আয়ের শতকরা যে অংশ বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অফিসে জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয় তাই কর বা ট্যাক্স।

যা ঐ পরিমাণ (বছর বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়) আয়ের অধিকারী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য দেয়া বাধ্যতামূলক। এবার এ কর প্রদানে কোনরূপ শৈথিল্য বা ফাঁকিবাজি করার অপচেষ্টা করা মানে একদিকে সরকারের আদেশ অমান্য করা; অন্যদিকে সরকার যেহেতু এ টাকা দিয়ে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজ করবে সেহেতু পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে কর না দেয়া মানে সমগ্র জনগণের হক হরণ করা– যা মারাত্মক অপরাধ। আর তাই দুনিয়ার অঙ্গনে সরকার যেমনি তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে নানা পলিসি গ্রহণ করে তেমনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদালতেও তারা পাকড়াও হবেন।

এখানে বলে রাখা ভাল, কেউ কেউ ট্যাক্স বা কর আদায়কে যাকাত মনে করে, ফলে তারা মনে করে যাকাত তো আদায় করছি আবার কর দিব কেন? প্রকৃতপক্ষে যাকাত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে আদায় করা প্রথমত আল্লাহর হক দ্বিতীয়ত যারা পাওয়ার উপযোগী তাদের হক। একে আদায় করা মানে আল্লাহর আদেশ তথা হক আদায় করা। আর কর বা ট্যাক্স ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে রাষ্ট্রের

সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং দেশের সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণশক্তি হওয়ায় এটি প্রথমত সরকারের হক এবং পরবর্তীতে সমগ্র জনগণের হক হিসেবেই যথার্থ। সুতরাং একটির জন্য আরেকটি রদ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং সম্পদশালীরা দু'টিই আদায় করবে।

অন্যদিকে পণ্য সামগ্রী ভোগ ও ব্যবহারকারীরা পণ্য ক্রয়ের সাথে ভ্যাট নামে পণ্যের মূল্যের অতিরিক্ত আরো যে অর্থ প্রদান করে থাকে- যা ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট সময় শেষে সরকারের নির্ধারিত অফিসে জমা দিয়ে থাকে তাও দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। কাজেই কর ও ভ্যাট প্রদানে কোনরূপ শৈথিল্য বা ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা মানে সমগ্র জনগোষ্ঠীর হক হরণ করার শামিল।

আইনবিদদের কাছে জনগণের হক

নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষকের দ্বারা শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা আইনী সহায়তা প্রদান করে থাকে তারাই হলেন আইনবিদ। সমাজের অসহায় মানুষগুলো যাদের কাছে আশ্রয় পায়; যারা তাদের অধিকার ফিরে পেতে সহায়তা করে তাদের মধ্যে আইনবিদদের ভূমিকাই প্রধান। একমাত্র আইনবিদরাই সত্যবাদী ব্যক্তিদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করে আদালতে বিচারপতির সামনে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে শোষক শ্রেণী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় হয়তো তাদের পক্ষে আইনী সহায়তা প্রদানের বিনিময়স্বরূপ তারা আইনবিদদের যথাযথ বিনিময় (টাকা-পয়সা) প্রদান করতে পারবে না। তবে মজলুমের পক্ষে হক কথা বলায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে যারা মিথ্যাকে কেন্দ্র করে দুর্বলের বিপক্ষে বা সত্যবাদীর বিপক্ষে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তারা সাময়িকভাবে সুখে-শান্তিতে আছে বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে তারা কেমন আছেন আল্লাহই ভাল জানেন। আল কুরআনুল কারীমে এমন মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস করার নজিরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ.

"তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার শাস্তি!" (সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ১৮)

মূলতঃ যে সকল আইনজীবিগণ সত্য ও সঠিক পথে থেকে হক হালাল উপার্জনের চেষ্টা করে অসহায় লোকদের সহায়তা করে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হতে থাকে। আর যারা টাকার নেশায়, দুনিয়ার সম্পদের পেছনে

হন্যে হয়ে ঘুরে নীতি-নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে থাকে তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বন্ধ করে দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন রহমত অবারিত করে দিলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। আর যা তিনি বন্ধ করে দেন, পরে কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ০২)

বিচারপতিদের কাছে মজলুমের হক

বিচারপতিদের সঠিক বিচারের উপর নির্ভর করে মজলুম, দরিদ্র, অত্যাচারিত বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল-অসহায় মানুষের জীবনপ্রবাহ। দেশের নাগরিক হিসেবে সকল স্তরের জনগণ যে কোন কারণে আইনের আশ্রয় নিলে বিচারপতিদের কাছ থেকে সুষ্ঠু ও যথাযথ বিচার ফায়সালা পাবে এটা তাদের হক বা অধিকার। আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচারপতিদেরকে সকলের হক বা অধিকার সংরক্ষণ করে সুবিচার করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে সুবিচার ও ন্যায়নীতি নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, সে সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়। যদি তারা ধনী বা গরীবও হয়। এদের অপেক্ষা আল্লাহই তো উত্তম। অতএব তোমরা নাফসের খায়েশের অনুসরণ করতে গিয়ে অবিচার করে বসো না।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৩৫)

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

"তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে তখন অবশ্যই সুবিচার করবে।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৫৮)

এমনকি বিচারের ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ যেন জাতিগত কোন বিভাজন সৃষ্টি করে কারোর প্রতি অবিচার না করে, তাদের হক হরণ না করে সেদিকে খেয়াল রাখার লক্ষ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا.

"কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কোনরূপ অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ০৮)

মহান আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। তিনি নিজেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفى.

"তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন– তাছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।" (সূরা আল-আলা, ৯৬ : ০৭)

তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকলকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বলেন :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

"নিশ্চয় তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফিরিশতাগণ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ, তারা জানে– তোমরা যা কর।" (সূরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ১০-১২)

এরপর অন্যত্র আল্লাহ বিচারকদের বিচার করার জন্য তিনি কি শ্রেষ্ঠ নন এ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন :

اَلَيْسَ اللهُ بِاَحْكَمِ الْحكِمِيْنَ.

"আল্লাহ কি সমস্ত বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন।" (সূরা আত-তীন, ৯৫ : ০৮)

এ প্রসঙ্গে আমাদের রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জালেম ও মজলুম উভয়কেই সাহায্য করার জন্য আমাদের তাকিদ দিয়ে বলেন :

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظْلُوْمًا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ.

তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুমকে তো সাহায্য করবই কিন্তু জালেমকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি? তিনি বলেন : তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই তার জন্য তোমার সাহায্য। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, হা. নং-২২০১, বিআইসি)

অন্যদিকে ন্যায়বিচারকারী বিচারপতিদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لاَيَعْلَمُ فَاَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضى بِالْحَقِّ فَذلِكَ فِي الْجَنَّةِ.

বিচারকগণ তিন শ্রেণীভুক্ত। দুই শ্রেণী দোযখী এবং এক শ্রেণী জান্নাতী। যে বিচারক জ্ঞাতসারে অন্যায় রায় প্রদান করে সে দোযখী। যে বিচারক সত্য উপলব্ধি না করে মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সেও দোযখী। আর যে বিচারক ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা দান করে, সে জান্নাতী। (তিরমিযী, আবওয়াবুল আহকাম, হা. নং-১২৬১, বিআইসি)

দেশ-বিদেশে চাকুরি পাবার হক

চাকুরির অপর নাম কর্ম। যোগ্যতমরা যোগ্যতা অনুযায়ী দেশ-বিদেশে কর্ম পাবে, পেশায় অংশগ্রহণ করবে, কর্মস্থলে সুন্দর পরিবেশ পাবে, কর্ম অনুযায়ী যথার্থ মূল্যায়ন তথা সম্মানী বা বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবে এটি কর্মীর হক। আজকাল দেশ-বিদেশে সর্বত্র চাকুরি পাবার ব্যাপারে যে কথাটি প্রচলিত আছে তা হলো চাকুরি সোনার হরিণ, চাকরি পাওয়া ভার। যোগ্যতমরা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বা পেশায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে একদিকে যেমন অফিস-আদালতে বা কর্মস্থলে যথার্থ কর্মসম্পাদন হয় না (যোগ্যতার অভাবে); তেমনি অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষা, কর্মস্পৃহা ও সুন্দর জীবনের প্রতি তাদের খেদোক্তি (বেকার থাকলে যা হয়) বৃদ্ধি পায়। পরিণামে যুব সমাজ হয়ে পড়ে অস্থির, উদ্বিগ্ন, অস্থিতিশীল সমাজের সকল মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে অনিশ্চিত; মানুষ হয়ে পড়ে নৈতিকতাহীন। আর তাদের আচার-আচরণ হয়ে পড়ে বল্গাহীন বা নিয়ন্ত্রণহীন। এক্ষেত্রে ইসলামের ভাষ্য হলো কোন কিছুর সুবাদে কোন ব্যক্তি কোন কাজের যোগ্য না হয়ে কাজ পাওয়া, মেধা ও কর্মস্পৃহার স্বাক্ষর প্রমাণ করে যারা নির্বাচিত হয় তাদের সরিয়ে তাদের স্থানে নিয়োগ পাওয়া ইত্যাদি সবই অবৈধ, হারাম। এ কর্মস্থলে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যারা জীবন ধারণ করে তাও অবৈধ। এ ক্ষেত্রে চাকুরিদাতা কর্তৃপক্ষ ও নানান কিছুর প্রভাবে যারা অন্যেরটা ছিনিয়ে নিজের করে নেয়; যারা নিতে সহযোগিতা করে প্রত্যেকেই হক হরণের দায়ে সমান অপরাধী অর্থাৎ আল্লাহ ও দুনিয়ার ন্যায়ের আদালতে আসামী।

পক্ষান্তরে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম-বণ্টন বা যোগ্যতমদের যথার্থ কাজে নিয়োগ না দিয়ে অযোগ্য অথর্বদের নিয়োগ দেয়ার ফলে তাদের যা সম্মানী বা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে তাতে মূলতঃ সমগ্র জনগোষ্ঠীর হক হরণ করা হচ্ছে। যা সত্যিই দুঃখজনক এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আগন্তুকদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের কাছে দেশবাসীর হক

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ জীবন ধারণের লক্ষ্যে যা-যা প্রয়োজন তা পূরণে সরকারি ও বে-সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কেননা জাতির প্রয়োজনে, জাতির খেদমতে এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উন্নয়নের শপথে যারা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত তাদের সকলের একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় একটি সুখী-সমৃদ্ধ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র উপহার প্রাপ্তি যেন আগত ও অনাগত ভবিষ্যৎ জাতির হক।

এ পর্বে যারা অফিসে স্ব-স্ব কাজে কোনরূপ দায়িত্ব পালনে অবহেলা, কর্মে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা, ফাইল ঠেকিয়ে যার ফাইল তার কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ ভোগ করার অপচেষ্টা চালায় তারা যে নৈতিকতা বিরোধী, দেশদ্রোহী জনগণের দুশমন এবং ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ জন্যেই তারা সময়ের ব্যবধানে সমাজের লোকদের কাছে যেমন অসম্মানিত হয় তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকেও উভয় জাহানে হবে শাস্তির মুখোমুখী।

অফিসের গাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার

সরকারি ও বে-সরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে রাষ্ট্রের সম্পদ আমানতস্বরূপ। রাষ্ট্রের জনগণের খেদমতের প্রয়োজনে অফিস প্রধান বা কর্তা ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজে শুধু অফিসের গাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা বৈধ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকাল অফিসের গাড়ি, অফিসে ব্যবহার্য অন্যান্য উপকরণকে কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পদ মনে করে যথেচ্ছা ব্যবহার করে থাকে। বেড়ানোর কাজে, শপিং সেন্টারে গমনাগমনে, নিজেদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে গমনের ক্ষেত্রে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করা যে অবৈধ এবং রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর হক হরণ করার শামিল তা তাদের মাথায়ই আসে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.

"নিশ্চয় আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন; তারপর আমারই দায়িত্বে তাদের হিসাব-নিকাশ।" (সূরা আল-গাশিয়া, ৮৮ : ২৫-২৬)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"আর যারা মন্দ কাজ করবে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং আচ্ছন্ন করবে তাদের চেহারাকে হীনতা। কেউ নেই তাদের রক্ষা করার আল্লাহ থেকে। তাদের চেহারা যেন আচ্ছাদিত রাতের অন্ধকার আস্তরণ। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৭)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমনিতেই সৃষ্টি করেননি। আবার যেমনি ইচ্ছা তেমনি চলার, যা ইচ্ছা তা ভোগ করার অধিকারও দেননি। সুতরাং যারা চেয়ারে বসে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে জনগণের সম্পদ ভোগ দখল করে তাদের সতর্ক করে

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

"আর যে কেউ নাফরমানী করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এবং লঙ্ঘন করবে তাঁর নির্ধারিত সীমা, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে। সেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৪)

আবার যারা অফিসিয়াল রীতি-নীতি মেনে চলে, অফিসিয়াল সম্পদকে নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পদ মনে করে ভোগ না করে তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাপুরস্কারের ঘোষণা :

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِه اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

"এবং যারা অক্ষুণ্ন রাখে সে সম্পর্ক, যা অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা এবং ভয় করে তাঁদের রবকে, আর ভয় করে কঠিন হিসাবকে। আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং সালাত কায়েম করে, আর ব্যয় করে আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।" (সূরা আর রাদ, ১৩ : ২১-২২)

ক্ষমতার অপব্যবহার

সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া মানে দায়িত্ব গ্রহণ করা। যে যত বড় পদের অধিকারী সে তত বেশি দায়িত্বের বন্ধনে বন্দী। অধীনস্থগণের, দেশবাসীর যিম্মাদারীর ভারে ন্যস্ত ব্যক্তি।

আর তাইতো প্রথম খলীফা আবু বাকর (রা) তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্তিতে বায়আত অনুষ্ঠানের পরে সর্বপ্রথম ভাষণে বলেছিলেন :

তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে পারি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকটে দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে তার নিকট প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারি। (মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, আবু বাকর, উর্দূ অনুবাদ, লাহোর, ১৯৭৩)

এরপর দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন :

আমি যদি জানতাম যে, খিলাফতের এই গুরুদায়িত্ব বহন করার মত আমি

ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আছে তাহলে এই পদ গ্রহণ করার চাইতে আমার শিরচ্ছেদ করাকে অধিক শ্রেয় মনে করতাম। (তানতাবী, 'উমার ইবনুল খাত্তাব, উর্দূ অনুবাদ, 'আবদুস সামাদ সারিম, লাহোর, ১৯৭১)

ইসলামের প্রথম দিকে খলীফাদের দায়িত্ব পালনের কথা বাদ দিলেও একথা বুঝা অত্যন্ত সহজ– যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে আসীন না হলে তাদের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হয় বেশি। কারণ, তারা মনে করে এত কিছু করে এ পদে আসীন হয়েছি সবকিছু তো আমাকে উসূল করতেই হবে।

আর তাইতো এ সমস্ত ব্যক্তিরা হয়ে থাকে স্বেচ্ছাচারী, পদ বা ক্ষমতার অপব্যবহারকারী। জনগণের কল্যাণ তাদের কাছে হয় উপেক্ষিত। নিজেকে নিয়েই তারা হয়ে পড়ে ব্যস্ত। যা সরাসরি হক হরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কৃষকের হক

শস্য উৎপাদনের জন্য উর্বর ভূমি, প্রয়োজনীয় পানি এবং মানব সম্পদ– এ তিনটিই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ– যা আল্লাহর অকৃত্রিম দান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ.

"আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য।" (সূরা আল-ক্বাফ, ৫০ : ০৯)

এদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশে শতকরা প্রায় ৮০ জন লোকই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যদিকে কৃষি প্রধান এ দেশের অর্থনীতিও কৃষি নির্ভর। আর তাইতো শ্রমজীবী মেহনতী মানুষেরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শক্ত হাতে লাঙল ধরে, বুকের তাজা রক্ত পানি করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করতে চেষ্টা করে শস্য আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে চাইতে থাকে সাহায্য, তারা আপন সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের নির্মোহ বিসর্জনে দেশ ও দশের অগ্রগতির স্বার্থে প্রতিদানহীন, নীরব নিঃস্বার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ দেশের মানুষের মুখে ছড়িয়ে দেয় গান- সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদেরই সোনার বাংলা অথবা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি...। এভাবে আনন্দের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জাতীয় অর্থনীতিকে তিল তিল করে যারা গড়ে, যারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে আমাদের মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করে তাদের হক যে আমাদের কাছে থাকাই স্বাভাবিক। এখানে কৃষকদের হক গুলো আলোচনা করা হলো :

০১. বীজ ও কীটনাশক ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ : মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে

বাড়ছে শস্যের চাহিদা কিন্তু বাড়েনি ভূমি, বরং এ কথা সত্য কৃষি উপযোগী ভূমি দিন-দিন কমছে। ফলে মানুষ বাড়ছে কৃষিযোগ্য জমি কমছে; এ দুয়ের বিপরীতমুখী সম্পর্কের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে আজ উন্নত জাতের বীজ ও জমিতে শস্য যেন নষ্ট না হয় সেজন্য কীটনাশক ঔষধ কৃষকের হাতে যথাসময়ে ও ন্যায্য দামে পৌঁছিয়ে দেয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব। এবার এ দায়িত্ব পালনে ঘাটতি যেমনি কৃষকদের জীবনে বয়ে আনে দুর্গতি তেমনি দেশের মানুষদের মাঝেও দেখা দেয় খাদ্য ঘাটতি। জাতীয় অর্থনীতিকে করে অধঃমুখী।

০২. ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ : বহু কষ্ট করে বুক ভরা আশা নিয়ে কৃষক জমিতে শস্য উৎপাদন করে। সুখের হাসি হেসে সে শস্য জমি থেকে সংগ্রহ করে তাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোক্তাদের মাঝে বিক্রয় করে থাকে। এক্ষেত্রে এক শ্রেণীর দালাল ও ফড়িয়া ব্যবসায়ী যারা মধ্যস্বত্ব ভোগী নামে পরিচিত তারা জোটবদ্ধ হয়ে পুরো বাজারকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কৃষককে কম দাম হাকিয়ে কৃষকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে তা ভোক্তা শ্রেণীর কাছে অনেক বেশি দামে বিক্রয় করে। এ ধরনের জোটের ফলে কৃষক জমিতে শস্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তার চেয়ে কমে বাধ্য হয়ে বিক্রি করে থাকে। এতে কৃষক হয় ঋণগ্রস্ত বা ঋণের ভারে ন্যুব্জ। পক্ষান্তরে কৃষকের পেটে লাথি মেরে প্রতারণার হাসি হেসে ঐ জোটবদ্ধ ক্রেতাগণ পরবর্তীতে অনেক বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে অনেক মুনাফা অর্জন করে থাকে। তাই রাষ্ট্র খামার বাড়ি বা কৃষি উন্নয়নের আঞ্চলিক অফিসগুলোর মাধ্যমে ঐ মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে দূরে সরিয়ে কৃষকদেরকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তাদের ক্ষেত্রেও বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখে ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পেতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। যা হতে পারে শস্য উৎপাদনকারী বিক্রেতা ও ক্রেতাদের জন্য কল্যাণমুখী।

০৩. ভর্তুকি প্রদান : প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, সিডর, সুনামি ইত্যাদি যে কোনটির ফলে কৃষকের জমিতে উৎপাদিত ফসল নষ্ট হলে তাদেরকে কর্মচঞ্চল রাখার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ভর্তুকি প্রদান করতে পারে। এতে কৃষকরা নতুন উদ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ শেষে শস্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারবে।

০৪. কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান পৌছানো : এ দেশ কৃষি প্রধান হওয়ায় কৃষকই যখন কৃষির উসিলা তখন কৃষকদের কাছে কৃষি কাজ সংক্রান্ত যথাযথ জ্ঞান দেয়া,

অধিক উৎপাদনে উৎসাহী করে তোলা, কোনভাবেই জমি যেন অনাবাদী পড়ে না থাকে, মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৃষক যেন যথাযথ সময়ে, উন্নত জাতের বীজের মাধ্যমে অধিক ফসল ফলাতে পারে সেদিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের খেয়াল রাখা দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

০৫. সার ও বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে দেয়া : প্রতি বছর সার কেলেঙ্কারী, শস্য উৎপাদনের মৌসুমে সেচ পাম্প চলার জন্য বিদ্যুতের ঘাটতি কৃষকদেরকে করে তোলে উদ্বিগ্ন। এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। অপ্রিয় হলেও সত্য প্রতি বছর শস্য উৎপাদনের মৌসুমে সারের কৃত্রিম সংকট লাগিয়ে কৃষকদের মুখের হাসিকে কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ ঘৃণ্য লাভের দিকে ঝুঁকে থাকে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আওতাধীনে যারা এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি ও অসতর্কতার কারণে সারের তীব্র অভাবে কৃষকদের মাঝে যখন চরম আর্তি তখন তাদেরকে দমাতে যেয়ে অতীতে অনেক কৃষককে জীবনও দিতে হয়েছে– যা কৃষকদের হক হরণ করারই নজির।

অবশ্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কৃষি ঋণ, বয়স্ক শিক্ষা বা কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা, অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচি, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার মওকুফ করে কৃষকদেরকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলানোর সুযোগ করে দিতেও দেখেছি। তবে তারও প্রয়োজন হবে না যদি সরকারসহ আমরা সকলে তাদের হকের প্রতি সচেতন, তাদের কর্মের মূল্যায়ন ও তাদের প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শন করতে পারি তাহলে আগামীতে খাদ্য ঘাটতি যেমন দূর করা যাবে, তেমনি দেশের অর্থনীতিও হবে উন্নত, দূর হবে দারিদ্র্য।

ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রধানের কাছে জনসাধারণের হক

গ্রাম প্রধান এ দেশে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে উঠে। লক্ষ্য ইউনিয়নের আওতাধীন জনগোষ্ঠীর কল্যাণে রাস্তা-ঘাট, সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে বহুমুখী কাজ করে সেখানকার সকল জনগোষ্ঠীর একে অপরের সকল সমস্যা সমাধানকল্পে সরকার প্রধানের সহযোগী হিসেবে ভৌত অবকাঠামো শক্তিশালী করা। আর এ কাজের নেতৃত্ব দানে থাকেন ঐ ইউনিয়নের সকলের প্রিয়, সকলের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যিনি চেয়ারম্যান নামে ভূষিত। আর প্রতিটি ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যানের আওতাধীন এলাকার পরিধি অনুসারে আরো যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারাও জনগণের ভোটে

নির্বাচিত মেম্বার নামে পরিচিত। এভাবে ছোট-ছোট শহর অঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদের পরিবর্তিত আরেক নাম পৌরসভা যার নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রধানকে পৌর চেয়ারম্যান, আর বড়-বড় শহরে সিটি কর্পোরেশন যার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রধানকে মেয়র এবং পরিধি অনুসারে অন্যান্য সকল প্রতিনিধিদেরকে কমিশনার বলে সম্বোধন করার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তথা সকল অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন-যাপনে স্ব-স্ব এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর হক বা অধিকারগুলো হলো :

- ❖ দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের জীবনমান সংরক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে সম্ভব সবকিছু করা।
- ❖ ইসলাম ধর্মের অনুসারীসহ অন্যান্য মতাবলম্বীদের আদর্শ নীতি ও কর্ম যথাযথভাবে পালনের সুযোগ করে দেয়া।
- ❖ দেশ ও জাতি বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড তথা হত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ সংক্রান্ত কোন কাজে কেউ জড়িত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা।
- ❖ শহর অঞ্চল থেকে সকল ধরনের ময়লা রাতের অন্ধকারে শহর অঞ্চলের বাইরে নিয়ে যাওয়া– যা বর্তমানে দিনের ব্যস্ততম সময়ে করার কারণে এগুলোর দুর্গন্ধ ও বাহিত রোগ-জীবাণু মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এমনকি বাতাসের সাথে মিশে নাকে প্রবেশ করে মানুষকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে কর্মে উদ্দীপনা নষ্ট করে দিচ্ছে। এতে সকলেই কষ্ট পেয়ে থাকে।
- ❖ ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম যথাযথ তদারকির মাধ্যমে গতিশীল রাখা।
- ❖ কয়েক দিন, কয়েক মাস পর-পর রাস্তাঘাট কাটায় এলাকার মানুষদের যেন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা এবং বিশেষ প্রয়োজনে ডেসা, ওয়াসা, টিএন্ডটি ও গ্যাস বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে কেটে এক সাথে দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার প্রতি আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ❖ রাস্তার লাইটপোস্টে বা জনাকীর্ণ স্থানে অন্ধকার দূর করতে লাইটের ব্যবস্থা করা।
- ❖ জীবন ধারণের অপর নাম পানি– এ পানিকে বিশুদ্ধ ও নিরন্তর করা।
- ❖ হকারদের পুনর্বাসন, বস্তিবাসীর আবাসন ও জীবনযাত্রার মান নিশ্চিতকরণ।

❖ পার্ক, উদ্যান ও লেকগুলোর আশেপাশের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখা।
❖ মানুষের সমাধিস্থল তথা কবরস্থান যেন ব্যবসা বা প্রতারণার স্থান না হয় এবং প্রয়োজনে সকলের জন্যে অবারিত হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখা।
❖ খেলার মাঠ ও খেলার স্থানগুলোর যথাযথ তদারকি এবং অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা।
❖ ইউনিয়ন ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতি ইঞ্চি মাটি যেন যথাযথ ব্যবহার এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী সকলের প্রয়োজনে হয় সেদিকে সর্বতোভাবে খেয়াল রেখে যে যে কমিটমেন্টের মধ্য দিয়ে এ প্রতিনিধিরা দায়িত্ব প্রাপ্ত হোন তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা। অন্যথায় তারা হক হরণের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

বেতারের কাছে দেশবাসীর হক

শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সকল শ্রেণীর লোকজনের কাছে সুস্থ বিনোদন ও দ্রুত খবর পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে যে জিনিসটি খুব পরিচিত তা হলো বেতার বা রেডিও। কখন, কোথায়, কী ঘটছে তা সরাসারি জানাতে টিভি চ্যানেলের মত কাজ করছে বেতার। সুতরাং বেতার আজ তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের অত্যন্ত প্রিয় এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাই বেতার চ্যানেলের যারা পরিচালক ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে বর্তমান ও আগামী সন্তানদের হক বা অধিকার হলো তারা তাদের অনুষ্ঠানমালা এমনভাবে সাজাবেন যেন ইয়ং সোসাইটির সবাই আদর্শমুখী হতে পারে, আদর্শিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আগামীতে আদর্শ সমাজ ও দেশ গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারে। যারা ছোট তাদের মেধার সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও আদর্শিক পরিচর্যা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। তাছাড়া সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সরকারি ও বে-সরকারি বেতার সেন্টার যতই বাড়ছে ততই বাড়ছে এগুলোর কাছে মানুষের প্রত্যাশা, মানুষের কল্যাণমুখী দাবি– যা কোনভাবেই অস্বীকার করার মত নয়।

এসব বেতার সেন্টারগুলো শুধু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আর মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক এ রকম নয়। বরং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে মুসলিমদের কৃষ্টি-কালচার, জীবনবোধ, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি আর সেই সাথে সংখ্যালঘু অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে অর্থাৎ জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানবতার কল্যাণে আদর্শ দেশ হিসেবে নিজ মাতৃভূমিকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে একযোগে কাজ

করতে এগিয়ে আসতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে– এটাই তাদের কাছে সমগ্র জনগণের হক।

বিটিভি ও দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর কাছে দেশবাসীর হক

বিশ্ব অঙ্গনে কোথায়, কখন, কিভাবে কী ঘটছে তা তাৎক্ষণিকভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সচিত্র প্রতিবেদনসহ মানুষের সামনে উপস্থাপন করার এক অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। ফলে জীবনের গতিশীলতার সাথে গঠন হয়েছে এর এক শক্তিশালী বন্ধন। বাড়ছে দিন-দিন এর গ্রহণযোগ্যতা। আর সময়ের দাবি অনুসারে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নানামুখী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের লক্ষ্যে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এ চ্যানেলগুলোর কর্তৃপক্ষ ও কর্মকুশলীদের কাছে মানুষের অনেক অনেক প্রত্যাশা। অবশ্য প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়াটা অযৌক্তিক নয়। কারণ রাষ্ট্রের ভৌত অবকাঠামোর উপর ভিত গড়ে রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থে পরিচালিত যে টেলিভিশন চ্যানেল সে তো রাষ্ট্রের কথা বলবে, মানুষের জীবন জীবিকার কথা বলবে, বিশ্বের বর্তমান ও আগামীর ভবিষ্যৎ ছেলে-মেয়েদেরকে গড়ার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করবে এটা স্বাভাবিক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَاب.

"সৎকাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যকে সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ০২)

তারপর সকলকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন :

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَأُولئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

"সেদিন যাবতীয় কৃতকর্মের ('আমলের) পরিমাপ এক ধ্রুব সত্য। যাদের (নেক) 'আমলের পাল্লা ভারী হবে, কেবল তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের 'আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী। কেননা তারা আমাদের আয়াতের প্রতি যুলুম করছিল।" (সূরা আল-আরাফ, ০৭ : ৯৮)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه.

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক কাজ করবে তার প্রতিফল সে দেখতে পাবে, আর যে অণু পরিমাণও পাপ করবে, তার প্রতিফলও সে দেখতে পাবে।" (সূরা আয-যিলযাল, ৯৯ : ০৭-০৮)

وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ. ... فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"হায়! সেই সময়টা যদি তুমি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রভুর সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে এবং বলবে : হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এবার আমরা দেখে নিয়েছি এবং শুনতেও পেয়েছি : এক্ষণে তুমি আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, এবার আমরা প্রত্যয় লাভ করেছি। অত:পর বলা হবে! এবার তোমরা সেই গাফলতের স্বাদ গ্রহণ করো, যে কারণে তোমরা এই দিন আমাদের সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারকে ভুলে গিয়েছিলে। আজকে আমরাও তোমাদেরকে ভুলে গেছি। সুতরাং তোমরা যে 'আমল' করতে, তার বিনিময়ে আজ চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।" (সূরা আস-সাজদা, ৩২ : ১২-১৪)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলোতে জবাবদিহিতার ইঙ্গিত প্রদান করার পরও যারা আল্লাহর দেয়া মেধা ও সময়ের যথার্থ ব্যবহার করবে না এবং অন্যদেরকেও যাবতীয় ক্ষতি থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখবে না তাদের ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কঠোর ভাষায় বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা আন-নূর, ২৪ : ১৯)

বিটিভি ও দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় পরিচালিত অনুষ্ঠানগুলো চাইলে আজ সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রিয় জন্মভূমির উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর এ দেশীয় চেতনাবোধের দিকে ধাবিত করাই হবে এসব চ্যানেলের মাধ্যমে জনগণের হক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ।

নাগরিক মনে পজিটিভ সচেতনতা জাগ্রতকরণ

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিশ্বের যে

কোন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর মনে দেশ সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়ে পজিটিভ মন-মানসিকতা গড়নে বিটিভি ও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের উন্নয়ন এবং সেই দেশের পতাকাকে এগিয়ে নিতে নাগরিকদেরকে উজ্জীবিত করা, শিক্ষিত ও সচেতন, কর্মে কর্মঠ করার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিকল্প নেই।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভিশন সেটআপকরণ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুখী-সুন্দর ও উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা উপহার দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন আজ সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস, উন্নয়নমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আর সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বা সাফল্যের চূড়ায় সকলকে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে দেশে পরিচালিত বিটিভি ও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। অন্যদিকে সকল পেশাজীবিদের স্ব-স্ব পেশায় সাফল্য লাভের সমূহ দিক-নির্দেশনা এবং সম্ভাবনাগুলো জানানোর মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর এবং সকলকে আরো কর্মঠ ও কাজের প্রতি অনুগতশীল করে তুলতে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে এ চ্যানেলগুলো। মূলতঃ এর মধ্য দিয়েই আজকের ছোটরা আগামীতে কী করবে বা কোন পেশায় এগিয়ে যাবে, কিভাবে সে পেশায় সাফল্য লাভ করবে তা খুব সহজেই জানতে পারবে। এতে যেমন তাদের ভিশন স্থির হবে, দূর হবে কর্ম সমস্যা, তেমনি উন্নয়ন হবে দেশের অর্থনীতি, কমে যাবে ক্ষুধা-দারিদ্র্য।

সত্য ও সঠিক খবর পরিবেশন

সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ সত্যকে আড়াল করে দেশ ও জাতির বৃহৎ কল্যাণকে দূরে ঠেলে নিজেদের হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার মানষে কখনও কখনও কোন কোন চ্যানেলে মিথ্যা, উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত খবর পরিবেশন করতে দেখা যায়। এতে দেশের যে সমস্ত ক্ষতি হতে পারে তা হলো :

০১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
০২. মিত্র ও বন্ধু ভাবাপন্ন দেশগুলোর কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে।
০৩. দেশ সম্পর্কে বাজে ধারণার সুযোগ করে দিতে পারে।
০৪. দাতাদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করে দিতে পারে।
০৫. দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।
০৬. দেশে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটিয়ে দেশকে জঙ্গী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করে দিতে পারে।

০৭. অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

সঠিক খবর পরিবেশন না করলে যে ক্ষতি হতে পারে:

০১. ব্যক্তিকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করে তুলতে পারে।

০২. আইনের কাছে অপরাধী করে জেল-যুলুম হুলিয়ার মুখোমুখী করে দিতে পারে।

০৩. মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত আর পারিবারিক জীবনকে তছনছ করে দিতে পারে।

০৪. ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।

রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্ষতিসাধন হতে পারে:

০১. রাজনৈতিক দলের ঐক্য প্রক্রিয়া বিনষ্ট করে দিতে পারে।

০২. দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়িয়ে ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে দিতে পারে।

০৩. মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে।

০৪. জনমত গঠনে নেগেটিভ দেয়াল তৈরি করে জনসমর্থনহীন বা জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিতে পারে।

০৫. দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী রাজনৈতিক দলকে বাধাগ্রস্ত করে অপ-রাজনীতি বা অপশক্তির মদদশীল দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সরকান ও রাষ্ট্র পরিচালকদের যে সমস্ত ক্ষতি হতে পারে :

০১. সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে।

০২. জনবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

০৩. সরকারকে উদ্বিগ্ন করে জনগণকে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

০৪. দেশে মারামারি, কাটাকাটি, ভাঙ্গাভাঙ্গি ও সর্বত্র আগুনের লেলিহান শিখায় মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ গাড়ি-বাড়ি ও কারো কারো জীবিকার শেষ উপায়টুকু পুড়ে ছাই করে দিয়ে তার হাত কপালে উঠিয়ে দিতে পারে।

সর্বোপরি সত্য ও সঠিক খবরের অভাবে শুধু একক কোন দেশে নয় সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী আল কুরআনুল কারীম, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও মানবতার হক প্রতিষ্ঠার সফল অগ্রনায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি জনগণের মনে নেগেটিভ ধারণার উদ্রেক করা হচ্ছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী মুসলিমদেরকে জঙ্গী হিসেবে মিডিয়া প্রচার করে তাদের প্রতি ঘৃণাবোধ পোষণ

করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। মিডিয়ায় প্রচারিত ও পরিবেশিত সত্য ও সঠিক খবরের পরিবর্তে অসত্য ও বেঠিক খবরের কবলে পড়ে দেশ, দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও ব্যক্তি সমাজের যে সকল ক্ষতি হচ্ছে তা তো আর ফিরে আসবে না, যাদের জীবনের গতিময়তাকে থামিয়ে দিয়ে আদর্শমুখী কর্ম ও চিন্তা-চেতনাকে স্তিমিত করে দেয়া হয়েছে তা তো আর পরে সত্য প্রমাণিত হলেও ফিরিয়ে আনা যাবে না। আর তাই এ সকল মিডিয়ার কাছে জনতার হক অনেক অনেক বেশি।

ধ্বংসাত্মক ও অনৈতিক খবর কম পরিবেশন

ধ্বংস গড়ার বিপরীত আর কিছু অনৈতিক খবর আছে যা প্রচারে তার রেশ প্রসার লাভ করে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটমান কোন ঘটনার প্রচারে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, জাহাঙ্গীরনগর হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ সর্বত্র ধোঁয়া ছুঁড়ে মানুষের কোটি কোটি টাকার সম্পদ শেষ। এ ধ্বংসলীলা কত শত মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে পারে; কত মানুষকে সর্বশ্রান্ত করে দিতে পারে তার হিসাব হয়তো মিডিয়ার কাছেও পাওয়া যাবে না। এত বড় ধ্বংস বা শত-সহস্র জনগণের জান-মালের ক্ষতি তথা হক হরণ হতে পারে একটি মিডিয়ায় খবর প্রচারকে কেন্দ্র করে। বিষয়টি অবশ্য চ্যানেল কর্তৃপক্ষও জানেন। আর তাই চ্যানেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব এমন খবর পরিবেশন না করাই উত্তম নয় কি? তবে হ্যাঁ, কতিপয় ধ্বংসাত্মক খবর আছে যা যতটুকু ঘটেছে ততটুকু প্রচার করা উত্তম। যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও সিডরে যা-যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা এবং সেখানকার মানুষের মানবেতর জীবনযাত্রা প্রণালী। আর তাহলে মানবতার মানসপটে মনুষ্যত্ববোধের স্পৃহা জেগে উঠবে, মানুষ মানবপ্রেমে মানুষকে সাহায্য করতে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসবে, কেউবা দু'আ করবে, কেউবা সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, এতেও অসহায়দের হক আদায় হবে।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন

মানবতার কল্যাণকামিতায় পৃথিবীর কোন জাতি-গোষ্ঠীর কাছেই জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সমর্থনযোগ্য নয়। এ কাজগুলো যেখানে সংগঠিত হয় বা হবে সেখানেই সকলের হক হরণ করা হয় বা হবে। আর তাই বিটিভি ও দেশীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো এর কুফল বা নেগেটিভ দিকগুলো মানুষের জানা ও সচেতনতার লক্ষ্যে আরো বেশি বেশি প্রচারের ব্যবস্থা করা উত্তম হবে। এতে

সকলেই সোচ্চার হবে। সেই সাথে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটার পর বা বহু মানুষ মরে যাওয়ার পর ধর্মের কল্যাণের কথা না শুনিয়ে যদি আগেই এগুলো প্রচার-প্রসার ঘটানো যায়, তাহলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, জনমত এগুলোর বিপক্ষে থাকবে এবং কখনো কেউ বিদ্বেষবশত এসব করতে চাইলেও তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠবে। স্ব-স্ব এলাকার জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এগুলোকে প্রতিহত করবে। এতে মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র জাতির হক সংরক্ষিত হবে।

সংবাদপত্র ও প্রিন্ট মিডিয়ার কাছে দেশবাসীর হক

সংবাদপত্রই হচ্ছে দেশ ও জাতির মুখপত্র। প্রতিদিন দেশ-বিদেশে কোথায় কী ঘটে তার সচিত্র খবরা-খবর জাতির সামনে লিখিতভাবে উপস্থাপনে এ এক অন্যতম মাধ্যম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেশে একটি শান্তিময় পরিবেশের সমাবেশ ঘটাতে পারে এ সংবাদপত্র। কাজেই সময়ের ব্যবধানে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে সংবাদপত্রের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেক। সংবাদপত্রকে কখনো কারোর ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ উদ্ধার, প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা দমনের মানসিকতা, অপরের ক্ষতি অথবা ইজ্জত-সম্মান ক্ষুণ্ন করার মানসিকতা, দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, কারো খুশি করা অথবা কারোর প্রতিহিংসা বা শত্রুতার বাহন হয়ে নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশন থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। কারণ এতে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে কোন সংবাদে বিচলিত না হয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে দেখার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বলে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ.

"হে মু'মিনগণ! যদি কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তোমাদের কাছে সংবাদ নিয়ে আসে তা তোমরা পরীক্ষা করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত না হও এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হয়।" (সূরা আল-হুজরাত, ৪৯ : ০৬)

আজকাল বিশ্ব অঙ্গনে মুসলিমরা তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। আর এ তথ্য সন্ত্রাস দু'ভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে। এক, প্রিন্ট মিডিয়া ও দুই. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রিন্ট মিডিয়ায় এক শ্রেণীর অনাদর্শিক কলম সৈনিক মুসলিমদের ভাল কাজগুলোকে তাদের পত্রিকায় ছাপানো থেকে হয় পরিহার

নতুবা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে একটু বাঁকা করে তাদের পত্রিকায় ছাপিয়ে তারাই মুসলিমদের বিপক্ষে জনমত গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্ব অঙ্গনে মুসলিমদেরকে কোণঠাসা করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে যা আজও অব্যাহত আছে। তারা আদর্শের সাথে ব্যক্তি নাম যুক্ত করে, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মদদ দাতাদের সাথে যুক্ত করে বাস্তবিক ও চির সত্যকে গোপন করে ইসলাম বিদ্বেষীদের কাছে প্রিয় হয়ে দুনিয়ার অঙ্গনে ক্ষমতাশালী হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অবশ্য তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বক্তব্য পরিষ্কার এবং এটাই আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত মানুষগুলোর সান্ত্বনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

"যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন রাখে, তবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ১৪০)

সুতরাং সত্য সুন্দর প্রতিষ্ঠা, ইসলাম ও মানবতা বিরোধীদের অপতৎপরতা মানুষের সামনে উন্মোচিত করা, তাদের মুখোশকে খুলে দেয়া এবং দেশ বিরোধী চক্রান্তের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার মাধ্যমে সংবাদপত্র আজ এবং আগামী জাতির যে হক পূরণ করতে পারে তাহলো :

০১. সংবাদপত্র দেশের নাগরিক মনে পজিটিভ সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে একটি কল্যাণধর্মী আদর্শ দেশ গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

০২. আজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভিশন সেটআপকরণসহ দেশের সকল সম্ভাবনার উৎসগুলো সংবাদপত্রে ছাপিয়ে সকল শ্রেণীর নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

০৩. সত্য ও সঠিক খবর ছাপিয়ে অসুন্দর ও অন্যায়কে সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিতাড়িতকরণে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও এক শ্রেণীর সংবাদপত্র বাণিজ্যিক সুবিধা ও পাঠক বৃদ্ধির লক্ষ্যে কখনো কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অতিরঞ্জিত অথবা বিপরীত শব্দ সংযোজন অথবা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন কোন সংবাদ পরিবেশন করে থাকে– যা জনগণের হক হরণেরই বাস্তবরূপ।

০৪. ইসলাম দেশ ও মানবতাবিরোধীদের মুখোশকে উন্মোচিত করে তাদের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে তাদের আন্দোলন গড়ে তোলা এবং জনমত

গঠনের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে তাদের চক্রান্তের সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। সেই সাথে কারা সত্যি সত্যিই পৃথিবীর বুকে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও জীবন বিধানের মূলমন্ত্র আল কুরআনুল কারীমকে হেয় করার চেষ্টা করছে তাও পাঠকদের কাছে সঠিক ও নির্ভরশীল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারে।

০৫. সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ডের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

০৬. জনগণের সচেতনতামূলক যে কোন কর্মসূচি খুব সহজে সুফলদায়ক করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র ভূমিকা পালন করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে আসতে পারে।

সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীর কাছে দেশবাসীর হক

সত্য ও সুন্দরকে আরো বেগবান, প্রাণবন্ত, এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে দৃঢ় বলিয়ান আর অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্ভীক তথ্যানুসন্ধানী মানবতার কল্যাণে নিবেদিত, সদা জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরী এক একজন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সামান্য বিচ্যুতি ব্যক্তিকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর মুখোমুখি; সংগঠন বা দলে ভাঙনের মাধ্যমে লাগিয়ে দিতে পারে নানা দ্বন্দ্ব-কলহ ও রেষারেষি; জাতিকে করে দিতে পারে আদর্শ বিমুখ, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সামগ্রিক শৃঙ্খলাকে খর্ব করে অপরিহার্য করে তুলতে পারে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ; দেশের সরকার ও দেশ পরিচালনায় যে কোন স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভিন দেশীদের মতামত নির্ভর– যা ব্যক্তি, সমাজ, দল ও দেশের সকলের জন্যই অপ্রীতিকর, মর্যাদাহানীকর।

অন্যদিকে এ সাংবাদিকরাই জীবনবাজি রেখে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে চতুর্দিক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন। তাদের এ কাজের মূল উদ্দেশ্য দেশ ও দশের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ও কায়েমী ব্যক্তি স্বার্থবাদীদের চিন্তা-চেতনা ও অপকর্ম সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে খবর বা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতিকে সচেতন করা; পরিবার ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান রাখা। অর্থাৎ সাংবাদিকগণ একটি আদর্শ ও কল্যাণকামী দেশ গঠন, জাতিকে উদ্বুদ্ধকরণ ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। আর দেশের জনগণও এটাই তাদের কাছে প্রত্যাশা করে।

প্রকৃতপক্ষে সাংবাদিকতা এ যে পবিত্রতম একটি দায়িত্ব। এ যে একটি পবিত্র আমানত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নিজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীবাসীর কল্যাণে জীবনের ৬৩ বছর এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

"হে নাবী! আমি তোমাকে সাক্ষীস্বরূপ পাঠিয়েছি, বানিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে তুমি হচ্ছো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও সুস্পষ্ট প্রদীপ।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৪৫-৪৬)

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"রাসূলগণ সুসংবাদবাহী ও ভয় প্রদর্শনকারী, যাতে করে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর মানব জাতির কোনো অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে; আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১৬৫)

উল্লেখিত এ আয়াতগুলোতে সাংবাদিকদের দায়িত্ব যে অত্যন্ত পবিত্র, এ দায়িত্ব পালন যে অনেক তাৎপর্যবহ, দেশ ও জাতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই ফুটে উঠেছে। ফলে অত্যন্ত জোর দিয়েই বলা যায়, সাংবাদিকরা হবেন সত্যের বাহক আর অসত্যের প্রতিবন্ধক। সকলের হক প্রতিষ্ঠার এক নির্ভীক কর্মী। একদিকে দুষ্কৃতিকারীর অপকর্মের মূলে কুঠারাঘাতকারী, অপরদিকে বহু দীন-দরিদ্র, অধিকার বঞ্চিত, অধিকার হারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্ভীক সেনানী।

অবশ্য অপ্রিয় হলেও সত্য আজকাল কতিপয় সাংবাদিক বন্ধুগণ তাদের পেশার যে আদর্শিক নীতি, মানুষ হিসেবে যে মানবতার দাবি, দেশের নাগরিক হিসেবে বা এ ভূমিতে জন্মগ্রহণে মাতৃভূমির যে হক, যে ধর্ম বা বিশ্বাসের লোকই হোক না কেন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্রষ্টার যে হক– এসব কিছুকে উপেক্ষা করে এমন কিছু খবর পরিবেশন করে থাকে, যা তাদের আসনকেই, তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

কেননা সত্য, সুন্দর, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা একজন সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। এ নৈতিক দায়িত্ব যারা যথাযথভাবে পালন করবেন, তারা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হবেন। আর যারা করবেন না বা অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে ব্যক্তি, দল ও জাতির ইজ্জত-সম্মান ক্ষুণ্ন করবেন তাদের অবশ্যই আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

লেখক, গবেষক ও কলামিস্টদের কাছে দেশবাসীর হক

লেখক, গবেষক ও কলামিস্টগণ একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। তাই তাদের কাছে রয়েছে আজও আগামীর অনেক হক। যেমন :

০১. জাতির ভিশন সেটআপকরণ ও মিশন বাস্তবায়নে পথ নির্দেশনা দেয়া।
০২. জাতিকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিতকরণে উদ্বুদ্ধ করা।
০৩. উন্নত মন-মানসিকতা গঠনে সহায়তা করা।
০৪. নীতি-নৈতিকতায় উজ্জীবিত করা।
০৫. জাতিকে উদ্যমী হতে সহায়তা করা।
০৬.আদর্শ ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে পরিশ্রমী ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করতে সহায়তা করা।
০৭. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ করা।
০৮. সচ্চরিত্র গঠনের দিকে এগিয়ে নেয়া।
০৯. জাতির বৃহত্তর কল্যাণে সকলকে উজ্জীবিত করা।
১০. স্বাধীনভাবে হক কথা বলতে সুযোগ করে দেয়া।
১১. জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।
১২. আদর্শ মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
১৩. সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করা।
১৪. দেশের তরে সবাইকে একাত্ম হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
১৫. দেশের ক্রান্তিলগ্নে মুখ্য ভূমিকা পালনে সকলকে সংগঠিত করা।
১৬. দেশের যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সকলকে সহায়তা করা।
১৭. দেশের অতীত ইতিহাস সত্য ও সঠিকভাবে লিখে বর্তমান ও আগামীদের মাঝে সঠিক ইতিহাস জেনে পথ চলতে সহায়তা করা।

সুতরাং বলা যায়, আদর্শ লেখক, দেশ ও মানবতাবাদী গবেষক ও কলামিস্টরাই পারেন তাদের লেখনী দ্বারা জাতির এ হকগুলো পূরণে সঠিক ভূমিকা রাখতে; দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে; দেশের পতাকাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে, আবার পারেন দেশকে কোণঠাসা করতে, জাতিকে অপমানিত, পর্যুদস্ত, লাঞ্ছিত ও দুর্যোগপ্রবণ বা আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি বা লানতের দিকে এগিয়ে দিতে। এ লেখাটি পাঠকদেরকে ভাবনায় ফেলে দিতে পারে। তাই স্পষ্ট করে বলছি, যারা আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আদর্শের অনুসারী– যারা এ শপথে বলীয়ান :

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا لَاشَرِيْكَ لَه وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সকল ইবাদাত, আমার জীবন ও জীবনের

যাবতীয় কাজকর্ম এমনকি আমার মরণ পর্যন্ত বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি, আত্মসমর্পণকারীগণের মধ্যে আমিই প্রথম।" (সূরা আল আন'আম, ০৬ : ১৬২-১৬৩)

তাদের লেখা, গবেষণা কর্ম ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে এ পৃথিবীর মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা অনুসারে। আল্লাহ বলেন :

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مَدَدًا.

"(হে নাবী! আপনি বলে দিন যে,) যদি সাগরের সব পানি কালি হয়, আমার প্রভুর কথা লেখার জন্যে, তবে সে সাগরের পানি ফুরিয়ে যাবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই।" (সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ১০৯)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّه مِنْۢ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"আর যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ কলম হয়, আর যে সমুদ্র রয়েছে তার সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৭)

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যারা আল্লাহর এ বিধান অনুযায়ী জীবন গড়ে, কর্ম করে, তাদের লেখনী হবে অবশ্যই সর্বশক্তিমান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি কেন্দ্রিক অর্থাৎ জাতির কল্যাণ এতে নিহিত থাকবে কোন সন্দেহ নেই। কারণ যে স্রষ্টা জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সমূহ কল্যাণ কিসে তা আল কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন এবং দুনিয়ার অঙ্গনে যুগে যুগে বিপথগামী মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে নাবী-রাসূলদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। অতএব আল কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীস অনুযায়ী যারা লিখছেন ও ভবিষ্যতে লিখবেন এবং গবেষণা করছেন ও করবেন তাদের কাছে জাতির হকও বেশি। যদিও অপ্রিয় হলেও সত্য আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত, আদর্শ চিন্তা-চেতনার অনুসারী শ্রদ্ধাভাজন মানুষগুলো সামগ্রিকভাবে আজ এ অঙ্গনে এগিয়ে না আসায় অন্য কথায় জাতিকে আদর্শের দিকে পথ দেখাতে যথাযথ ভূমিকা পালন না করায় লেখক, গবেষক ও কলামিস্টদের লেখার এ অঙ্গন আজ অনেক ক্ষেত্রেই বেদখল হয়ে যাচ্ছে। বক্তব্য অত্যন্ত সহজ। যারা আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, যারা দুনিয়ার অঙ্গনে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, খাও দাও ফুর্তি কর– যা

ইচ্ছা তাই কর এমন নীতিতে আবদ্ধ তাদের লেখা চিন্তা-চেতনার ফসল যে কখনো দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকামী হতে পারে না তা বোধহয় যে কেউ বুঝে থাকবেন। বরং তাদের লেখা তাদের এবং তাদের এক শ্রেণীর অনুসারীদের কাছেই হয়তো সাময়িকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে তার সুফলও নেগেটিভ হতে বাধ্য।

আবার তারা দুনিয়ার অঙ্গনে যেমনি দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে কোন ভূমিকা পালন করে না তেমনি তাদের কৃতকর্ম ও লেখনীর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকেও জাতির উপর নেমে আসে নানা দুর্যোগ ও লানত। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

"স্থল ভাগে ও জল ভাগে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় সংঘটিত হয়। যার দরুন আল্লাহ কিছু কিছু কাজের শাস্তি তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা আর-রূম, ৩০ : ৪১)

লেখকের হক

যিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখেন তিনিই লেখক। এবার এ লেখা কেউ পড়ে কেউবা পড়ে না, কেউ গ্রহণ করে কেউ বা গ্রহণ করে না; কেউ সংরক্ষণ করে, কেউবা ঢিল ছুঁড়ে, কুট-কুট করে ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে; কিন্তু এতে লেখকের হকের কী আছে– এমন প্রশ্ন পাঠক মনে আসতেই পারে। আবার কেউ কেউ এ লেখা পড়তে যেয়ে মনে করতে পারে হ্যাঁ টাকা দিয়ে তো কিনে এনেছি সুতরাং হক আর কী! এখানেই তো শেষ। হ্যাঁ সেই কথা বলতেই এ লেখা। যে লেখা পাঠককে আদর্শের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম নয় বা সচ্চরিত্র গঠনে বিন্দুমাত্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়, যে লেখা পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্ব অঙ্গনের মানুষের কল্যাণে কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয় সে লেখা সম্বলিত বই টাকা দিয়ে কিনে এনে লেখকের হক আদায় করেছেন কেউ কেউ ভাবলেও আমি বলি আপনি লেখককে আপনার কাছে দায়বদ্ধ করে ফেলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে যে লেখা পাঠককে সত্য ও উত্তম আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, মন-মানসিকতা ও চিন্তার মাঝে নাফসে আম্মারার গতিরোধ করে নাফসে লাওয়ামাকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি-সামর্থ্য যোগায় অর্থাৎ অন্যায়-অবিচার, অন্যের হক হরণ, অশ্লীলতা, অনাচার, বেহায়াপনা, নোংড়ামী, পাপ-পঙ্কিলতা, দুষ্কর্ম ও যাবতীয় মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা ও ক্ষোভ গড়ে দিয়ে মানুষকে আদর্শের

দিকে এগিয়ে যেতে সংগঠিত করে, আদর্শ জীবন গঠন ও সুন্দর সমাজ গড়ার দিকে ধাবিত করে, জাতি সম্প্রদায় এমনকি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আদর্শের পতাকাতলে একত্রিত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সে লেখকের হক শুধু টাকা দিয়ে মূল্য পরিশোধের বিনিময়েই শেষ হয়ে যায় না। অধিকন্তু সে লেখক মৃত্যুর পরও সাওয়াব, কল্যাণ ও নেকী লাভ করবে বলে আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা থেকেই জানা যায়। তাই এমন লেখা শুধু পাঠকের নয় লেখকেরও অফুরন্ত পুঁজি বলে গণ্য হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِىْ يَبْلُغُهُ اَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস কল্যাণকর: সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে, সাদাকায়ে জারিয়া যার সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে এবং এমন জ্ঞান যা তার মৃত্যুর পরও কাজে লাগানো যায়। (সুনান ইবন মাজাহ, মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হা. নং-২৪১, আ.প্র)

লেখককে উৎসাহ দেয়া

ভাল কাজে উৎসাহ দেয়া আর মন্দ কাজে বাধা দেয়া এটা মানুষের স্বভাবজাত বা মনুষ্যত্ববোধেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক মানুষ চায় ভাল কাজের প্রসার লাভ করুক আর মন্দ কাজ সমাজদেহ থেকে বিতাড়িত হোক। আর তাইতো লেখকের লেখায় যখন সকল স্তরের মানুষের জীবনবোধের সমস্যা ও তার সমাধান, জনতার কল্যাণমুখী কথা ফুটে উঠে, আদর্শমুখী জীবন দর্শনের কথা ফুটে উঠে, আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাবে; দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার স্পৃহায় রক্ত টগবগ করে জেগে উঠতে সহায়ক হবে; তখন এমন লেখার জন্য লেখককে উৎসাহ প্রদান পাঠকদের কাছে লেখকের অধিকার।

লেখকের জন্য দু'আ করা

লেখক বর্তমান সমাজেরই একজন কিন্তু চিন্তা-চেতনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক দূরের, লেখকের লেখায় আজকের পাঠকরা যেমন তাদের সমস্যার সমাধান ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন তেমনি অনাগত বা আগন্তুকরাও তাদের যুগ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবেন। আর তাইতো ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত লেখকের লেখা সংরক্ষণ করার চেতনা থেকে পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় সর্বত্র পাঠাগার গড়ার প্রতি সরকারও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সুতরাং যে লেখা মানুষকে মানুষের স্বকীয়তাবোধ সম্পর্কে জাগ্রত করতে, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করতে, মানুষকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে

দুনিয়ার বুকে দিনাতিপাত করতে, মহান স্রষ্টার সকল নির্দেশনা মেনে স্রষ্টার হক পরিপূর্ণ করে মৃত্যুর পরও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের দিকে দিক-নির্দেশনা দেয়, সে রকম লেখকের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য মহান স্রষ্টা, আমাদের সকলের নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করা তো পাঠকদের নিজেদের প্রয়োজনেই উচিত।

লেখকের ভুল-ক্রটি সংশোধনে গঠনমূলক সমালোচনা

আরবি ইহ্তিসাব শব্দের বাংলা অর্থ হলো গঠনমূলক সমালোচনা বা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা।

পরিভাষায় অপরের কল্যাণ কামনায় ভুল-ক্রটি দেখিয়ে দেয়ার পদ্ধতিকে ইহ্তিসাব বলে। আর সামষ্টিক গঠনমূলক সমালোচনাকে আরবিতে মুহাসাবা বলে।

প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে ভুল করতে চায় না। কিন্তু তারপরও ভুল-ক্রটি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে লেখক যেহেতু মানব জীবনের বিশাল দিক নিয়ে লিখবেন তখন লেখকের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, বিশাল এ জগতের জ্ঞানের ঘাটতি, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, বে-খেয়ালীপনাসহ্ শয়তানের অনবরত অপচেষ্টার কারণে কিছু ভুল হতে পারে। আর তাইতো লেখকগণ তাদের লেখা বিশেষ করে বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে শুরুতেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুল-ক্রটির জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে থাকেন। তবে এটি জানানোর জন্য কোন যোগাযোগের পদ্ধতি তথা কোন ঠিকানা বা ফোন নম্বর সচরাচর বইতে উল্লেখ থাকে না। তাই পাঠকের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে লেখক বা প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করার কোন একটি মাধ্যম বইতে উল্লেখ থাকা উচিত। এটা পাঠকের হক; আর সেই মাধ্যমের সাহায্যে লেখকের ভুল-ক্রটি সংশোধনে ইহ্তিসাব করার চেষ্টা করা পাঠকদের নৈতিক দায়িত্ব আর লেখকদের হক বা অধিকার।

ইহ্তিসাব করার নিয়ম-নীতি

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্তিসাবের বিষয়ে ব্যাপক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এখানে দু'টি হাদীস উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى بِهٖ اَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ.

তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দাগ (ক্রটি) লক্ষ্য করে, তবে তা যেন দূর করে দেয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ্, হা. নং-১৮৭৯, বিআইসি)

اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَه وَيَحُوْطُه مِنْ وَّرَائِه.

এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য দর্পণস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ভাইস্বরূপ। কাজেই তার উচিত, অপর মুসলিমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং তার অনুপস্থিতিতে সে ব্যক্তির জান-মাল রক্ষা করা। (আবু দাউদ, আদব, হা. নং-৪৮৩৮, ই.ফা)

উল্লেখিত হাদীস দু'টি থেকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও আলিম-উলামাগণ ইহতিসাবের যেসব নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

❖ কারো লুকিয়া থাকা দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়। কেননা আয়না কখনো ছিদ্রান্বেষণ করে না। মানুষ যখন তার সামনে দাঁড়ায় কেবল তখনই আয়না তার চেহারা প্রকাশ করে।

❖ পেছনে থেকে কোন ধরনের সমালোচনা করা যাবে না। কেননা আয়নার সামনে না দাঁড়ালে তা কখনো কারো আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করে না।

❖ সমালোচনায় কোন বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয়। কেননা আয়না কোনরূপ কম-বেশি না করেই আসল চেহারা বা অবয়ব ফুটিয়ে তোলে।

❖ সমালোচনা সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন এবং কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধি ও দূরভিসন্ধি বা কোণঠাসা ও হেয়প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। কেননা আয়না যার চেহারা প্রতিবিম্বিত করে, তার প্রতি কোন বিদ্বেষ প্রমাণ করে না।

❖ দোষ-ক্রটি বলে দেয়ার পর তাকে আর মনের মধ্যে লালন করা উচিত নয়। কেননা সামনে থেকে চলে যাওয়ার পর আয়না কারো আকৃতি সংরক্ষণ করে না। অন্যকথায় দোষ গেয়ে বেড়ানো উচিত নয়।

❖ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, সকলের ভেতর পরনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও ভালবাসা ক্রিয়াশীল থাকতে হবে অর্থাৎ সমালোচনার ভাষা যেন আক্রমণাত্মক না হয়, বিরোধিতার কারণে বিরোধিতামূলক না হয়, লেখককে স্তিমিত বা থমকে দেয়ার মত না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে সমালোচনা গঠনমূলক ও সংশোধনমূলক হওয়া উচিত।

যিনি ইহতিসাব করবেন তার করণীয়

যিনি ইহতিসাব করবেন তিনি অবশ্যই কিছু বিষয় খেয়াল রেখে ইহতিসাব করবেন। নতুবা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবার ইহতিসাব করার সময় যে সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তা হলো :

০১. মন-মানসিকতা, সময় ও পরিবেশ বুঝে ইহতিসাব করা।

০২. ইহতিসাবের ভাষা হবে নমনীয়, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য। যে ভাষায় ব্যক্ত করা হবে তাতে কোন তেজ থাকবে না এবং ক্ষোভের অভিব্যক্তিও ঘটবে না।
০৩. আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে ইহতিসাব করা।
০৪. অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে লেখক বা যে ভাই কোন কিছু ভুল করেছেন সে ভাইকে এটি বলে দেয়া তার হক; ইহতিসাবকারী এ বিষয়টি মনে রেখে হক আদায়ের নেশায় তা করা।
০৫. কাউকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে ইহতিসাব না করা।
০৬. ইহতিসাব করার পর লেখক যদি সেটা শুনে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করেন তাহলে তা মেনে নেয়া এবং সবকিছু অন্তর থেকে মুছে ফেলা উত্তম।

লেখকের করণীয়

ইহতিসাব অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। পাঠক লেখকের লেখা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালভাবে না পড়লে, চিন্তা-গবেষণা না করলে কোনভাবেই লেখায় কোথায় কী ঘাটতি আছে তা বলে দিতে পারবে না। সেই সাথে ইহতিসাবকারী এটা বলে দেয়াকে যে তার হক মনে করে লেখকের সাথে যোগাযোগ করে লেখককে সংশোধনের চেষ্টা করছে এটাও একটা বিশেষ আন্তরিকতা ও ভালবাসার প্রমাণ। সুতরাং কোনভাবেই ইহতিসাবকারীকে ভুল না বুঝে বা বাজে সমালোচকের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে তার কথা সুন্দর মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং তা মেনে নিয়ে সংশোধনে উপনীত হওয়াই হবে লেখকের জন্য উত্তম। সেই সাথে আরও কয়েকটি করণীয় আছে যা নিম্নরূপ :

০১. কেউ ইহতিসাব করতে চাইলে তার জবাব সোজাভাবে দেয়া, ঘুরিয়ে পেচিয়ে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তাকে কোন রকম পাশ কাটিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করা।
০২. সংশোধনের জন্য দু'আ কামনা করা ও যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে পরবর্তী সময়ে লেখা সংশোধন করে দেয়া।
০৩. সুন্দর ভাষায় কারণ বর্ণনা করা; ভাষাগত দিক থেকে সচেতন হওয়া অর্থাৎ নিজের কথাগুলো সুন্দর-সরল ভাষায় ভদ্র-নম্র ও অমায়িকতার সাথে বলা।
০৪. ইহতিসাবকারীর ইহতিসাব সঠিক না হলেও রাগ না করা; ভুল ধারণা অন্তর থেকে মুছে দেয়া।
০৫. ইহতিসাবকারীর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করা।

এবার ইহতিসাবকারী ও লেখক উভয়েই উভয়ের ভুল সংশোধন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি সুন্দর ও

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রতি এগিয়ে যাওয়া আবশ্যক। আর এভাবে এক সাথে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সমাজের প্রাণ ও আত্মা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও নিম্নোক্ত ভাষায় এ সংশোধনের হুকুম দিয়েছেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ.

"মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে ফেলো।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

লেখকের লেখা আদর্শমুখী হলে অন্যদেরকে বলা

লেখকের লেখা যদি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আসনকে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে অলংকৃত করার লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র ও বাণীর সমর্থনে হয়, মানুষের দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি তথা সামগ্রিক কল্যাণ এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের উপযোগী হয়, দুনিয়ার জীবনে সকলের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করে আদর্শ জাতি ও আদর্শ সমাজ গঠনমুখী হয় তাহলেই এই লেখা সমাজে দীর্ঘদিন আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেঁচে থাকে। আর এমন লেখায় লেখক যেমন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হবেন তেমনি না লিখেও এক শ্রেণীর ভাগ্যবান পাঠক শুধু এ লেখার প্রচার-প্রসার কামনা করে, মানুষকে এ লেখা বা বই পড়ে সংশোধনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টায় শামিল হলে কিয়ামাত পর্যন্ত সাওয়াব পাবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اَجْرُهُ وَمِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِّنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهَا وِزْرُهُ وَمِثْلُ اَوزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِّنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

কোন ব্যক্তি উত্তম কাজের প্রচলন করলে এবং তার অনুসরণ করা হলে সে তার নিজের সাওয়াবও পাবে এবং তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তবে তাদের সাওয়াব থেকে সামান্যও হ্রাস করা হবে না। আবার কোন ব্যক্তি বদ কাজের প্রচলন করলে এবং তা অনুসৃত হলে সে তার নিজের গুনাহর ভাগী হবে এবং উপরন্তু তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহর ভাগীও হবে কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের গুনাহর পরিমাণ মোটেও হ্রাস পাবে না। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, হা. নং-২৬১২, বিআইসি)

অন্যদিকে পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনসহ অধীনস্থ সকলে যেন এ বই সহজেই পায় এবং পড়ে সেদিকেও উৎসাহ প্রদান করা লেখকের হকের আওতাভুক্ত। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যেমন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যে কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে এ ধরনের বই দেয়া বা দেয়ার প্রতি কর্তৃপক্ষকে উৎসাহী করে তুলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অনুযায়ী সাওয়াবের ভাগীদার হওয়া সম্ভব।

লেখকের পাওনা যথাসময়ে প্রদান করা

সম্মানিত লেখকগণ লেখেন, সে লেখা ছাপা হয়, পাঠক কিনেন কিন্তু তাতে লেখক তেমন কিছু পান না– এ কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে আমার শুনা। আর শুনা কথা কেউ বলে সত্য; কেউ বলে মিথ্যা; এ নিয়ে বাকবিতণ্ডায় আমি জড়াতে চাই না। তবে একটি কথা সত্য– লেখক হয়ে লেখকের এ বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এ লেখা লিখেছি বিষয়টি ঠিক এমন নয়। মূলতঃ এ লেখার প্রেরণা দু'টো ঘটনা, একটি নিজে দেখা, আরেকটি কথোপকথনে শুনা ও জানা।

একুশের বইমেলা ২০০৮ শেষ দিন এশার নামায আদায়ের পর একটি স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বই হাতে নিয়ে সূচিপত্র পড়ছি। হঠাৎ কানে আসল 'আজকে আসছি এভাবে ফিরিয়ে দিলে কেমন হয় অন্তত একশত টাকা দেন, বই তো বিক্রি হয়ে গেছে, আজকে মেলাও শেষ, আমাকে একদম ফিরিয়ে দিবেন না। বাকী টাকা না হয় বাংলাবাজার থেকে আনব'। অত্যন্ত কাতরস্বরে অনুরোধের ভাষায় কথাগুলো শুনে দৃষ্টি চলে গেল সেদিকে। দেখলাম, একজন সম্মানিত লেখক ও প্রকাশক কথা বলছেন বিক্রয় কর্মীর সাথে। এবার বিক্রয় কর্মীর প্রতিউত্তর : আজকে টাকা দিতে পারব না, পরে নিবেন। তখন লেখক আবার বলছেন, "দেন-না, একশত টাকা অন্তত দেন-না। সেই বিকেলে আসছি। আল্লাহর রহমতে এতক্ষণ ধরে তো অনেক বই বিক্রয় হয়েছে। আমাকে একশত টাকা দেন।" বিক্রয়কর্মী বললেন, আপনার বই বিক্রয় হয়নি টাকা কিভাবে দেই! প্রতিউত্তরে লেখক বললেন, পাঁচ কপি বই দিয়েছি, এক কপি আছে দেখা যায়, বাকী চার কপি তো বিক্রি হয়েছে এটাও হবে ইনশাআল্লাহ...।" এরপর বিক্রয় কর্মীর দিকে আমি তাকালে সে একশত টাকা লেখককে দিলেন। আমি এ ঘটনায় বিস্মিত হলাম! যাদের লেখা পড়ে আমরা উজ্জীবিত হই, সেখানে তাদের অবস্থা যদি হয় এতটাই নাজুক, তাহলে তা কিভাবে হয়! আমার সাথে তখন একজন বন্ধু ছিল তাকে বললাম, দেখলে ঘটনাটা কেমন! সে বলল, তুমি তো আসছ মাগরিব নামাযের পর কিন্তু আমি উনাকে আসর নামাযের পর থেকে বিভিন্ন স্টলে

স্টলে ঘুরে কথা বলতে দেখেছি। আমি তখন বললাম–
একজন লেখককে লেখা এবং বই ছাপিয়ে বাজারে আনার পর যদি এত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় তাহলে তিনি আর লিখবেন কী করে! একজন লেখকের তো এই মুহূর্তে থাকার কথা লেখার টেবিলে, হাতে থাকার কথা কলম, সামনে থাকার কথা কাগজ, মাথায় থাকার কথা অনাদর্শকে তাড়িত করার জন্য আদর্শিক চিন্তা-চেতনা আর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠার কথা সেই সব অনাদর্শিক দৃশ্যপট– যার বিপরীতে তিনি লিখছেন। কিন্তু তা না করে এখন এখানে, এভাবে বিক্রেতাদের কাছে ঘুরতে হলে কিভাবে হবে? আল্লাহ কবে এ মানুষগুলোর আচরণ পরিবর্তন করে দিবেন। আর সবাই যার যা হক তা পাবে যথাসময়ে যথাযথভাবে, আল্লাহ আমাদের রহম করুন।

এবার দ্বিতীয় ঘটনা, মে ২০০৮ প্রথম সপ্তাহে কথা বলছিলাম একজন স্বনামধন্য লেখকের সাথে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কোন এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে উনার একটি পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর হয়। শর্ত ছিল পনের দিনের মধ্যে উনাকে রয়্যালিটি প্রদান করা হবে। সেই রয়্যালিটি বাবদ তিনি ছয় মাস পর পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছেন আর আজ পর্যন্ত সেই বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীর অষ্টম বছর চলছে তিনি কোন টাকা পাননি। ইতোমধ্যে বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত সমগ্র দেশব্যাপী মাসজিদভিত্তিক পাঠাগারের জন্য কয়েক বছর ধরে তালিকাভুক্ত ছাড়াও আরও দুটি বড় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বই ক্রয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর শত-সহস্র কপি বই ক্রয় করছে আর অন্যান্য পাঠকরা তো এত বছর ধরে ক্রয় করছেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, গত এত বছর বইটির বহু কপি বিক্রয়ের পরও বইটি প্রথম প্রকাশই থেকে যাচ্ছে। কারণ লেখকের সাথে প্রকাশকের চুক্তির একটি শর্ত ছিল যত বার বইটি ছাপা হবে তত বারই লেখক রয়্যালিটি পাবে। আর এই জন্য বইটি বার বার প্রথম প্রকাশের সাল ধরেই ছাপা হচ্ছে নতুন প্রকাশের তারিখ ধরে ছাপা হচ্ছে না। যাহোক বর্তমান বছরের মাস দু-এক আগে লেখকের ছেলে অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি। এ অবস্থায় লেখক প্রকাশকের কাছে বার বার ফোন করে ঐ প্রথমবারের যে চুক্তি হয়েছিল এবং তাতে যে টাকা পাওয়ার কথা ছিল সেই টাকাটা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কয়েক দিন ফোন করার পর কোন পজিটিভ ফলাফল না পেয়ে লেখক তাকে একদিন বলেন যে, ছেলেটা যদি আপনার হতো তাহলে কি আপনি এমনটি করতে পারতেন। একদিন আসলেনও না আর আমার এমন একটি প্রয়োজনের মুহূর্তে যে টাকাটা চুক্তি অনুযায়ী পাওয়া কথা তাও এতটি বছর পর চেয়ে আজ পাচ্ছি না এটা কিভাবে সম্ভব! আপনার

বিবেকের কাছে কি একটুও খারাপ লাগে না। তখন প্রকাশক এক হাজার টাকা দিয়ে তার একজন কর্মচারীকে লেখকের কাছে পাঠিয়েছেন। লেখক রাগে ক্ষোভে লজ্জায় ঐ টাকা তাকে ফেরত পাঠিয়ে বলেছেন আমি তো ভিক্ষা চাইনি, আমি আমার পাওনা টাকা চেয়েছি তাও যখন পেলাম না তখন বুঝলাম আমার চেয়েও আপনার অভাব বেশি তাই টাকা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। আমি এবং আরেকজন ভাই বসা অবস্থায় তিনি যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন যেন আমাদেরই খারাপ লাগছিল। আমরাও কষ্ট পেলাম। আর তখনই মনে মনে ভাবলাম এ বিষয়টি লেখা দরকার। লেখকের হকের প্রতি খেয়াল না রেখে বা লেখককে ঠকিয়ে লেখকের লেখা বিক্রয় করে বহু অর্থ আয় করবেন আর মহান স্রষ্টা আহকামুল হাকিমীন ন্যায়বিচারক তিনি বিচার করবেন না, শাস্তি দিবেন না তা তো হতেই পারে না। সুতরাং এ বিষয়টি আমাদের সম্মানিত প্রকাশক ও বিক্রেতাগণ একটু খেয়াল করবেন বলে আশা করছি। এবার যারা ব্যতিক্রম আছেন তারা তো অবশ্যই ভাল; আরও ভাল থাকবেন মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি।

লেখককে যথাযথ মূল্যায়ন করা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার খাস রহমত আর বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল "লেখা" যা পাঠকদেরকে দেখাতে পারে সঠিক পথ, গড়তে সহযোগিতা করতে পারে আদর্শ জীবন, বাড়িয়ে দিতে পারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ে যেতে পারে পছন্দনীয় আসনে। আর এভাবেই আদর্শিক পথে অনুগামী পাঠক হতে পারে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে আদর্শবান একজন মুমিন ও পরিপূর্ণ মানুষ। সমাজে অর্জন করতে পারে সম্মানের আসন। সুতরাং যে লেখায় রয়েছে এত সঞ্জীবনী শক্তি, অপ্রতিরোধ্য গতি; যে লেখা করতে পারে অনাদর্শের বুকে কুঠারাঘাত আর গড়তে সহায়তা করতে পারে আদর্শ মন-মানসিকতা সম্বলিত আদর্শ মানুষ সে লেখার জন্য লেখকের মূল্যায়ন কেমন হওয়া উচিত তাতো লেখকের কলমে লেখা দুঃসাধ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই এমন সম্মানিত লেখকগণ হোন অবমূল্যায়িত।

অন্যদিকে অনেক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের আচরণ দেখলে মনে হয়, লেখকগণ যেন লিখে এমন অপরাধ করেছেন যার মাশুল তারা কড়া-গণ্ডায় লেখকের কাছ থেকে বুঝে নিতে ব্যস্ত– যা লেখকের হক হরণ করারই শামিল।

শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাছে আজ ও আগামী প্রজন্মের হক

একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে এগিয়ে নিতে, আগামী প্রজন্মের মন-মগজে

আদর্শিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের ভূমিকার অন্ত নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে অন্যতম হলো মেধা। এ মেধার অধিকারী-অধিকারিণী সকলের শ্রদ্ধাশীল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গই হলেন শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ। যাদের কর্ম প্রেরণা ও প্রদর্শিত পথ ধরে আগামী আগামী প্রজন্মও দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হবে দেশ ও দেশের উন্নয়নে সমগ্র মানবতার কল্যাণে।

প্রকৃত অর্থে চিরন্তন সত্য কথা হচ্ছে, যে কোন দেশের উন্নয়নে শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই তাদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্ম হওয়া চাই আদর্শের আদলে, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে, দেশ ও দেশের সুনামকে বৃদ্ধি করে দেশের পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে। যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের এ শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা ব্যক্তি বা কতিপয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থের চেয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে ভূমিকা পালন করেন তাহলেই আজ ও আগামীর হক আদায় হবে নতুবা সমগ্র জাতির কল্যাণ যেমন ব্যাহত হবে তেমনি দেশ ও দেশের অর্থনীতিও পিছিয়ে পড়বে বা মুখ থুবড়ে পড়বে– যা দেশ, জাতি ও জাতি সত্তার জন্য ক্ষতিকর; যা কখনো কাম্য নয়।

যদিও আজকাল কোথাও কোথাও শুনা যায় কতিপয় ব্যক্তিবর্গ মেধার প্রখরতায় উঁচু চেয়ারে সমাসীন হওয়ার সুবাদে চারদিকে লোকমুখে যখন সুনাম ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ যখন তাকে খুব বেশি সম্মান করে, তখন তারা প্রকৃত আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেকেই মডেল হিসেবে মনে করে আবোল-তাবোল বলতে শুরু করে। আর তাদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ. فَبِاَىِّ الٰاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. يَسْئَلُه مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ. فَبِاَىِّ الٰاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ.

"যমিনের উপর যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসশীল, আর অবশিষ্ট থাকবে কেবল আপনার রবের সত্তা, যিনি অধিপতি মহত্ত্ব ও মহানুভবতার। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে আসমান ও জমিনে যারা আছে সকলেই। তিনি সর্বদা মহান কাজে

রত আছেন। অতএব তোমরা দুই জাতি তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? হে জিন ও ইনসান! আমি শীঘ্রই তোমাদের হিসাব-নিকাশের প্রতি মনোনিবেশ করব।" (সূরা আর-রাহমান, ৫৫ : ২৬-৩১)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا.

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষিতদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে যেয়ে বলেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ.

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অপরের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি যার নিকট পৌঁছান তিনি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকেন। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, হা. নং-২৫৯৪, বিআইসি)

আবার যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাকে রং-চং মেরে নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে আজ ও আগামীদেরকে পথচ্যুত করে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলেন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে দোযখকে তার বাসস্থান বানিয়ে নিক। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, হা. নং-২৫৯৬, বিআইসি)

পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে দেশবাসীর হক

দেশ ও বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরে বাংলাদেশী জাতির পরিচয়কে যারা গৌরবান্বিত করছেন, যারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনাগতদের জন্য সম্মানের পথ রচনা করে চলছেন প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তারা হলেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বিভিন্ন বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যবৃন্দ।

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, বিশ্বের মানচিত্রে দেশের সীমানা সংরক্ষণ, সকল অন্যায় ও দুর্নীতির বুকে দুর্বার আঘাত করে জাতিকে আদর্শিক পথ চলায় গতিশীলকরণ এবং সবশেষে একটি কল্যাণধর্মী, সমৃদ্ধশালী আদর্শ

দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে এ শতাব্দীতে উন্নত রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয়ে প্রতিনিয়ত যারা ছুটে চলেছেন এ প্রান্তে ও প্রান্তে দেশের বাইরে, বহিঃবিশ্বের অঙ্গনে তারাই হলেন, পুলিশ, সেনা, নৌ, বিমান, র‍্যাব ও যৌথ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। সেই সাথে দুর্নীতিবাজ, জঙ্গী, সন্ত্রাসী, কালোবাজারী, দরিদ্রের হক হরণকারী, আদর্শবাদী রাজনীতির নামে অপরাজনীতি, এক শ্রেণীর কালো হাতের থাবায় জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর মুখে কালিমা লেপনকারীদের প্রতিহত করার যে আন্দোলন চলছে তার সফল বাস্তবায়নে এ চৌকস ও কর্মঠ বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতাকে আগামী দিনেও সকলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

এভাবে দেশের যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ বাহিনীর সদস্যবৃন্দের পাশে পাওয়ার ফলেই জনগণের প্রত্যাশা আজ আরো বেড়ে গিয়েছে। ফলে অন্যায় যত শক্তিশালীই হোক না কেন অন্যায়ের গর্হিত আচরণে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে ন্যায় বা ন্যায়বানরা যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে সেজন্য এ বাহিনীর কাছে সকল স্তরের লোকদের হক অত্যন্ত বেশি।

আলিম ও উলামার হক

দীনী জ্ঞানে যারা সমৃদ্ধ এবং জ্ঞান বিতরণে যারা রত তারাই উলামায়ে কিরাম, ওলী ও পীর-মাশায়েখ হিসেবে পরিচিত। পরিশ্রম, বিরামহীন পথচলা এবং অত্যন্ত মহব্বত, ভালবাসা ও চেষ্টার ফলে দীনের আলো সর্বত্র জ্বলে উঠেছে। জনসাধারণ অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরীত করে দীনের আলোতে আসছে। বিশ্বের মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ; এ দেশে ইসলাম প্রচার-প্রসার ঘটেছে বিদগ্ধ আলিম ও আল্লাহর ওলীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে। তাদের দেয়া শিক্ষাতেই মানুষ কালিমা, নামায, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। মাসজিদের নগরী ঢাকা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিতিও অর্জন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা তাদের যেভাবে মূল্যায়ন করার দরকার সেভাবে পারছি না বরং অজ্ঞতাবশতঃ বেশি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নামে এমন কিছু করছি যা শারী'অতসম্মত নয়। এতে তাদের অন্তর কষ্টই পাচ্ছে। তারা কখনো এমনটি বলেননি বা শিক্ষা দেননি। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আজ কেউ কেউ তাদের হক হরণ করে চলছে রীতিমত– যা দুঃখজনক।

দীনের নামে বেদীনের প্রচার-প্রসার কখনোই তারা চাননি, বলেননি আর কেউ বললেও আমরা তা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের তরিকার সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা করা থেকে মুক্ত থাকব। তবে তাদের হকের প্রতি খেয়াল রাখা আমাদের সকলের উচিত। তাদেরকে কোনভাবেই অসম্মান বা অপমান করতে চেষ্টা করা বা আলিম-

উলামার উপর যারা এমনিতেই দোষ চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়– তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য পরিষ্কার। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ.

যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে তর্ক-বাহাস করা অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, হা. নং-২৫৯১, বিআইসি)

আলিম ও উলামার কাছে জনগণের হক

দীনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ সকলের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হলেন আলিম ও উলামাগণ। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষদের মাঝে নৈতিকতার বাণী প্রচার-প্রসার ও তা বাস্তবায়নে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

আনাস ইবন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জমিনে আলিমগণের উদাহরণ হচ্ছে আকাশে নক্ষত্ররাজির ন্যায়। এদের সাহায্যে জল ও স্থলের অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায়। আর যদি তারকাবাজি নির্মিলিত হয়ে যায়, তবে পথচারীদের ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (মুসনাদে আহমদ, ইলম, হা. নং-০২, ই.ফা)

এ জন্যেই আজ প্রয়োজন তাদের নিজেদের মাঝেই কথা ও কাজের ঐক্য। কেননা দেশের সকল স্তরের জনগণের কল্যাণে যে কোন জাতীয় ইস্যুতে বা আদর্শ রাষ্ট্র গঠন ও নেতৃত্ব দানে যোগ্যতাসম্পন্ন সৎ নিষ্ঠাবান ও দীনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ উলামায়ে কিরাম ও ওলীদের ছোট-খাট বিভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে বৃহৎ পরিসরে দীনের পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরতে এগিয়ে আসা উচিত। অন্যথায় আদর্শ নেতৃত্বের অভাবে যারা সঠিক ও যথাযথ হক থেকে আজ বিমুখ হচ্ছে, যারা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যারা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে তাদেরকে যে আল্লাহর আদালতে হক প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা না রেখে নিজেদের মধ্যে বিভাজন করে অনৈক্যের ফলে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান তাদেরই জ্ঞান দেন। এবার যারা সেই কল্যাণ পেতে চায় তারা যেন সেই জ্ঞান ব্যবহার করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

আল্লাহ্ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। (সুনান ইবন মাজাহ, মুকাদ্দিমা [ভূমিকা], হা. নং-২২০, আ.প্র)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বারণ করা

দীনী জ্ঞানে সমৃদ্ধ আলিম-উলামার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো তারা নিজেরা যেমন সৎকাজ করবেন অন্যদেরকেও তা করতে বলবেন। বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষ মাসজিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতে নেতৃত্ব দেয়ার কাজে জড়িত আছেন এক বা একাধিক ইমাম ও খতীব। যারা ঐ মাসজিদের মিম্বরে বসে সমসাময়িক সকল সমস্যার কুরআন ও হাদীসভিত্তিক ফায়সালা যদি সকলকে জানানোর চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই সেখানের মানুষ অসৎ কাজ থেকে মুক্ত থেকে সৎ কাজের প্রতি এগিয়ে আসবেন। সমাজ থেকে সকল প্রকার অনৈতিকতা, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ, সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, রাহাজানি, হত্যা, গুমসহ যাবতীয় অন্যায় আচরণ থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে উজ্জীবিত হবে। কেননা আজকে যারা অসৎ কাজ করছে তাদের অধিকাংশই জানে না এ কাজটি কিভাবে করতে হবে বা করলে তার বিপরীতে কারোর ক্ষতি বা হক হরণ হচ্ছে কিনা। তাছাড়া আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন লোকের দ্বারাই এসব সামাজিক অনাচার বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। তাদের পক্ষে যে কোন কাজ করা সম্ভব। আর এজন্যই আলিম-উলামার দায়িত্ব হলো সর্বদা তাদের চোখে যা-যা সমস্যা বলে প্রতীয়মান হয় তা জনগণের সামনে তুলে ধরা, আল-কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে সচেতন এবং তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। আর এ দায়িত্ব মূলতঃ তাদের উপর স্বয়ং স্রষ্টা নিজেই অর্পণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১১০)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকা চাই যারা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর এরাই হবে সফলকাম।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১০৪)

তারপর কোন পদ্ধতিতে ভাল কাজের আদেশ দিবে, কিভাবে দিলে তা মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত হবে। মানুষ তা সুন্দর করে মেনে নিয়ে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে সেই পলিসিও আল্লাহ্ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তমভাবে।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৫)

এখানে আল্লাহর পথে মানুষকে সৎ কাজে আহ্বান ও অসৎ কাজে বারণ করার জন্য তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

০১. হিকমত।

০২. সদুপদেশ।

০৩. সদ্ভাবে বিতর্ক করা।

সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরতকরন যদিও সকলেরই দায়িত্ব, তথাপি এটি আলিমগণের উপরই অধিক পরিমাণে বর্তায়। কারণ তাঁরাই এর পন্থা-পদ্ধতির ব্যাপারে অধিক অবগত।

ভাড়াটিয়াদের কাছে বাড়ির মালিকের হক

শিক্ষা আর কর্মের তাগিদে মানুষকে যেতে হয় পৈতৃক ভিটে বাড়ি ছেড়ে দূরে অনেক দূরে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর অফিস পাড়ার কাছে। মৌলিক প্রয়োজনেই মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজে নিতে হয় অর্থের বিনিময়ে যার যার আয় অনুসারে। কেউবা ভাড়া নেয় সুউচ্চ অট্টালিকার আকাশ পানে, কেউ বা ঝুপড়ি ঘরে কেউ বা বস্তি নামক স্থানের কোন এক কোণে কোন রকমে রাত্রি যাপন করে।

জানি শিক্ষা আর কর্মের তাগিদে সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলো আসে শহর অঞ্চলে। ফলে শহর অঞ্চলের বাড়ির মালিকরা গ্রাম থেকে আসা এমন লোকগুলোর বাসস্থান সমস্যা দূরীভূত করার লক্ষ্যে রাখেন বিরাট এক ভূমিকা। আর তাই ভাড়াটিয়াদের কাছে বাড়ির মালিকের হকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

০১.প্রতি মাসের শুরুতে ০১-০৫ তারিখের মধ্যে বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করে দেয়া উত্তম। অন্যদিকে কোনভাবেই বাড়িওয়ালা যেন খুঁজে ভাড়ার টাকা নিতে না হয় সেদিকেও গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা ভাড়াটিয়াদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

০২. বাড়ি বা ফ্ল্যাটটিকে নিজের মনে করে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রেখে ব্যবহার করা।

০৩. দেয়ালের গায়ে পেরেক বা ময়লা বা দাগ পড়বে এমন কিছু না করা, তারপরও বিশেষ প্রয়োজন হলে মালিকের সাথে আলোচনা করা।

০৪. দরজার সিটকিনি ও জানালার কাঁচ যেন ভেঙে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

০৫. পানির টেপ বা ঝরণা, বৈদ্যুতিক সুইচ ইত্যাদি যত্নের সাথে ব্যবহার করা এবং যেন ভেঙে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

০৬. বাসার মেঝেতে মোজাইক বা টাইলস থাকলে বা এমনিতেও মেঝে ফেটে যাওয়া বা গর্ত হয়ে যেতে পারে এমন কিছু না করা।

০৭. দরজা খুব জোরে না লাগানো; সিড়িতে হাঁটতে ধপাস-ধপাস শব্দ না করা।

০৮. বাড়ির প্রধান ফটক দায়িত্বের সাথে বন্ধ এবং খোলা।

০৯. অনেকে মনে করে ভাড়া নিয়েছি যেমনে ইচ্ছা এমনে ব্যবহার করব এমনটি মনে না করা।

১০. যে কোন সমস্যা বাড়ির মালিককে তৎক্ষণাৎ জানানো।

১১. বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় বাতি নিভিয়ে রাখা। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.

তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না। **(সুনান ইবন মাজাহ, শিষ্টাচার, হা. নং-৩৭৬৯, আ.প্র)**

বিদ্যুৎ অপচয়সহ এভাবে ব্যবহারের কারণে বিল বেশি হয়, বিল যদি বাড়ির মালিক পরিশোধ করে তাহলে তা হবে বাড়ির মালিকের হক হরণ।

আবার বিল ভাড়াটিয়া পরিশোধ করলেও যথেচ্ছা ব্যবহার রাষ্ট্রীয় সম্পদ হরণের সাথে সম্পৃক্ত যা প্রকারান্তরে জনগণের হক হরণ করার শামিল। অন্যদিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, ফ্রিজ, এসি চলার কারণে শর্ট সার্কিট হয়ে যে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে পুড়ে যায়। তাদের বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বলেন :

اِنَّمَا هٰذِهِ عَدُوٌّ لَكُم فَإِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ.

নিশ্চয়ই এ আগুন তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা ঘুমানোর সময় তা নিভিয়ে দাও। **(সুনান ইবন মাজাহ, শিষ্টাচার, হা. নং-৩৭৭০, আ.প্র)**

১২. পানির অপর নাম জীবন। এ পানি ব্যবহারে সকলকে হতে হবে সচেতন। সুতরাং হেয়ালিপনার সাথে অর্ধ বালতি পানিতে গোসলের পর একটি লুঙ্গি না ধোয়া, টেপের নিচে এক বালতি পানি এ অবস্থায় টেপ ছেড়ে ঐ বালতির

পানির ওপরেই হাত মুখ ধোয়া বা অযু করে বালতির পানি ফেলে না দেয়া। লাইনে পানি থাকা না থাকা উভয় অবস্থায় টেপ বন্ধ রেখে পানি অযথা পড়তে না দেয়া, কিচেন ও বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় খেয়াল রেখে টেপ বন্ধ করা ইত্যাদি পানির অপচয়কে কমিয়ে আনতে পারে।

এভাবেই সকল ভাড়াটিয়ারা সচেতন হলে বাড়ির মালিকরা সন্তুষ্ট থাকবেন। এতে মুখ কালো করা, মন খারাপ করার মত কোন পরিস্থিতি হবে না। মূলতঃ মানুষ মানুষের জন্য। আর তাইতো অচেনা এক নগরে অনাত্মীয় মানুষদের সাথে এসে মানুষ সখ্য গড়ে তুলে। এক সময় তারাই হয়ে যায় প্রতিবেশী, আরেকটু এগিয়ে আত্মীয়-নিকটাত্মীয়। তাই ইসলামের এ যে সুমহান ভ্রাতৃ সম্পর্ক তা চিরদিন ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকদের মধ্যে অটুট থাকুক; বাড়ির মালিক ভাড়াটিয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হোক সে জন্যেই এ লেখা।

বাড়ির মালিকের কাছে ভাড়াটিয়ার হক

বাড়ির মালিক বা বাড়িওয়ালা শব্দটি আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত। আসলে বাড়ির মালিকতো মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। অন্যথায় আজকে যাকে আমরা বাড়ির মালিক হিসেবে চিনি হয়তো তিনিও সত্যিকার বাড়ির মালিক নন; অর্থাৎ তার আগে এই বাড়ির মালিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন অন্যজন তথা পৈতৃক সম্পত্তি হলে তাঁর বাবা, বাবার বাবা। আর আজ যিনি কাল তিনি তথা তাঁর ছেলে; তারপর পরবর্তী বংশধর।

সুতরাং কথাটা যদি এভাবে বলি বাড়ির প্রতিনিধি বা তত্ত্বাবধায়কের কাছে ভাড়াটিয়াদের হক তাহলে বোধহয় যথার্থ হতো। মূলতঃ এটুকু ব্যাখ্যা করলাম এ কারণে যে বাড়ির মালিক বা বাড়িওয়ালা এ কথাটির সাথে কেমন যেন একটু অহমিকা ভাব চলে আসে। তবে আমরা যারা এ শব্দটি উচ্চারণ করছি তারা যদি এমন মনে না করি তাহলে অবশ্য সমস্যা থাকার নয়। যা হোক আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা।

এখানে মূল আলোচনা হলো বাড়ির মালিক বা বাড়িওয়ালা বা বাড়ির প্রতিনিধি বা তত্ত্বাবধায়কের কাছে ভাড়াটিয়াদের হক আদৌ আছে কিনা বা থাকলে সেগুলো কী কী? এখানে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক :

০১. বাড়ির বা ফ্ল্যাটের বা কক্ষের ভাড়া যতটা সম্ভব সহনশীল পর্যায়ে রাখা। একটু ভাবুন! সবকিছুর দাম বেড়েছে এটা সত্য কিন্তু আয় তো দামের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি একথা তো সর্বজনবিদিত।

অন্যদিকে বাড়ি নির্মাণে ফিক্সড (স্থায়ী) ব্যয় হয়েছে কিন্তু তার ভেরিয়েবল

(রক্ষণাবেক্ষণ) ব্যয় তো আর সেভাবে প্রতি মাসে লাগছে না। অর্থাৎ এমন বাড়ি আছে যার পাঁচ বছরও চুনকাম করা হয় না বা চুনকাম করা হয় কিন্তু অন্যান্য কোন খরচ তো আর নেই। তবে যে কথাটি না বললেই নয় সেটি হলো ভাড়া নির্ধারণ সম্পূর্ণই বাড়িওয়ালার এখতিয়ার। অবশ্য বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া যত ইচ্ছা ততই নির্ধারণ করতে পারেন। আর বাড়ি যখন আছে ভাড়াটিয়াও পাবেন। এবার ভাড়াটিয়া উপরি বা আলগা অর্থ আয়কারী মানে ঘুষখোর, সুদখোর, দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, কালোবাজারি, হেরোইনখোর, মদখোর হলে যদি আপনার কোন সমস্যা না হয় তাহলে আর কিইবা করার থাকে। কারণ নির্দিষ্ট আয়ের সচ্চরিত্রবান মানুষ তার আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাসা ভাড়া নিবে। সে তো আর আপনার বাসা ভাড়া বেশি হলে নিতে পারবে না। সুতরাং ভাল মানুষ ভাড়াটিয়া হিসেবে পাবেন না। এবার ফলাফল যা হবার তাই। ভাড়াটিয়ার এহেন কৃতকর্মের জন্য দেন-দরবার; সবশেষে হাতে কড়া লাগিয়ে পুলিশের সাথে থানায় যাওয়ার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতাকে কখনো কখনো মেনে নিতে হতে পারে।

০২. পানি, গ্যাস ও দৈব দুর্বিপাকে বিদ্যুতের লাইনে কোন সমস্যা থাকলে তা দ্রুত সমাধান করে দেয়ার চেষ্টা করা।

০৩. ভাড়াটিয়ারা অত্যন্ত কাছে অবস্থানকারী হওয়ায় নিকটতম প্রতিবেশির যে হক তা আদায়ের হুকুম চলে আসে। সুতরাং তাদের সুবিধা, অসুবিধা খোঁজ-খবর নেয়া।

০৪. প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরি হলে চাকুরি চলে যাওয়া, বেতন বন্ধ, রোগ-শোক হওয়ার ফলে ২/৩ মাসের ভাড়া বকেয়া হয়ে যাওয়া– এ পর্বে ভাড়াটিয়াদের সাথে রাগারাগি করা, বকাবকি করা, সবশেষে তাদের বাসা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আটকিয়ে রেখে রুক্ষ আচরণ করে নামিয়ে দেয়া কতটা অমানবিক তা হয়তো বললাম না। কারণ বাড়িওয়ালা পাওনাদার সে তো পাওনা আদায় করতে চাইবেই কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় প্রত্যক্ষভাবে কোন একজন ভাড়াটিয়ার দূরবস্থা দেখে আপনি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মাথায় রেখে তাদের ক্ষমা করে দেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়াতে অন্যভাবে তার সম বা বেশি প্রতিদান দিয়েও দিতে পারেন। আর আখিরাতে এই উসিলায় জান্নাতও দিতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮-১৯)

অন্যকথায়, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে ভাড়াটিয়া যা দেয় বা দিতে পারে তা নেয়া বা যদি ধৈর্যধারণ করেন, তাহলে এটা তো সত্য যে, আল্লাহ্ একজন আছেন। আর সব ফায়সালা আকাশেই হয় তিনি সবকিছু করতে পারেন। দেখুন আপনি হাজী, আপনি গাজী, আপনি নামাযী, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিতাদর্শের পাবন্দী আর তাই এই ভাড়াটিয়াকে আপনার বাড়িতে এনে আপনাকে আল্লাহ পরীক্ষাও তো করতে পারেন! আপনি কেমন হাজী-গাজী-নামাযী?

এবার ছোটবেলায় খুব শোনা কয়েকটি কথা বলে বাড়িওয়ালাদের সচেতনতার দিকে আহ্বান জানিয়ে শেষ করতে চাই। তা হলো– নদীর এ পার ভাঙে ও পার গড়ে এইতো নদীর খেলা; সকাল বেলার আমীররে তুই ফকির সন্ধ্যাবেলা এই আল্লাহর লীলাখেলা; আজকে যে ভাড়াটিয়া কাল সে বাড়িওয়ালা আর আজকের বাড়িওয়ালা কাল যে ভাড়াটিয়া সবই তো আল্লাহর ফায়সালা। অবশ্য এক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াদেরকেও ঐ রকম হতে হবে নতুবা ফায়সালা তার পক্ষে নাও আসতে পারে।

০৫. সব মানুষ তো এক রকম নয়, পাঁচ মায়ের পাঁচ সন্তান পাঁচ রকম হতেই পারে; এখন কোন একজন ভাড়াটিয়াকে আপনার পছন্দ হয় না তাকে আপনার বাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চান তাকে সুন্দর করে বলুন! বুঝিয়ে বলে সংশোধন না হলে প্রায় যৌক্তিক সময়ের আগে থেকেই জানানো ও নোটিশের ভিত্তিতে তাকে অন্যত্র যেতে সুন্দর করে বলা উত্তম।

০৬. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে বাড়ি দিয়েছেন বিশাল এ অট্টালিকা; আপনি যে কোন সময় যে কোন ভাড়াটিয়াকে আপনার বাড়ি ছেড়ে দিতে বলতে পারেন কিন্তু এভাবে একটু চিন্তা করুন না! তার স্থানে আপনি হলে, সে এমন অসময়ে বা হঠাৎ করে বাসা ছেড়ে দিতে বললে আপনি কী করতেন?

০৭. কোথাও কোথাও শুনা যায়, গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের বিল বাড়িওয়ালা পরিশোধ করে ফলে রাত দশটা বাজলেই চিৎকার করতে থাকে লাইট নিভাও ইত্যাদি... ইত্যাদি। যা ভাড়াটিয়ার ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে থাকে। তবে অপচয়কারীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত আছে এটি ভাড়াটিয়া অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।

০৮. কোথাও শুনা যায়, স্বামী-স্ত্রী হলে ভাড়া হবে, সন্তান থাকলে ভাড়া দেয়া

যাবে না বা দেয়া যাবে তবে তা হবে শর্তযুক্ত। কারণ বাচ্চা এটা সেটা ধরবে, ক্ষতি করবে, চিৎকার করবে ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে বাড়িওয়ালার মনে করা উচিত এক সময় আপনিও বাচ্চা ছিলেন এখনও আপনার বাচ্চা (আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত যদি থাকে) আছে বা ছিল, সকল বাচ্চাদের আচরণতো প্রায় একই রকম। কাজেই একটু ত্যাগ, একটু ধৈর্যধারণ করলে তো আল্লাহ খুশি হবেন। সে ভাড়াটিয়ার বাচ্চা বলে কিছু ধরতে পারবে না, একটু দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে না এমনটি মনে করা বা বলা তো ঠিক নয়। বরং বাচ্চাদেরকে আদর করার ব্যাপারে ইসলামে তাকিদ রয়েছে।

০৯. আবার কোথাও শুনা যায়– নিকট আত্মীয়-স্বজন বাসায় আসলে বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালী ঐ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বা সামনে বা শুনিয়ে এমনভাবে বলতে থাকে "কত লোক আসে; সারাক্ষণ শুধু আত্মীয়-স্বজনই আসে ফকিরা নাকি? ঢাকা শহরে আর থাকার কোন জায়গা নাই! আমার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাও। এত মেহমান আসে কেন তোমাদের? আগে তো বল নাই। বাথরুম ভরে যাচ্ছে। পানি বেশি খরচ হচ্ছে, আমার বাড়িতে বেশি বেশি লোকের চাপ পড়ছে ইত্যাদি– যা দুঃখজনক। ভাড়াটিয়ার স্থানে আপনি থাকলে আপনার কেমন লাগবে একটু ভেবে দেখবেন কি?

১০. ভাড়া দিয়েছি স্বামী-স্ত্রী ও তাদের একজন বাচ্চা মোট তিনজন থাকবে একথা শুনে। কিন্তু এখন আরেক বাচ্চা নতুন জন্ম হয়েছে তাই আমাদের বাসা ছেড়ে দাও। এখন চারজন হয়ে গেছ নতুবা ভাড়া বাড়িয়ে দাও ইত্যাদি বলে– যা নতুনের আগমনে খুশি হওয়ার স্থলে পিতা-মাতাকে ভাবিয়ে তুলে।

১১. স্বামী বা স্ত্রীর ভাই বিদেশ থেকে আসছে। বিয়ে করবে, তার বউ নির্বাচন করতে হবে ফলে বাসায় একটু মেহমানের আনাগোনা হতে পারে তাই এই মাসের জন্য ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে। হয় থাক নতুবা চলে যাও এমনটি না বলা।

১২. সিকিউরিটি বাবদ ৫/৬ মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে। আর রাত ১১টা থেকে ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত মেইন গেট বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে প্রবেশ ও বাইরে যাওয়া নিষেধ ইত্যাদি শর্ত জুড়ে না দেয়া। আপনার সন্তান বা আপনি যদি রাত ১১টার পরেও বাসায় ঢুকতে পারেন তাহলে ভাড়াটিয়া বিশেষ কোন কারণে কখনও কখনও একটু দেরি হলে কেন আপনার মুখ কালো দেখবে? আপনার বাড়ির ভাড়াটিয়া বলে! না, এমন করে কষ্ট দিবেন না। একটু ত্যাগ-তিতিক্ষা অর্জন করুন। সব সময় তো আর ভাড়াটিয়া এমনটি করে না।

১৩. একই ভবনের একই ফ্লোরে দু'টো ইউনিট। সবকিছু একই রকম। একটির দক্ষিণে বারান্দা অন্যটির উত্তরে বারান্দা। এবার যে ভাড়াটিয়া দক্ষিণের ইউনিটটি ভাড়া নিবে তাকে যা দিতে হবে উত্তরের ইউনিট ভাড়া নিলে প্রায় ঐটা থেকে ১০০০ টাকা কম দিতে হবে। কারণ দক্ষিণের হাওয়ার একটা বিশাল চাহিদা আমাদের অনেকের মনে রয়েছে। তাহলে বুঝা গেল, বাতাসের জন্য ১০০০ টাকা পার্থক্য হয়ে গেল। এখন এ বাতাস তো আল্লাহর দেয়া সম্পদ। আলো তো আল্লাহর দেয়া সম্পদ। এর জন্য কিভাবে এ পার্থক্য হতে পারে? আমার কাছে মনে হয়েছে এটিও যেন দক্ষিণের ইউনিট যারা ভাড়া নিবে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া একটি আর্থিক শর্ত। অন্যকথায় কী হবে তার বিচারের ভার আপনাদের উপর থাকল। আবার কোথাও দেখা যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয় ফ্লোরের ভাড়া নিচতলা, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলার ভাড়া থেকে বেশি; কারণ সুবিধা কিন্তু এটাও ইসলাম সমর্থন করে বলে মনে হয় না। মূলতঃ বিষয়টি এমন হতে পারে, যে আগে আসে সে পাবে। যে পরে আসে সে তো আর ঐ ইউনিটটি ফাঁকা পাবে না। কাজেই ভাড়াও নিতে পারবে না। হয়তো বিষয়টি এমন হওয়া ইসলাম সমর্থন করে।

সবশেষে বলব এক হাতে তালি বাজে না। তালি বাজাতে হলে দু'হাত লাগে। সুতরাং বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি পজিটিভ মনের হলে হক আদায়ে কোন বাধা থাকে না। আল্লাহ্ উভয়কে রহম দান করুন।

বাড়িওয়ালার কাছে পাশের বাড়িওয়ালার হক

দীর্ঘদিন যিনি বা যারা পাশে থাকবেন, সুখ-দুঃখের সাথী হবেন, বিপদ-আপদে আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও আগে মুহূর্তের মধ্যে পাশে দাঁড়াবেন তারাই হচ্ছেন পাশের বাড়িওয়ালা। আসলে বাড়িওয়ালার সাথে পাশের বাড়িওয়ালার সম্পর্ক থাকারই কথা। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য– এ স্বাভাবিকতা, একে অপরের প্রতি মহানুভবতা, ছোট-খাট মতদ্বন্দ্বে তাদের মধ্যে দুঃসম্পর্কের পাহাড় গড়ে দেয়। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুনা যায়, দেখা যায় উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য। কারণ কেউ না কেউ বা কোন না কোন একজন অন্য জনের হক হরণের সাথে সম্পৃক্ত। এখন প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে?

০১. প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে বাধে সেটি হচ্ছে বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা। কোন রকম পেছনের প্লট হলেই বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিককে ডেকে পেছনের প্লটটি হয় বিক্রি করতে উৎসাহিত করা হয় আর না হয় রাস্তা কিনে নিতে বলে চড়া দাম হাকা হয়। এখানেই শেষ নয় রাস্তা হবে সরু এবং এতটা সরু যে, কোনরকমে দু'জন লোক অর্থাৎ একে অপরকে অতিক্রম করতে পারবে এমন অবস্থা। সুতরাং সুসম্পর্ক থাকবে কী করে বলুন!

অথচ এ প্রসঙ্গে প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে বলেন :

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ.

তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল আহকাম [বিচার ও বিধান], হা. নং-২৩৩৯, আ.প্র)

০২. নতুন ভবন নির্মাণে পাশের বাড়ি যেন কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটা যারা পাশে অবস্থান করছে তাদের হক।

০৩. ইট, বালি, সিমেন্ট রাখা ও দেয়ালের গায়ে পানি দেয়া ইত্যাদি করার সময় নিচে যেন না পড়ে সেজন্য পাটের বস্তা বা টিন দিয়ে শেড তৈরি করে নেয়া। অন্যথায় ইট পড়ে আহত হওয়া, পানি পড়ে কাপড়-চোপড় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এ নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব হতেও দেখা যায়।

০৪. ইট, বালি, সিমেন্ট, বড় বাঁশ, কাঠ, চাটাই ইত্যাদি যতটা সম্ভব নিজের ভবনের এ পাশ-ওপাশ করে রাখার চেষ্টা করা, প্রতিবেশিদের পথ চলার রাস্তা একদম বন্ধ না করা এবং দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা করা।

০৫. ঘরের ছাদে বা চালে বৃষ্টির পানি জমে তা যেন পাশের প্রতিবেশির কোন কিছুর নষ্টের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

০৬. ছাদের উপর বা পাশের বাড়িতে হাঁস, মুরগ-মুরগী, গরু বা ছাগলের খামার না করা। সাধারণত বসবাসের বাড়ির পাশে এ ধরনের খামার হলে পশুর বিষ্টা থেকে দুর্গন্ধ হয়। আর এতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কষ্ট পেতে পারে, যা প্রতিবেশিদের মুক্তবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। প্রতিবেশির ঘরের পাশে, বাড়ির সামনে গরু-ছাগলের ঘর, টয়লেট, গরুর বিষ্টা সংরক্ষণের স্থান ইত্যাদি গড়ে তুলে প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়া তাদের হক হরণতুল্য।

০৭. ঘরের পাশে ঘর হওয়ার সুবাদে কোন একজনের ঘরে যা কথা হয় তা শুনে অন্যকে জানিয়ে দেয়া (গীবততুল্য) যার কারণে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হতে পারে তাও হক হরণতুল্য।

০৮. আমার বাড়িতে আমি পুকুর কাটব যা ইচ্ছা তাই করব– এমন বলা এবং এমন কিছু না করা। অর্থাৎ পাশের বাড়িওয়ালার কষ্ট হবে এমন কিছু করা ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করে না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা এমন করে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল আহকাম [বিচার ও বিধান], হা. নং-২৩৪১, আ.প্র)

مَنْ ضَارَّ اَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল আহকাম [বিচার ও বিধান] হা. নং-২৩৪২, আ.প্র)

ধনী ব্যক্তির কাছে দরিদ্রের হক

ধনী কে

ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী কে? কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোন ব্যক্তিকে ধনী বলা যাবে এবং তার কাছে দরিদ্রের হক প্রতিষ্ঠা পাবে তা আলোচনা করা হলো:

ইসলামে দৃষ্টিতে তিন ক্যাটাগরীর লোকদেরকে ধনী বলা যাবে। যেমন :

০১. যে পরিমাণ মালের মালিক হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক হয়।

০২. যে পরিমাণ মালের মালিক হলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান করতে হয় না, কিন্তু কুরবানী করা ও রোযার ফিতরা প্রদান বাধ্যতামূলক হয়।

০৩. যে পরিমাণ মালের মালিক হলে কোন ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ও রোযার ফিতরা প্রদান বাধ্যতামূলক হয় না কিন্তু তার জন্য অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হারাম হয়।

দরিদ্র ও দারিদ্র্য কী

দরিদ্রদের অবস্থাই হচ্ছে দারিদ্র্য। ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র হচ্ছে বেকার ও কর্মহীন শ্রমিক ও মজুর যারা অভাবের তাড়নায় নিজ এলাকা বাস্তুভিটা এমনকি দেশ ত্যাগ করেছে। শারীরিকভাবে যারা অক্ষম ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ।

এবার প্রশ্ন আসতে পারে, দরিদ্রদের অবস্থা কেমন? দারিদ্র্যই বা কী?

❖ দারিদ্র্য হলো ক্ষুধা।

❖ দারিদ্র্য হলো আশ্রয়ের অভাব;

❖ দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থাভাবে পড়ালেখা করতে না পারা, না জানা।

❖ দারিদ্র্য এমন অবস্থা যখন কেউ অসুস্থ হয় কিন্তু তার ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য থাকে না।

❖ দারিদ্র্য বেকারত্ব যা ভবিষ্যতের জীবনকে অনিশ্চিত ও শঙ্কিত করে তোলে।

❖ দারিদ্র্য হচ্ছে দূষিত পানি পান করে শিশুদের অসুস্থ হয়ে যাওয়া।

❖ দারিদ্র্য হচ্ছে ক্ষমতাহীনতা, জনপ্রতিনিধিত্ব ও স্বাধীনতার সংকট।

❖ দারিদ্র্য হচ্ছে এমন পরিস্থিতি যা সমাজের ধনী ও দরিদ্র কেউই চায় না। মূলতঃ দরিদ্ররা দারিদ্র্য চায়না এ কারণে যে এটি তাদের জন্য অসহনীয় আর ধনী চায় না কারণ দারিদ্র্য অনিবার্যভাবে সমাজ সংসারে এমন সব অনাচার সৃষ্টি করে যা ধনীর সুখ কেড়ে নেয়। ক্ষুধার যন্ত্রণা, হাহাকারে বৃদ্ধি পায় সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুন, ছিনতাই ও চাঁদাবাজি। যার ফলে বিপন্ন হয় জীবন, দূষিত হয় পরিবেশ, রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে মহামারি আকারে যার থেকে দরিদ্র-ধনী কেউ নিস্তার পায় না।

সুন্দর কথা, সদ্ব্যবহার প্রাপ্তি দরিদ্রের হক

আজকাল দরিদ্ররা সমাজে প্রতিনিয়ত নানাভাবে ধনীদের দ্বারা হক বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যেমন :

❖ ধনী পরিবারে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাকর-চাকরানি ও বুয়ার সাথে রূঢ় আচরণ করতে দেখা যায়। পরিবারের কর্তা-কর্ত্রীর পথ ও মত অনুসরণ করে তাদের সন্তানেরা পর্যন্ত বয়সে বড় এমন ব্যক্তিদের নাম ধরে ডাকতে, ধমক ও আদেশ-নির্দেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অধিকন্তু তাদের বাসায় কাজ করার সুবাদে ওদের পিতা-মাতার রাখা সুন্দর সুন্দর অর্থবোধক নামগুলোকে বিকৃত করে ডেকে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজনের নাম মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান। তাকে ডাকে খইল্লা, নাছিরকে ডাকে নাইচ্ছা, রশিদকে ডাকে রইস্যা– যা দুঃখজনক এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তাই আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ.

"তোমরা পরস্পরের বদনাম করো না, বিকৃত উপাধিতে ডেকো না।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : ১১)

❖ কখনও দেখা যায় পিতা-মাতার সাথে ছেলে-মেয়েরা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে; এমন অবস্থায় পিতা-মাতা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ছেলে সিএনজি, ট্যাক্সিক্যাব বা রিক্সাওয়ালাকে ডাকছে ঐ সিএনজি, ঐ ট্যাক্সি, ঐ রিক্সা থামলে বলে যাইবা! এতে সিএনজি, ট্যাক্সি ও রিক্সা চালক টলটল করে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে হয়তো ভাবে তোমাদের চেয়ে বড় ছেলে-মেয়েই আমাদের আছে; তারাতো এভাবে কথা বলে না। অথচ আদবের সাথে এভাবে বলা দরকার ছিল–ভাই! অমুক জায়গায় যাবেন? কত টাকা ভাড়া নিবেন বা কত দিতে হবে ইত্যাদি। যাহোক কী আর করার। কপাল দোষে আমরা ড্রাইভার। কাজেই আমাদেরকে তো আর তারা ঐভাবে বলবে না– এ কথা মনে করে তারা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থাকে।

❖ আবার কখনো দেখা যায়, ধনীরা দরিদ্রদের সম্পদ দান করে। আর চায় তারা তাদের অধীনে থাকবে, হুকুমের তাবেদার হবে, একটু ব্যতিক্রম হলে সবার সামনে দানের কথা বলে লজ্জা দিয়ে থাকে– যা খোটা দেয়ার সাথে সম্পৃক্ত। ফলে দরিদ্ররা অপমানবোধ করে থাকে। তাই আল্লাহ্ বলেন :

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ.

"ভাল কথা এবং ক্ষমা সে দানের চাইতে শ্রেয়, যার পরে ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, পরম সহনশীল।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৬৩)

❖ রাস্তা বা পথিমধ্যে ভিক্ষুকরা কখনো হাত পাতলে কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় ধমক দিতে। সেই সাথে ভিক্ষাতো দেয়ই না বরং আরো উপহাস করে তাড়িয়ে দেয়– যা কোনভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না।

❖ ধনীদের বাসায় দরিদ্র শ্রেণীর কেউ আসলে (বিশেষ করে শহর অঞ্চলে) তাদের সাথে কেউ কেউ সুন্দর করে কথা বলতে চায় না; সম্মান প্রদর্শন করে না; তাদের বাসার দামী সোফায় বসতে দিতে চায় না, খাওয়া-দাওয়া দিলেও সবার সাথে ডাইনিং টেবিলে বসাতে চায় না। এমনকি কোথাও কোথাও দেখা যায় প্লেট পর্যন্ত ভিন্ন হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

"মানুষের সাথে সদালাপ করবে।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ৮৩)

❖ ওরা কখনো বিপদের মুখোমুখি হয়ে কর্জে হাসানা বা টাকা ঋণ চাইলে ধনীরা দিতে চায় না। অথচ কোন একজন ধনী ব্যক্তি ঋণ চাইলে তা দিতে বিলম্ব করে না। যাকে বলে তেলের মাথায় তেল দেয়া– যা দুঃখজনক।

❖ দরিদ্ররা অসুস্থ হলে ধনীরা তাদের সেবা দূরে থাক দেখতেই যেতে চায় না। ভাবে গেলে হয়তো কিছু দিতে হতে পারে। অথচ অনেক সম্পদশালী কিন্তু নিকটতম আত্মীয় বা প্রতিবেশী নয় এমন কেউ অসুস্থ হলেও কাউকে কাউকে তাদের খেদমতে হাজির হওয়াসহ বার-বার ফোনে খোঁজ-খবর নিতে দেখা যায়।

❖ সমাজে কোন উন্নয়নমূলক কাজ বা কোন অনুষ্ঠানে দরিদ্রদেরকে মতামত প্রদানের সুযোগ ও দাওয়াত প্রদান করা হয় না অথবা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেও তাদের হাসিমুখে গ্রহণ করা হয় না।

❖ সমাজে এমন অনেক লোক আছে দরিদ্র কিন্তু সৎ, তাদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ থাকলেও তারা তা করে না। সাধারণ জীবন-যাপন করে। তাই আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ায় এক শ্রেণীর ধনী মানুষ তাদেরকে মূল্যায়ন করে না, তাদের সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করতে চায় না। তাই আল্লাহর রাসূল ঐ সৎ কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে (দু'আ করে) বলেন :

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَا عَائِشَةُ لاَ تَرُدِّى الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ اَحِبِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَاِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র হিসেবে জীবিত রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের দলভুক্ত করে হাশর করিও। (একথা শুনে) আয়িশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এরূপ বলছেন? তিনি বলেন : হে আয়িশা! তারা তো তাদের (ধনীদের) চাইতে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তুমি যাঞ্ছাকারী দরিদ্রকে ফিরিয়ে দিও না। যদি তোমার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকে, তবে একটি খেজুরের টুকরা হলেও তাকে দিও। হে আয়িশা! তুমি দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার সান্নিধ্যে রাখবে। তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখবেন।" (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুস যুহদ, হা. নং-২২৯৪, বিআইসি)

তাই, ধনী হওয়ার সুবাদে অহমিকা আর দাম্ভিকতায় ডুবে না থেকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সাথে সুন্দর কথা ও আচরণ প্রকাশ করে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে সোচ্চার হওয়া উচিত। নতুবা অসুন্দর কথা ও আচার-ব্যবহার সমাজ জীবনে অস্থিরতাসহ অনেক সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করে অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বালিয়ে দিতে পারে। কেননা-

০১. মন্দ কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়; মনে কষ্ট পায়।
০২. পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।
০৩. সুসম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।
০৪. প্রতিবেশিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে এগিয়ে আসতে চায় না।
০৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
০৬. একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়; বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।
০৭. পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় ও সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
০৮. রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।
০৯. মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান, পজিশন বিনষ্ট হয়।
১০. সমাজে দ্বন্দ্ব, কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।
১১. ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।
১২. এমন ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করলেও প্রতিবেশিরা লাশ কাঁধে নেয় না বা ভবিষ্যতে নেবে না বলে বলতেও শুনা যায় অনেক এলাকায়।

১৩. রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে। পারস্পরিক মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রদর্শন বিলীন হয়ে যায়।

সম্পদে দরিদ্রের হক

সমাজে যারা ধনী বা বিত্তবান তাদের ধন-সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হক বা অধিকার রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.
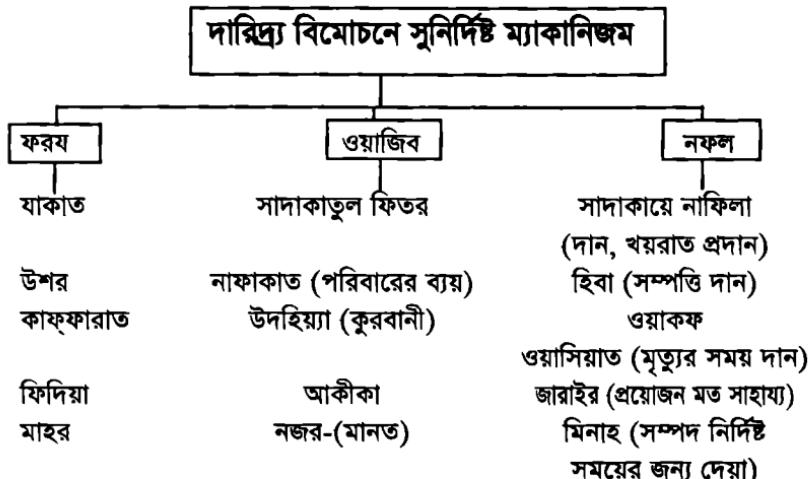
"বিত্তবানদের ধন-মালে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত হক রয়েছে।" (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ১৯)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তন না করে।" (সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ০৭)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ ঘোষণা শুধু ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করেই নয় বরং ধন-সম্পদের ব্যাপক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য বাস্তব কর্মপন্থার কথাও ইসলামে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্র্যদের অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার কথা মনে করে বিত্তবানদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের সম্পদ বণ্টন ও দরিদ্রদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সতর্ক করতেন। আর তাই ধনীদের সম্পর্কে দরিদ্রদের হক বা অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়ে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে সম্পদ হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট ম্যাকানিজম তৈরি করেছে।

দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখিত এ সুনির্দিষ্ট ম্যাকানিজম ফরয ও ওয়াজিব স্তরের সবগুলো ক্ষেত্র সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রতি যে আদেশ ও নির্দেশ তা অবশ্যই দরিদ্রদের হাতে হিসাব করে তুলে দিতে হবে। এ স্তরের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ধনীদের হাত থেকে সম্পদ দরিদ্র প্রতিবেশী, নিকট ও দূর আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভব হলে দূরের তথা নিজেদের মধ্যে নেয়ার মত না থাকলে অন্য সমাজে, দেশে ও দেশের বাইরেও অবস্থানরত দরিদ্রদের পাওয়ার হক রয়েছে। দরিদ্রদের সম্পদ দেয়া সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়ায় বসবাসকারী সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের (ধনী ব্যক্তি) প্রতি সুস্পষ্ট আদেশ। আর তাই এটি প্রতিষ্ঠা করা মানে আল্লাহর হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আদায় করা মানে আল্লাহর হক আদায় করা আর দরিদ্রদের হক আদায় করাতো বটেই। এজন্যেই যে সকল ধনী ও সম্পদশালীরা যথাযথ হিসাব করে যথাসময়ে তা দরিদ্রদের হাতে তুলে দিতে কার্পণ্য করে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন এবং বিভিন্ন বালা-মুসিবত থেকে হিফাযত করেন। পক্ষান্তরে যারা এ হক আদায় করে না তাদের দুনিয়ার জীবনেই শাস্তিস্বরূপ নানা বিপদ-আপদ, পেরেশানী, জটিল রোগ-শোক ইত্যাদি গযব দেন আর মৃত্যুর পরতো শাস্তি আছেই।

তারপর তৃতীয় স্তরে নফল দানগুলোও ধনী ব্যক্তিরা যথাসম্ভব দরিদ্রদের প্রদান করে তাদের প্রতি ইহসান করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খুব খুশি হন। এতে মানবের প্রতি ভালবাসা, দয়া ও স্নেহ-মমতা ফুটে উঠে, সমাজ ব্যবস্থা হয় সুসংগঠিত। মানুষের মাঝে আদর্শিক সম্পর্ক হয় সুদৃঢ়, দূর হয় মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, আর সকল প্রকার দুর্নীতি। ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় ভ্রাতৃত্ববোধ আর এক আল্লাহর তাওহীদ বাণী।

ধনী ও দরিদ্রের জন্য পুরস্কার

যারা ইসলামের প্রদর্শিত পথে মেধা ও শ্রম দিয়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে ধনী হয়ে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে, কখনো ইসলামে নিষেধ এমন কোন কিছু করা বা করানোর জন্য অর্থ ব্যয় করে না, তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে রয়েছে মহাপুরস্কারের ঘোষণা। আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ.

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন।" (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ.

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৭২)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

"কল্যাণকর খাতে যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২৭৩)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবতার কল্যাণে অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

অন্যদিকে দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষ যারা অভাব সত্ত্বেও আল্লাহ্ বিরোধী কোন কাজ করে না, ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায়, আল্লাহমুখিতায় নিজেদের নাফসকে বিনীত রাখে, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে না, তাদের পুরস্কারও ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলেন :

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের চেয়ে পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ, হা. নং-২২৯৩, বিআইসি)

মজলুমের হক

যে জালেম কর্তৃক যুলুমের শিকার সেই মজলুম। অর্থাৎ যে অত্যাচারিত হয়; যে শক্তিমানদের দ্বারা শোষিত হয়, এক কথায় যে কোনভাবে হক বা অধিকার বঞ্চিত সেই মজলুম। প্রসঙ্গতই আলোচনায় আসে জালেম কে? জালেম প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَنِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ

الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কারণ যার উপহাস করা হচ্ছে সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কারণ যার উপহাস করা হচ্ছে সে উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (কাউকে) মন্দ নামে ডাকা গর্হিত ও নিন্দনীয়। যারা এরূপ আচরণ থেকে বিরত হয় না তারাই জালেম।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১১)

মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা

আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ, আদর্শ জাতি ও আদর্শ দেশ গড়ার লক্ষ্যে জালেমের যুলুমের প্রতিবাদ ও মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীস অনুকরণকারী মুসলিমদের একে অপরের হক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালেম হোক কিংবা মজলুম। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুমকে আমরা সাহায্য করবো এটা তো বুঝলাম কিন্তু জালেমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, "তুমি তার (জালেমের) হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।" (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাজালিস ওয়াল কিসাস, হা. নং-২২৬৫, আ.প্র)

এভাবে কোথাও যদি কোন মুসলিমের উপর বিপদ-আপদ আসে, দীনের কারণে নির্যাতিত হয়, পরিবার সমাজ ও দেশে অত্যাচারিত হয় তাহলে অন্যান্য মুসলিমদের উপর ফরয হলো তাদেরকে সাহায্য করা এবং যথাসাধ্য তাদের সাহায্য দানের চেষ্টা চালানো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةَ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارَ الْقَسَمِ.

বার'আ ইবন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি (আদেশকৃত সাতটি বিষয়ের) উল্লেখ করলেন : ১. পীড়িতকে দেখতে যাওয়া, ২. জানাযা অনুগমন করা, ৩. হাঁচিদাতার (আলহামদু লিল্লাহর) জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, ৪. সালামের জবাব দেয়া, ৫. মজলুমকে সাহায্য করা, ৬. দাওয়াত কবুল করা, ৭. কসম পুরা করা। (বুখারী, কিতাবুল মাজালিস ওয়াল কিসাস, হা. নং-২২৬৬, আ.প্র)

দোষ-ত্রুটি গোপন ও শুধরে দেয়া

দোষ-গুণ মিলেই মানুষ। পশু প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনায় অনেক ভাল মানুষও অকস্মাৎ মন্দ কাজ করে বসতে পারে। আর সেটিকে কেন্দ্র করে তাকে অসম্মান, অপমান ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টাও এক ধরনের যুলুম। এমন যুলুম করে জালেম হিসেবে আল্লাহর আদালতে গণ্য হওয়ার চেয়ে বরং অন্য ভাইয়ের এ দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাই উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لاَيَسْتُرُعِيدٌ عَلى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও তার ত্রুটি গোপন রাখবেন। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৪০৮, বিআইসি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّعَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً من كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুসলিম একে অপরের ভাই। সুতরাং সে তার ভাইয়ের উপর যুলুম করতে পারে না এবং তাকে কোন বিপদ ও অসহায় অবস্থায় ফেলতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে কোন মুসলিমের দুঃখ দূর করে দিবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন করে রাখবে আল্লাহ হাশরের ময়দানে তার ত্রুটিও গোপন করে রাখবেন। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৯২, বিআইসি)

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, কোন ভাই যদি অকস্মাৎ কোন ভুল করে তাহলে তা ক্ষমা করা বা গোপন রাখা এবং সম্ভব হলে ঐ ভাইয়ের কাছ থেকে সময় নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বসে তার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করে তা শুধরে দেয়ার চেষ্টা করলে আল্লাহ খুশি হবেন।

মুসলিমদের পারস্পরিক দয়া-ভালবাসা

মুসলিমগণ বিশ্বের যে কোন দেশে যে কোন প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন তাদের সকলের মাঝে গড়ে উঠে এক ঈমানী বন্ধন– যা সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। ফলে মুসলিমদের উপর বিশ্বের কোথাও কোন আক্রমণ হওয়া মাত্র সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের আঘাত লাগে। মুসলিমরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। দিনের পর দিন তারা চোখের পানি ফেলেও প্রতিবাদ করে থাকে। তাইতো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া, একের প্রতি অপরের আকর্ষণ ও ঐক্যের ক্ষেত্রে মুমিনের উদাহরণ হলো একটি শরীর। যখন শরীরের কোন একটি অংশ পীড়িত হয়ে পড়ে তখন শরীরের অবশিষ্ট অংশের তাতে অনিদ্রা, অস্বস্তিবোধ হয় এবং জ্বর এসে যায়। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৪০০, বিআইসি)

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

মুমিনগণ হলেন একই ব্যক্তির সদৃশ। যদি তার মাথা রোগাক্রান্ত হয় তাহলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গও অস্বস্তি, রাত জাগরণ ও উত্তাপে তার সাথী হয়। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৪০২, বিআইসি)

অন্যত্র মুমিনদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখাতে যেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা প্রাসাদ বা অট্টালিকাতুল্য। যেমন-

عَنْ اَبِى مُوْسى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ.

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য যার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে। এ কথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস, হা. নং-২২৬৭, আ.প্র)

মজলুমের দু'আ-বদদু'আ

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তথা দীন দরিদ্র, জাতি সত্তাগত দিক থেকে মুসলিম বা

সংখ্যালঘু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে যারা পরীক্ষার মুখোমুখি, দুর্ভাগ্যবশত যারা বাল্যকালেই পিতা বা মাতাহারা ইয়াতীম, স্বামীহারা বিধবা তাদের সাথে অন্যায় আচরণ ও যুলুম করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খুব অপছন্দ করেন। তাদের করুণ আর্তি, দীর্ঘশ্বাস আহাজারি আর দু'হাত তুলে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে দু'আ ও বদদু'আ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দ্রুত কবুল করে নেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রা)কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাওয়ার সময়) তাঁকে বলেন, মজলুমের বদদু'আকে ভয় কর। কেননা তার বদদু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই। (আল-বুখারী, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস, হা. নং-২২৬৯, আ.প্র.)

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَشَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

তিন ব্যক্তির দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মজলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য পিতার দু'আ। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুদ দাওয়াত, হা. নং-৩৮৬২, আ.প্র)

মুসাফিরের হক

মুসাফির মুসলিম অমুসলিম যেই হোক না কেন মানবতার দৃষ্টিতে তার প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করা কর্তব্য। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ শেষ হওয়া, হারিয়ে যাওয়া বা ছিনতাই হওয়ার মত দুর্ঘটনার মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তি সাহায্য পাওয়া তার হক হিসেবেই গণ্য।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যাকাতের টাকা-পয়সার হকদার হলেন আট শ্রেণীর লোকজন। এ আট শ্রেণীর মধ্যে একটি হলেন মুসাফির। এক্ষেত্রে মুসাফির দরিদ্র হতে হবে বা কোন অঙ্গহানী হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বরং এলাকায় সে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেও মুসাফির অবস্থায় তার বর্তমান সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে সে খুব বেশি অসহায় হয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এ সময় তাকে যে বা যারা সাহায্য-সহযোগিতা করবে আল্লাহ তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন।

মুসাফিরের হক প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ثَلاَثُ دَعْوَاتٌ مُسْتَجَابَاتُ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلى وَلَدِهِ.

তিন দু'আ কবুল হয়। নির্যাতিতের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের প্রতি পিতার বদদু'আ। (তিরমিযী, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হা. নং-৩৩৮০, বিআইসি)

খাদেমের হক

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খেদমতে নিয়োজিত লোকজনই খাদেম। তারা ব্যক্তির কর্মে সফলতার সহায়ক শক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানে সামগ্রিক পরিচর্যার বিশাল দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাদের সহায়তায় ব্যক্তি হয়ে উঠেন আরো কর্মতৎপর ও গতিশীল। আর তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সব সময় পরিপাটি রাখার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ খাদেমের বিকল্প কোন সহায়ক শক্তি নেই। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য এমন লোকজন সমাজে নানাভাবে নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ তাদেরকে মানুষ হিসেবে যে মূল্যায়ন করা দরকার তাও করে না অর্থাৎ তারাও যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ; একই স্রষ্টার সৃষ্টি– এটা মনেই করে না। সারাক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় তাদেরকে ব্যবহার করে অথচ যন্ত্র সচল রাখতে তার পরিচর্যায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় সে পরিমাণ বেতনও কেউ কেউ খাদেমকে দিতে চায় না। তারপর আদেশের সাথে আদেশ, একটু বিলম্ব হলে ধমক, রক্ত চক্ষুর শাসন, ভুল হলে মারধর ইত্যাদি করতেও শুনা যায়। আবার কেউ কেউ খাদেমকে নিজের হুকুমের তাবেদার হিসেবেও গণ্য করে থাকে। অথচ তাদেরও যে বিশ্রামের দরকার আছে, যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়ার দরকার আছে, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন আছে তা অনেকে ভুলেই যায়। তারা খাদেমের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধকে মূল্যায়ন করে না, তাদের প্রতি এক রকম অমানবিক আচরণ করে থাকে– যা মানবতার ধর্ম ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না।

খাদেমের সাথে সদয় ব্যবহার করা

খাদেমের সাথে কর্তা ব্যক্তিদের ব্যবহার, আচার-আচরণ ও সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِخْوَانُكُمْ جَعَلَكُمُ اللهُ فِتْيَةً تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلاَيُكَلِّفْهُ مَايَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَايَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

এরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ পাক এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার এরূপ ভাই তার অধীনে আছে, সে যেন তাকে নিজের খাবার থেকে

খেতে দেয় এবং নিজের পোশাক থেকে পরতে দেয়। সে যেন তার উপর কাজের এমন বোঝা না চাপায় যা তাকে অপারগ করে দেয়। যদি সে তার উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপায় তবে সে যেন তার সহযোগিতা করে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ্, হা. নং-১৮৯৫, বিআইসি)

খাদেমকে মারধর ও গালি না দেয়া

কাজ করতে গেলে কাজে ভুল হবে, মেশিন চালাতে থাকলে মেশিন নষ্ট হবে কিন্তু তার ভয়ে কেউ কাজ থামিয়ে রাখে না– তেমনি খাদেমও একজন মানুষ হওয়ায় সে কাজে ভুল করবে এটা স্বাভাবিক। কারণ খাদেম যে পরিবারের সদস্য সে পরিবারে তো খাদেমের কর্তৃত্বশীলের বাসার ন্যায় এত অত্যাধুনিক জীবন উপকরণ থাকার কথা না। এমনও হতে পারে খাদেম পূর্বে তা কখনো দেখেওনি। কাজেই যা পূর্বে সে দেখেওনি তা পরিচালনার দায়িত্বভার দেয়ার আগে প্রয়োজন তাকে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া, কিন্তু তা না করে তাদের কাজে ভুল হলে মারধর করা, বকাবকি করা ইসলাম অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে। তাই মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَللهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوْكًا لِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ.

তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ, আল্লাহ্ তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। আবু মাসউদ (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি আমার কোন গোলামকে আর কখনো মারিনি। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ্, হা. নং-১৮৯৮, বিআইসি)

اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ.

তোমাদের কেউ যখন তার খাদেমকে মারে এবং সে (খাদেম) আল্লাহর দোহায় দেয়, তখন তোমাদের হাত তুলে নাও (মারধর বন্ধ কর)। জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ্, হা. নং-১৯০০, বিআইসি)

খাদেমের অপরাধ ক্ষমা এবং তাদের প্রতি উদার হওয়া

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ– একথা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া কিছু কিছু ভুল আছে যে ভুলের ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। মনে করুন, একটি জিনিস হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল এখন যতই খাদেমকে বকাবকি করা হোক না কেন তা তো আর আগের অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, একটা করা যায় তা হলো তাকে কথা ও কাজের ব্যাপারে আগামী দিনগুলোতে আরো সতর্ক হওয়ার জন্যে বলা যায়। কিন্তু এ বলাও যদি হয় কর্কশ ভাষায়, ধমকের সুরে, বকাবাজির স্বরে তাহলে তা মন খারাপ করে শুনার কারণে খাদেমের মাথায় থাকবে না। ফলে তার

শেষ ফলাফল শূন্য হতে বাধ্য। আর যদি একবার ভুল করে ফেললে তা ক্ষমা করে দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় তাহলে পরবর্তীতে যাতে এমন ভুল আর না হয় সেজন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর কোন কাজ আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ মনোযোগের সাথে করলে তাতে ভুল কম হয়। এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল!

كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَقَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

আমি খাদেমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। সে পুনরায় বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি খাদেমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? তিনি বলেন : প্রতি দিন সত্তরবার। (তিরমিযী আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৯৯, বিআইসি)

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের কাছে ক্রেতাদের হক

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার প্রথমটিই হচ্ছে খাদ্য। যা ব্যতিরেকে পৃথিবীর বুকে শুধু মানুষ নয় কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করতে পারে না। আর তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষসহ সকল প্রাণী পৃথিবীর বুকে পাঠানোর পূর্বেই তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যেমনঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে তার খাদ্য নিশ্চিত করে দেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। এরপর জমির মাটি ভেদ করে তাতে খাদ্য ব্যবস্থাও করে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! সম্পদের লোভ আর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে জমিতে উৎপাদিত এ খাদ্যশস্য নিয়ে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা হয়ে উঠে সরব। অবশ্য এক্ষেত্রে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দোষের হলো নিচের ক্ষেত্রগুলোতে– যেখানে বিভিন্ন পলিসি করে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষের হক হরণে হয়ে পড়ে ব্যস্ত-মহাব্যস্ত।

০১. ন্যায্যমূল্যে পণ্য প্রাপ্তি : ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। অতীতে এ ধ্যান-ধারণা ব্যবসায়ীদেরকে নানা অন্যায় কাজে জড়িয়ে মুনাফা বেশি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাখতো। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ব্যবসায়ীরাও সমাজে বসবাসকারী মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের কাছ থেকে যে কোন পণ্য বিনিময়ে বেশি মূল্য আদায় করার ক্ষেত্রে হয়েছে অনেক সচেতন ও দায়িত্বপ্রবণ। তাই অনেকে স্ব-প্রণোদিত আবার অনেকে বাধ্য হয়েই ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর ক্রয় ক্ষমতা তথা সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকে তাদের লক্ষ্য বলে মনে করছেন। সত্যিকথা বলতে কী, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনা করছেন, মূলধন বিনিয়োগ

করেছেন, তাদের মেধা ও শ্রমকে ব্যবসার সাথে একাত্ম করে দিয়েছেন; সুতরাং মুনাফা তো অবশ্যই চাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রেতাদের হক হলো পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে মুনাফার পরিমাণ খুব বেশি না হওয়া বা এমন পরিমাণ হওয়া– যা সহনশীল। অর্থাৎ ব্যবসায়ী লাভ করবে কিন্তু সব লাভ এক দিনে এক সাথে নয়, একটি পণ্য থেকে নয়, বরং লাভ কম বিক্রয় বেশি ফলে বারবার লাভ এমন নীতি অবলম্বন ব্যবসায়ীদের জন্য শোভনীয়।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে দেখা যায়, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যে সকল দ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যে সকল পণ্যদ্রব্য মানুষ বেশি বেশি ক্রয়ে বাধ্য তা থেকে বেশি মুনাফা আয় করার লক্ষ্যে মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়। অনেক সময় শুনা যায় কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্যের খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে প্যাকেটে যে মূল্য লাগানো থাকে তার উপরে নতুন করে ঐ বিক্রয় কেন্দ্র বেশি মূল্যের টেক লাগিয়ে থাকে– যা স্পষ্ট হক হরণের শামিল, যা অন্যায় ও ক্রেতাদের প্রতি যুলুম করার সাথে তুল্য।

০২. মজুতদারি : আজকাল এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক সরবরাহ হ্রাস বা বন্ধ করে দিয়ে অতি মুনাফা অর্জনের লোভে বাজার দর বৃদ্ধি করে দেয়। এটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ। কেননা এতে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ে; মানুষ খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের সংকটে ভোগে। আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لاَيَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ.

পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না। (সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২১৫৪, আ.প্র)

এমন ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার জমিনেই নেমে আসে কঠিন শাস্তি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ.

যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে (বা সমাজে) খাদ্যদ্রব্য মজুতদারি করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতার কষাঘাতে শাস্তি দেন। (সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২১৫৫, আ.প্র)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ وَاِنَّمَا رُوِىَ عَن سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هذَا.

কেবল দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরাই (নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস) মজুতদারি করে। আমি (মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম) সাঈদকে বললাম, হে মুহাম্মাদের পিতা! আপনি তো মজুতদারি করেন। তিনি বলেন, মামারও মজুতদারি করতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তৈল, গাছের পাতা ও এই জাতীয় জিনিস মজুদ করতেন। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ু', হা. নং-১২০৪, বিআইসি)

এবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রাখে আল কুরআনুল কারীমে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"আর এমন অনেক প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে না। আল্লাহই তাদের রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল আনকাবূত, ২৯ : ৬০)

তবে রাষ্ট্র অকস্মাৎ জাতীয় পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ বা জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য যে কোন জিনিসের মজুদ গড়ে তুলতে পারে। আবার বর্তমানে কোল্ড স্টোরেজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে– এটাও জায়েয। কেননা এর ফলে লোকেরা মৌসুমী শস্য বা পণ্য অন্য মৌসুমেও সহজে পেতে পারে।

০৩. ভেজাল মিশ্রিতকরণ : আজকাল কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীরা হালাল ব্যবসাকে বেশি মুনাফার লোভে হারাম করে তোলে। তাই চাউলের সাথে পাথর কণা, দামি চাউলের সাথে কম দামি চাউল মিশ্রিতকরণ, পুরাতন চাউলের সাথে নতুন চাউল মিশিয়ে পুরাতন বলে বিক্রয় করা, সয়াবিন তৈলের সাথে পামওয়েল, সরিষার সাথে সয়াবিন, ময়দার সাথে আটা, মধুর সাথে চিনির পানি, স্বর্ণের সাথে খাদ বেশি, রূপার সাথে ব্রোঞ্জ, সুতি কাপড়ের সাথে পলিস্টার মিশ্রণ, শুকনো পণ্যের সাথে ভেজা বা কাঁচা পণ্য, মোরগ-মুরগী, কবুতরের পেটে পাথর বা চাউল ভরিয়ে দিয়ে ওজন বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নাজায়িয এবং যারা এসব করে তাদের ব্যাপারে ইসলামের নাবীর বক্তব্য সুস্পষ্ট :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلى صُبْرَةٍ مِّنْ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَاهذَا قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাজারে) একটি খাদ্যশস্যের স্তূপ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর হাতে ভিজা অনুভব করেন।

তিনি স্তূপের মালিককে জিজ্ঞেস করেন : এ কি? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির পানিতে এটা ভিজে গিয়েছিল। তিনি বলেন : ভিজাগুলো স্তূপের উপর রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পেত? অতঃপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তি প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ূ, হা. নং-১২৫৩, বিআইসি)

আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় বিভিন্ন ফল বিশেষ করে আম, কাঁঠাল, পেপে, কলা ইত্যাদি পাকার আগেই এক ধরনের ঔষধ ব্যবহার করে কাঁচা ফলগুলোকে পাকা ফলের মত করে পাকা ফলের দামে বিক্রি করা হয়। এতে ক্রেতারা পাকা ফলের স্বাদ ও অন্যান্য শক্তিদায়ক উপকরকণগুলো থেকে বঞ্চিত হয়– যা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ.

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পাকার আগে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-৩৩৩৪, ই.ফা)

০৪. মিথ্যা শপথ না করা : কতিপয় ব্যবসায়ী পণ্যের মান, পণ্যের দাম ইত্যাদির ব্যাপারে ক্রেতাদের সাথে মিথ্যা শপথ করে থাকে। যেমন : কোন একটি দ্রব্যের দাম বিক্রেতা একশত টাকা দাবী করলো, এবার ক্রেতা সত্তর বা পঁচাত্তর টাকা দাম বলায় বিক্রেতা বলল, আরে ভাই! নব্বই টাকায় তো কিনে আনতেও পারিনি। তখন ক্রেতা বাধ্য হয়ে দাম বাড়ায়। এবার ক্রেতা বলল, ভাই! ঠিক আছে সর্বশেষে পঁচাশি টাকা দিবেন কিনা দেখুন! দেখা গেল বিক্রেতা বিক্রি করে দিল। এতে কিছুক্ষণ পূর্বে যে সে বলল, নব্বই টাকায়ও তো কিনে আনতে পারিনি, তাহলে তা ছিল মিথ্যা। এমন মিথ্যা বলা ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :.

اِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِى الْبَيعِ فَاِنَّهُ يَنفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করা কালে শপথ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা মিথ্যা শপথের ফলে পণ্য বিক্রয় হলেও তার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। (সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং- ২২০৯, আ. প্র)

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَذِبِ وَالْمَنَّانِ عَطَاءَهُ.

তিন প্রকার লোক রয়েছে যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আয়াত তিলাওয়াত করলে আবু যার (রা) বললেন, তারা নিরাশ হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বললেন : তারা হলো– যে গর্ব করে ইযার নিচু করে পরে এবং যে মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রি করে, আর যে কিছু দান করে তার খোঁটা দেয়। (সুনানু নাসাঈ, ক্রয়-বিক্রয়, হা. নং- ৪৪৬০, ই.ফা)

এভাবে মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় সাময়িকভাবে বাড়লেও প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ীদের উপার্জনে বরকত না থাকায় আয় কমে যায়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي الْبَيعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

তোমরা বিক্রয়কালে অত্যধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা দ্বারা মাল তো খুব কাটতি হয় কিন্তু (বরকত না থাকায়) আয় কমে যায়। (সুনানু নাসাঈ, ক্রয়-বিক্রয়, হা. নং-৪৪৬২, ই.ফা)

০৫. ওজনে কম ও অস্বাস্থ্যকর পণ্য দেয়া : পণ্য বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দেয়া ক্রেতাদের হক হরণের শামিল। অথচ ক্রেতাদের মুখে শুনা যায় কোথাও কোথাও পাঁচ কেজি পণ্য কিনে অন্য জায়গায় ওজন দিলে দেখা যায় সাড়ে তিন কেজি বা চার কেজি হয়। অর্থাৎ দেড় থেকে এক কেজি দ্রব্য কম। আবার শুনা যায়, পণ্যদ্রব্য ওজন করার জন্য যে বাটখারা তা নাকি দু-তিন রকমের তৈরি করা হয়ে থাকে। বলুন! মানুষকে ঠকিয়ে বা ওজনে কম দিয়ে মানুষের হক হরণ করার বিনিময়ে একজন ব্যবসায়ী কতটুকু লাভবান হবে? দেখুন! তাদের ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কী বলছেন :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَومٍ عَظِيْمٍ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"সর্বনাশা পরিণাম– ওজনে কমদাতাদের জন্য, যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়, আর যখন তাদেরকে মেপে দেয়, কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়, তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে এক ভয়াবহ দিবসে? যেদিন সব মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।" (সূরা আল মুতাফফিফীন, ৮৩ : ০১-০৬)

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৫)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজনপাত্র ও পরিমাপ পাত্র সম্পর্কে বলেন :

اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الاُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ.

তোমাদের উপর (ওজন ও পরিমাপ করার) এমন দুটি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যাতে (ত্রুটি করার অপরাধে) তোমাদের পূর্বেকার অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বুয়ূ, হা. নং-১১৫৫, বিআইসি)

ওজন সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

اِذَا وَزَنْتُمْ فَاَرْجِحُوْا.

তোমরা যখন ওজন করে দিবে, তখন একটু বেশিই দিবে। (সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২২২২, আ.প্র)

০৬. দুর্যোগ ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে দাম বৃদ্ধি : প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ঃ বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সিডরসহ কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বিঘ্ন হওয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ, দুর্যোগ মোকাবেলা ও সৃষ্ট ক্ষতিতে মানুষ যখন উদ্বিগ্ন ও নানা উৎকণ্ঠায় জর্জরিত তখন বেঁচে থাকার মানসে দু'মুঠো অন্ন, লজ্জা ঢেকে রাখার লক্ষ্যে এক টুকরা বস্ত্র, সুষ্ঠু জীবন যাপনে বাসস্থান, সুস্থ থাকার প্রয়োজনে চিকিৎসা ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ইত্যাদির প্রয়োজনে চারদিকে যখন হাহাকার, আর্তি তখন এক শ্রেণীর মুনাফাখোরী ব্যবসায়ী এ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে– "যা মরার উপর খাড়ার ঘা" নামে চিহ্নিত। এমনটি করা মানবতা বিরোধী, মানবের হক হরণ করার শামিল।

এমন পরিস্থিতিগুলোতে সচ্ছল শ্রেণীর পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও যথাসম্ভব কম লাভে পণ্য মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে বাজারে বিক্রয় এবং মানুষের জন্য সহজলভ্য করে তোলার মাধ্যমে উপকার করতে পারে। আর যদি একান্তই পণ্যমূল্য না কমাতে চায় অন্তত বাড়িয়ে না দেয়াও মানুষের প্রতি ইহসান বা সেবাতুল্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এজন্যে তাদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

০৭. ভোক্তাদের চাহিদা বা অভাব অনুযায়ী পণ্যের সমাবেশ : যে সকল পণ্যদ্রব্য মানসম্মত, স্বাস্থ্যসম্মত, ভাল গুণাগুণ সমৃদ্ধ, উপকারী, সে সকল পণ্যের চাহিদা বেশি। এটা পণ্যের উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের জন্যও সুখকর সংবাদ। কিন্তু এ সুযোগে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি বা বেশি মুনাফা অর্জনের নেশায় উৎপাদনকারী বা স্থানীয় ব্যবসায়ী যে কেউ পণ্যের সংকট সৃষ্টি করে ভোক্তাদেরকে কষ্ট দেয়া জঘন্য মানবতা বিরোধী।

পণ্যের চাহিদার কারণে বাজার বৃদ্ধির ফলে প্রতিদিন বহু সংখ্যক ক্রেতার চাহিদা পরিপূর্ণ করার মানসে পণ্য উৎপাদন হয় বেশি। আর এক সাথে বেশি পণ্য উৎপাদন করলে কাঁচামালের মূল্য কম, অপচয় কম, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন খরচ ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় অত্যন্ত যৌক্তিক কারণেই পণ্য পূর্ব মূল্য অনুযায়ী বিক্রয় হলেও পূর্বের তুলনায় মুনাফা বেশি অর্জন করা সম্ভব। কেননা বেশি উৎপাদন মানে উৎপাদন খরচ কম হওয়া, একটার জন্য ভৌত কাঠামো ও স্থাপনা ব্যয়সহ অফিস, কর্মচারী, পরিবহন, বিজ্ঞাপনসহ সকল প্রকার শক্তি নিয়োগের ব্যয় যা– একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত ব্যয় তাই। কাজেই অধিক উৎপাদন মানে কম উৎপাদন খরচ। আবার অধিক বিক্রয় মানে কম লাভ হলেও এক সাথে অনেক তথা লাভের পরিমাণ বেশি হওয়া। সুতরাং ক্রেতাদের চাহিদা বা অভাব পূরণে অধিক পণ্যের সমাবেশ বা যোগান বৃদ্ধিকরণ ব্যবসায়ীদের জন্যও মঙ্গল, ক্রেতাদের জন্যও সুখকর।

বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে ক্রেতার হক

বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। মানব সভ্যতার জনক আদম (আ) থেকে বস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। আদি মানবরা পোশাক হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছের পাতা, ছাল ও পশুচর্ম ব্যবহার করত। তাঁদের সম্পর্কে নগ্নতা ও অসভ্যতার যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ অমূলক। তবে পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে কাপড়ের বুনন ও ব্যবহার শুরু হয়েছে ইদরীস (আ)-এর যুগ হতে। সর্বপ্রথম ইদরীস (আ)-ই কাপড় সেলাই করেন। এবার এ বস্ত্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يَبَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

"হে আদম সন্তান! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক (পরিধানের বিধান) নাযিল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং শরীরের হিফাযত ও সাজ-সজ্জা হবে। আর তাকওয়ার পোশাকই কল্যাণকর। এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। আশা করা যায়, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ : ২৬)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বস্ত্র পরিধানের কথা বলতে যেয়ে বস্ত্রের তিনটি মৌলিক দিক উল্লেখ করেছেন।

০১. বস্ত্র হলো সতর বা লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার উপকরণ।

০২. বস্ত্র শরীরের হিফাযত বা শোভাবর্ধক বা সৌন্দর্য বিকাশের উপকরণ।

০৩. তাকওয়ার পরিচয়বাহী। অর্থাৎ বস্ত্র শুধু সতর ঢাকা এবং সৌন্দর্যবর্ধকই নয়, এটি একটি মনোদৈহিক বিষয়ও। এর মাধ্যমে ব্যক্তির রুচিবোধ ও মন-মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। সুতরাং পরিধেয় বস্ত্র হতে হবে এমন যা ভূষণ ও শালীন হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়ার পরিচয়ও বহন করে। এতে গর্ব-অহংকারের পরিবর্তে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ের ছাপ থাকবে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত অপচয় বর্জিত হবে। সেই সাথে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিম ও অন্যান্য মতবাদে বিশ্বাসী যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তাদেরও পরিচয় বস্ত্র পরিধানেই পাওয়া যায়। আর তাই প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদার উপকরণ হিসেবে বস্ত্র উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদের কাছে ব্যবহারকারী ও ক্রেতাদের অনেক হক রয়েছে।

বস্ত্র উৎপাদনকারীর কাছে হক

বস্ত্র উৎপাদনকারীরা বস্ত্র ব্যবহারকারীদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল রেখে বস্ত্র উৎপাদন ও বাজারজাত করা আবশ্যক। কেননা এ বস্ত্র পরিধানেই মানুষের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পরিচয় প্রকাশ পায়। এখানে দৃশ্যমান তথা মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ (ইসলাম ধর্মের অনুসারী না অন্য মতাবলম্বী) কর্ম পরিচয় (ইমাম, শিক্ষক, পুলিশ, আর্মি, নেভী, বিমান ও বিডিআর নওজোয়ান থেকে বিমান ক্রু) লিঙ্গ পরিচয় (নারী ও পুরুষ) বিশেষ শ্রেণী (স্কুলগামী ছাত্র, মাদরাসার ছাত্র) সহ ঋতুর প্রভাব (শীত ও গ্রীষ্ম) ইত্যাদি আর অদৃশ্যমান তথা মানুষের রুচি, চিন্তা-চেতনা, পছন্দ-অপছন্দ, মন-মানসিকতা, শিক্ষিত না অশিক্ষিত ইত্যাদিও ফুটে উঠে। আর এজন্যই বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানবজাতির পরিধেয় বস্ত্রের ধরণ, রঙ-ঢঙ, নকশা বুনন ইত্যাদি কেমন হবে তা বলে দিয়েছেন। বস্ত্র উৎপাদনকারীরা যদি সেদিকে খেয়াল রেখে বস্ত্র উৎপাদন করে তাহলে বস্ত্র ব্যবহারকারীরা যেমন এক রকম মনের অজান্তেই উত্তম বস্ত্র ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হবে তেমনি তাদের ব্যবসায়েও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণ আসবে।

অন্যদিকে যে বস্ত্র মানব শিশুকে জন্মের পর থেকে শুরু করে মৃত্যুর পর পর্যন্ত পরিধান করানো হয় সে বস্ত্র তো অবশ্যই উৎপাদন হওয়া চাই বিশেষ গুরুত্বের সাথে অত্যন্ত সযত্নে। কেননা এই বস্ত্রই একদিন মৃত্যুর পর মাটির নিচে কবরেও সবার সঙ্গী হবে।

বস্ত্রের রং মার্জিত হওয়া

বস্ত্রের রং সাদা হওয়াই উত্তম। এ প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوْهَا وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

তোমাদের পোশাকের মধ্যে উত্তম হলো সাদা পোশাক। অতএব তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও। (সুনান ইবন মাজাহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হা. নং-৩৫৬৬, আ.প্র)

اَلْبِسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ.

তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করো। কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম। (সুনান ইবন মাজাহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হা. নং-৩৫৬৭, আ.প্র)

اِنَّ اَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللهَ بِهِ فِيْ قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ.

তোমাদের কবরসমূহে ও মাসজিদসমূহে আল্লাহর সাথে সাদা পোশাকে সাক্ষাৎ করাই তোমাদের জন্য উত্তম। (সুনান ইবন মাজাহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হা. নং-৩৫৬৮, আ.প্র)

এছাড়া সবুজ রংয়ের কাপড় পরিধান করা যাবে। হাদীসে পাওয়া যায় :

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ.

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেন। (সুনানু নাসাঈ, সাজসজ্জা, হা. নং-৫৩১৯, ই.ফা)

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের হলুদ বা কুসুম এবং যাফরানী রং এর বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اُذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ قَالَ اَيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فِي النَّارِ.

'আবদুল্লাহ 'ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায়

আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন : ফেলে দাও। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোথায় ফেলবো? তিনি বললেন : জাহান্নামে। (সুনানু নাসাঈ, সাজসজ্জা, হা. নং-৫৩১৭, ই.ফা)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

আনাস (রা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস [পোশাক], হা. নং-৫৪২০, আ.প্র)

উল্লেখিত হাদীসগুলোর বর্ণনা অনুসারে যে সমস্ত রংয়ের বস্ত্র পরিধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, আর যেসব বস্ত্র পরিধান করতে আদেশ করেছেন সেই সমস্ত রংয়ের বস্ত্র বিশেষ করে যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা বেশি ক্রয় ও ব্যবহার করবে। আর তাই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বস্ত্র উৎপাদনকারীরা যদি এ রংয়ের বস্ত্র উৎপাদন করে ব্যবহারে লোকদেরকে আকৃষ্ট আর নিষেধ রংগুলোর বস্ত্র উৎপাদন না করে মানুষকে এর ব্যবহার থেকে মুক্ত রাখতে ভূমিকা পালন করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তাদের ব্যবসায় সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দিবেন, আর ক্রেতা বা ব্যবহারকারীদের হকও পূর্ণভাবে আদায় হবে।

জীবজন্তুর ছবি বা নকশা সম্বলিত কাপড় তৈরি না করা

ইসলাম এমনিতেই জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন করাকে নিরুৎসাহিত করেছে। সেই সাথে পরিধেয় বস্ত্রে তো জীবজন্তু ও মন আকৃষ্ট করার মত নকশা সম্বলিত ছবি না থাকাই উত্তম। এ সমস্ত বস্ত্র পরিধানে মানুষের বিকৃত রুচির প্রকাশ পায়। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ধরনের বস্ত্র পরিধান করতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তারপরও মানুষ পরিধান করে কারণ অনেকেই তা জানে না, সেই সাথে রয়েছে শয়তানের প্ররোচনা। মনের অজান্তে আনন্দে অভিভূত হয়েই অনেক পিতা-মাতা তাদের ছোট্ট ফিরিশতা সমতুল্য ছেলে-মেয়েদের বিড়ালের হাসি, হুতোম প্যাচার মত ভ্যাংচি কাটা মুখ সম্বলিত ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করিয়ে থাকে। যার নেতিবাচক প্রভাব ওদের জীবনে পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায়। আর তাই বস্ত্র উৎপাদক বা ডিজাইনারদের কাছে ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের হক হলো এসব ছবি ও নকশা সম্বলিত কাপড় তৈরি না করা।

অন্যদিকে যেসব কাপড় বা পোশাকে এমন নকশা বা কারুকার্য থাকে যা নামাযরত ব্যক্তির একাগ্রতা নষ্ট করে সেসব কাপড় পরিধান করে নামায পড়া ঠিক নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامُ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِه جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمِيْطِىْ عَنِّىْ فَاِنَّهُ لاَتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِىْ فِىْ صَلاَتِىْ.

আনাস (রা) বলেন, আয়িশা (রা)-এর একখানা পর্দা ছিল। এটি তিনি তাঁর ঘরের এক পাশে লটকিয়ে দিয়েছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, পর্দাটি আমার নিকট থেকে সরিয়ে ফেল। এর ছবিগুলো আমার নামাযে বাধার সৃষ্টি করে।[১] (বুখারী, কিতাবুল লিবাস [পোশাক], হা. নং-৫৫২৬, আ.প্র)

রেশম বা সিল্ক বস্ত্র তৈরি না করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে মানুষকে রেশম বা সিল্ক বস্ত্র পরিধান করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাই বস্ত্র উৎপাদনকারীদের উচিত এ ধরনের বস্ত্র উৎপাদন না করা। এতে রেশম বা সিল্ক বস্ত্রের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হলেও না পাওয়ায় ক্রয় ও পরিধান করতে পারবে না। রেশম বা সিল্ক বস্ত্র প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

هُوَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الاٰخِرَةِ.

এটা দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য। (সুনান ইবন মাজাহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হা. নং-৩৫৯০, আ.প্র)

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ.

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে কিছু রেশমী কাপড় এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম। (সুনানু নাসাঈ, সাজসজ্জা, হা. নং-৫১৪৬, ই.ফা)

প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী বস্ত্র শুধু যে পুরুষদেরই একদম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন তা নয়, বরং নারীদেরকেও তিনি এটা পরিধান করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। সেই সাথে রেশমী বস্ত্র জান্নাতের পোশাক হওয়ায় যারা দুনিয়ার জীবনে বেশি পরিধান করবে তারা আখিরাতে করতে পারবে না বলেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে

---

১. এগুলো প্রাণীর ছবি ছিল না, ছিল লতা-পাতার নকশী করা। এর প্রতি নামাযের সময় নজর চলে যায় এবং মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়, তাই সামনে থেকে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দেন। তিনি বলেন :

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الاخِرَةِ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করলো, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না। (ইবন মাজাহ, পোশাক-পরিচ্ছিদ, হা. নং-৩৫৮৮, আ.প্র)

যাকাতের উপযোগী শাড়ি-লুঙ্গি তৈরি না করা

আজকাল এক শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কম দামি শাড়ি, লুঙ্গি তৈরি করে যাকাতদাতাদের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও রাস্তার মোড়ে, লোকালয়ে ব্যানার টানিয়ে থাকে। আর যাকাতদাতারাও যাকাতের টাকার বদলে এমন কম দামি শাড়ি, লুঙ্গি কিনে দরিদ্রদেরকে দিতে আনন্দবোধ করে থাকে। এতে যাকাত আদায় কতটুকু যথার্থ হচ্ছে তা আলোচনায় না যেয়ে আমি বস্ত্র উৎপাদনকারীদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করব– সেটি হলো, বস্ত্র মানুষ কেন পরিধান করে? এ প্রশ্নের জবাব বস্ত্র উৎপাদনকারীদের কাছে খুঁজে পাওয়া গেলে আশা করা যায় এক্ষেত্রে তাদের দ্বারা দরিদ্র মানুষের হক হরণ হচ্ছে কী না তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রকৃত অর্থে মানুষ বস্ত্র পরিধান করে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য। আর লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার সাথে মানুষের সভ্যতা-অসভ্যতা ও সর্বোপরি মুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর ঈমান ও আকীদার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মুসলিম নারী-পুরুষরা ঈমানের দাবি অনুসারেই এ বস্ত্র পরিধান করে থাকেন। এ বস্ত্র যদি হয় অত্যন্ত পাতলা– যা গায়ে পরিধানের পর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বস্ত্রের অন্তরালেই প্রদর্শিত হয় অথবা বস্ত্র এত মোটা যা পরিধানে অত্যন্ত গরম অনুভূত হয়, পরিধানকারী অস্থিরতাবোধ করে, নানা রোগ-শোকের সম্ভাবনা থাকে তাহলে এমন কাপড় তৈরি করে কম দামে বিক্রয় ও দরিদ্রদেরকে যাকাতের নামে দেয়ার ক্ষেত্রে ধনীদেরকে উৎসাহ দেয়া কি দরিদ্রদের হক হরণে উৎসাহিত করা নয়! এমন কাপড় তৈরি বা দরিদ্র বলে তাদের প্রতি এমন অশোভনীয় আচরণ কি মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামে সমর্থনযোগ্য হতে পারে?

এক্ষেত্রে কোন কোন বস্ত্র উৎপাদনকারী হয়তো বলবেন– এটা আমাদের ব্যবসা, আমরা ব্যবসার জন্য পণ্য উৎপাদন করছি এবার কেউ অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তাতে আমাদের কি করার থাকে বা আমরা উৎপাদন না করলেও তো অন্যরা করবে ইত্যাদি। এখানেও জবাব হলো, ব্যবসা তো বহু ধরনের আছে কিন্তু তাই বলে সব ব্যবসা তো আর সবাই করতে পারে না বা করা ঠিকও না। সুতরাং যাদের উৎপাদিত পণ্য মানবতার বিপক্ষে ব্যবহার করা যায় সেক্ষেত্রে

তাদের করণীয় হলো ঐ রকম পণ্য তৈরি না করা, এবার অন্যরা হয়তো করবে কিন্তু অন্যরা যা-যা করবে তা তো সকলের করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া আমরা এটি না করে অন্যদেরকেও এ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আহ্বান জানাই, তাহলে তো আমরা সবাই এ থেকে মুক্ত থাকতে পারি। শুধু শুধু খোঁড়া যুক্তি দিয়ে অন্যদের হক হরণ করা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন সুযোগ যে নেই সে কথাটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাই বলব, এমন নিম্নমানের বস্ত্র উৎপাদন না করাও যাকাতদাতাদের বস্ত্রদানে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত রেখে যথাযথভাবে যাকাত আদায়ে উজ্জীবিত করতে পারে। আর এতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে দরিদ্রদের হক।

বস্ত্র টেকসইকরণ ও সকল উপাদান লিখে দেয়া

বস্ত্রের রং পছন্দনীয়, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই হওয়ার লক্ষ্যে এতে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান যথাযথভাবে দেয়া বস্ত্রের জন্য যেমন জরুরি তেমনি বস্ত্র ক্রেতারা যেন ঠকে না যায় বা প্রতারিত না হয় সেজন্য তা বস্ত্রের গায়ে এক পাশ দিয়ে স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ক্রেতাদের অবগতির সুবিধার্থে স্টিকারে দিয়ে দেয়া উত্তম। বিশেষ করে এ ব্যবসায় সততা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুতি কি টেট্রন, না পলিস্টার বা মিশ্রণযুক্ত হলে কোন সুতা শতকরা কত ভাগ তা স্পষ্ট লিখে টেক লাগিয়ে রাখা ক্রেতাদের হক। এতে ক্রেতারা একশত ভাগ কটন (সুতি) না টেট্রন, না কয়েকটি সুতার মিশ্রণে তৈরি তা জেনে-বুঝে-শুনে ক্রয় করার সুযোগ পেলে মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করতে পারবে। অন্যদিকে ক্রেতারা গ্রীষ্ম ও শীতকালে বস্ত্র ব্যবহারে স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে পরিবর্তন আনতে পারবে। এতে কাপড় ব্যবহারকারী যেমন সন্তুষ্ট হয় তেমনি ব্যবসায়ীদেরও ঋতুর আগমনে বস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পেতে পারে– যা উভয় পক্ষের জন্য সুফলদায়ক।

বস্ত্র বিক্রেতাদের কাছে হক

মানুষের মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে বস্ত্র বা কাপড়ের স্থান দ্বিতীয় হলেও মানব জীবনে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ পৃথিবীতে এটি একমাত্র দৃশ্যমান জিনিস যার চাহিদা মৃত্যুবরণ করার পরও থেকে যায়। যা কিনা মৃতের আপনজনেরা তার গায়ে সুন্দর করে জড়িয়ে দেয়। অথচ দুনিয়ার জীবনে মানুষের কত কিছুই না চাওয়ার থাকে আর পাওয়ার জন্যে নিরন্তর মানুষ ছুটে চলে। আর এভাবেই মানুষ মনুষ্যবোধ তথা নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে হালাল ব্যবসাকে মনের অজান্তেই হারামের সাথে জড়িয়ে ফেলে।

অথচ জন্ম থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় এমন যে পণ্য সে পণ্যের ব্যবসায় যারা নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে তারা যে কত সৌভাগ্যবান, কত উত্তম পণ্যের ব্যবসা করছে সেটি পণ্যের ব্যবহার থেকেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসায়ীরা যদি সততার সাথে ব্যবসা করে আর ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা না করে তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খুশি থাকবেন– এতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সাথে ব্যবসা তো হবেই। আর এমনভাবে ব্যবসায় মানব জাতিকে সম্পৃক্ত করতেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা :

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو.

"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ : ২৭৫)

ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা

লজ্জা ঢেকে রাখা ঈমানের অঙ্গ; ফলে এ পণ্যটি সবার জন্য– এ কথাটি মনে রেখে ন্যায্য বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা মানবতার পক্ষে ইহসান করার শামিল। এখানে ন্যায্য মূল্য বলতে বুঝানো হচ্ছে কম লাভে পণ্যটি মানুষকে ক্রয় করার সুযোগ দেয়া। মূলতঃ যে জিনিসের বিক্রয় বেশি সে জিনিসের লাভ কম হলেও তা বিক্রেতাদের জন্য সুখবরই বয়ে আনে। আর এক্ষেত্রে একটু ইহসান করায় ক্রেতারা অত্যন্ত খুশি হয়ে নিজেরা যেমন এ পণ্য ছাড়া অন্য পণ্য ব্যবহার করতে চায় না, তেমনি আপনজন থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশির সকলকে এ পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ফলে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করায় লাভ আরো বেশি। আর যারা বেশি মূল্য ধার্য করে বেশি বেশি লাভ করতে চায় তাদের লাভ হয় তুলনামূলকভাবে কম। কারণ আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহনাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ. وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"নামায সমাধা হলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত হও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ কর তাহলে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে পারবে। যখন তারা কোন ব্যবসা সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযে রত রেখে সেদিকে ছুটে

যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা কিছু (মুমিনদের জন্য প্রস্তুত) আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায় উপকরণ হতে উত্তম। আল্লাহই তো উত্তম রিযিকদাতা।" (সূরা আল-জুমু'আ, ৬২ : ১০-১১)

ভাল মানের কাপড়ের মূল্যের স্টিকার ন্যূনতম মানের কাপড়ের গায়ে না লাগিয়ে দেয়া

শুরুতে ভাল তারপর যা ইচ্ছা তাই। হ্যাঁ নামটা পরিচিত হয়ে গেছে; সুনাম অর্জিত হয়েছে; এখন মানুষ তাদের পণ্য ক্রয় করবেই– তাই তারা এমন করছে– কথাগুলো অনেক দুঃখের সাথে ক্রেতাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের পণ্য ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করে একটা ব্রান্ডে উপনীত হয়েছে আর মানুষও ঐ পণ্য অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট ফলে তারা বিক্রয় কেন্দ্রে এসে আর খেয়ালই করে না এর দাম কত? কারণ তাদের আত্মবিশ্বাস এতই প্রবল যে, এখানে দামের স্টিকার যা লাগানো আছে দাম বুঝি তাই। এ সুনাম ও ক্রেতাদের ভালবাসার সুযোগটি নিয়ে এক শ্রেণীর বিক্রেতারা তাদের বিক্রয় কেন্দ্রে এমন অসৎ বা প্রতারণামূলক কাজটি করে থাকে– যা ক্রেতাদের হক হরণ করার শামিল। যার ফলে বৈধ ব্যবসা হয়ে যায় অবৈধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَن تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ২৯)

ক্রেতার পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া

যারা নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করে, ক্রেতাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে পণ্য বা সম্ভব হলে পাওনা মূল্য ফেরত চাইলে তা নম্রতায় দিয়ে দেয় তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اِشْتَرى وَاِذَا اِقْتَضى.

আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', হা. নং-১৯৩১, আ.প্র)

ক্রেতাদের কাছে ব্যবসায়ীদের হক

ব্যবসায়ীদের কাছে ক্রেতা, পণ্য ভোক্তা বা পণ্য ভোগকারী, সেবা গ্রহণকারীর যেমন হক আছে তেমনি তাদের কাছে ব্যবসায়ীদেরও অনেক হক রয়েছে। অবশ্য

এ হকগুলো ক্রেতাদের চারিত্রিক বা নৈতিক গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। ক্রেতাদের নৈতিক এ গুণাবলীর বাস্তবায়নে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের মান সংরক্ষণ ও গুণাগুণ বৃদ্ধিতে হয়ে উঠেন উদ্বুদ্ধ ও সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনায় উজ্জীবিত। ব্যবসায়ীরাও তখন নিজেদের পণ্য ও সেবাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে হয়ে পড়েন মহাব্যস্ত। আর ক্রেতাদের পণ্য চাহিদায় তারা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পাশাপাটি নতুন-নতুন পণ্য তৈরি, সেবার মান বৃদ্ধিকরণের প্রয়াসে বিক্রয় কেন্দ্র বৃদ্ধি, পণ্য ফেরত, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে হয়ে ওঠেন সদা তৎপর– যা মূলতঃ ক্রেতাদের জন্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদা, আচার-আচরণ সর্বোপরি লেনদেনের ধরন ব্যবসায়ীদের করতে পারে আরো সচেতন, যত্নশীল ও আদর্শমুখী এবং ক্রেতাদের প্রতি দায়িত্বশীল।

পণ্যমূল্য পরিশোধে জাল টাকা না দেয়া

আজকাল এক শ্রেণীর অসৎপ্রবণ ঠগবাজ লোকজন সন্ধ্যার শুরুতে ক্রেতাদের ভিড়ে, বেশি পণ্য নেয়ার ভাব করে পণ্যমূল্য পরিশোধে দ্রুততার সাথে জাল ১০০/-, ৫০০/- টাকার নোট ব্যবসায়ীকে দিতে চেষ্টা করে– যা মারাত্মক অন্যায় এবং ব্যবসায়ীর হক হরণ করার শামিল। হ্যাঁ, হতে পারে ঐ জাল টাকা তাকে কেউ দিয়ে ঠকিয়েছে, তার হক হরণ করেছে এজন্য ঐ ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে আপনি তো আবার একই অপরাধ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে আপনার মনে হতে পারে আমি কি জাল টাকা তৈরি করেছি! আমাকে একজন দিয়েছে তাই আমি দিচ্ছি এতে আমার কি? আচ্ছা বলুন, আরেকজন অপরাধ করেছে বলে কি আপনিও জেনে-শুনে সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করবেন? করা কি ঠিক হবে? ধরে নিলাম, ঐ ব্যক্তি অমানুষ, কিন্তু আপনি! আপনিও কি অমানুষের মত কাজ করবেন। আর যদি করেনই তাহলে ব্যবসায়ী কী করবে! সে আবার আরেকজন ক্রেতা বা ব্যবসায়ীকে দিবে। এভাবে অন্যায়ের প্রসার ঘটানো ইসলাম কস্মিনকালেও সমর্থন করে না। সুতরাং টাকা যতটা সম্ভব সতর্কতার সাথে নেয়া উচিত; তারপরও জাল টাকা পেলে নিজের দুর্ভাগ্য মনে করে আল্লাহর আদালতে এমন নোট তৈরিকারকদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করে আরো সচেতন হওয়া হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে নিজেকে যেমন কেউ ঠকাতে পারবে না তেমনি আপনিও অন্যকে ঠকানোতে প্রলুব্ধ হবেন না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিজেকে সেইফ গার্ড হিসেবে তৎপর করে তুলতে হবে। অন্যথায় ফিকহবিদদের ভাষায়, এক টাকায় একটি জাল নোট চালানো চল্লিশ টাকা চুরি করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ।

পণ্য বা সেবার মান ভাল হলে অন্যকে উদ্বুদ্ধকরণ

কোন ব্রান্ডের পণ্য, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা, লেখকের লেখা আপনার উন্নত জীবন যাপন এবং আদর্শ চিন্তা-চেতনা গঠন ও কর্ম বাস্তবায়নে বিন্দুমাত্র পজিটিভ ভূমিকা রাখলে তা ব্যবহারে, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডাক্তার) হলে সেবা গ্রহণে, আদর্শ পথে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ তথা মানবতার কল্যাণকামী মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে সুন্দর গ্রন্থ হলে তা পাঠ করে জ্ঞান আহরণে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও মুসলিম ভাই-বোনদেরকে বলা, আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা উচিত। এতে আপনার কথা শুনে অগণিত মানুষ ঐ পণ্য ক্রয়ে, সেবা গ্রহণে, গ্রন্থ পাঠে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে আর এমনটি করা আপনার কাছে ব্যবসায়ীদের হক। আপনার দ্বারা খুব সহজে ভাল পণ্য বা সেবা বা গ্রন্থ পাওয়ার সুযোগে তারা যেমন খুশি তাদের কাছ থেকে আপনি যেমন দু'আ পাবেন তেমনি আপনার কথার প্রচার ও ব্যবসায়ীর পণ্যের বাজার প্রসারে ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকেও আপনি সাওয়াব পাবেন। তাছাড়া ভালকে ভাল বলা আর খারাপকে খারাপ বলা তো এমনিতেই মানব চরিত্রের একটি অন্যতম গুণ হিসেবে গণ্য।

বিক্রেতাকে না ঠকানো

অনেক সময় বিক্রেতা ব্যবসা পরিবর্তন বা কোন ধরনের দুর্ঘটনার মুখোমুখি হওয়ায় নগদ অর্থের প্রয়োজনে পণ্য বিক্রি করতে চাইলে এক শ্রেণীর ক্রেতারা বিক্রেতার দুর্বলতার দিকটিকে নিজেদের সুযোগ লাভের মাধ্যম মনে করে পণ্য মূল্য অনেক কম দেয়ার চেষ্টা করে– যা ঐ ব্যবসায়ী অনেক কষ্টের সাথে বাধ্য হয়ে মেনে নেয় বটে কিন্তু এতে তার ব্যবসার মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।
ইসলাম এমন সুযোগ সন্ধানী হওয়া বা অন্যের বিপদে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের নামে অপব্যবহার করা কস্মিনকালেও সমর্থন করে না। বরং ইসলাম মানবতার কল্যাণে মানব জাতিকে এগিয়ে আসায় উদ্বুদ্ধ করে।

যথাসময়ে পণ্যমূল্য পরিশোধ করা

পণ্যদ্রব্য নিজের হাতে আসার সাথে সাথে আর ধারে ক্রয়-বিক্রয় হলে নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করে দেয়া উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। এক্ষেত্রে কোনরূপ টালবাহানা বা গড়িমসি করা মানে লেনদেনে নিজেকে অসচেতন করে তোলা– যা পরবর্তীতে নিজের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারে। কাজেই যথাসময়ে যথাযথ মূল্য পরিশোধ করা ক্রেতাদের কাছে বিক্রেতাদের হক।

ব্যবসায়ী ও ব্যবসার উন্নতির জন্য দু'আ করা

কোন ব্যবসায়ীর পণ্য, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা, লেখকের লেখা, প্রকাশিত বইয়ের উপস্থাপনা ইত্যাদি যদি অনুকূলে হয়, তাহলে ঐ ব্যবসায়ীর নেক হায়াত বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে সন্তুষ্টচিত্তে অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ করা উচিত।

পাশাপাশি ঐ ব্যবসায়ী যেন আগামীদিনেও এমন পণ্যের সমাহার ঘটাতে পারে, আরো বেশি বেশি মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে; আদর্শ ও সুন্দর জীবন গঠনে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে, সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করা সকল ক্রেতাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য আর ব্যবসায়ীদের হকের আওতাভুক্ত। এভাবে সকলে হক পালনে উদ্বুদ্ধ হলেই আজ ও আগামীরা পাবে একটি সুন্দর সমাজ ও আদর্শ দেশ।

ব্যবসায়ীদের কাছে সর্বসাধারণের হক

মানুষ মানুষের জন্য– এ শ্লোগান সর্বজনবিদিত। কিন্তু এ মানুষই যখন মানুষের কল্যাণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বিরোধী কোন কর্ম বা ব্যবসা পরিচালনা করে, স্রষ্টা ও স্রষ্টার প্রেরিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানবের বিরুদ্ধে চলতে উদ্বুদ্ধ করে তখন তাদের ব্যাপারে হায়-আফসোস করা ছাড়া আর কিইবা করার থাকে!

কিসের নেশায় মানবতার বিরোধী এ সকল পেশা ও কর্মে এক শ্রেণীর মানুষ জড়িত হয় তা হয়তো তারাই ভাল বলতে পারবেন। তবে এটুকু আন্দাজ বা অনুমান করা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ যে তারা দুনিয়ার প্রতি বেশি ঝুঁকে, দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন ও খাও দাও ফুর্তি কর যা ইচ্ছা তা কর মনে করেই হয়তো এ সকল মানবতা বিরোধী কাজগুলো অকপটে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে করে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের কাছে আখিরাত ও দুনিয়ার সংজ্ঞাটাই অস্পষ্ট। আর তাই এসব থেকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে আখিরাত ও দুনিয়ার উদাহরণ উপস্থাপন করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الاٰخِرَةِ اِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আঙ্গুল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে তা তুলে আনলো। সে লক্ষ্য করুক তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে। (সুনান ইবন মাজাহ, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হা. নং-৪১০৮, আ.প্র)

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে মানুষ কিভাবে বসবাস করা উত্তম সে সম্পর্কে বলেন :

يَا عَبْدَ اللهِ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ.

হে 'আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো। (সুনান ইবন মাজাহ, ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হা. নং-৪১১৪ আ.প্র)

দুনিয়ার জীবনে মানবতা বিরোধী ব্যবসা করে গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স গড়ার চেয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করে সৎ জীবন ধারণে মুমিনদেরকে উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের বেহেশতখানা। (সুনান ইবন মাজাহ, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হা. নং-৪১১৩, আ.প্র)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন :

وَقَالُوْا مَاهِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا.

"আর তারা বলে : আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোন জীবন নেই।" (সূরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২৪)

এজন্যই এক শ্রেণীর মানুষ তার মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের জীবন-যৌবন আদর্শ চিন্তা-চেতনা, মন-মগজ ও কর্মকে আল্লাহবিমুখতার দিকে ধাবিত করার মধ্য দিয়ে অন্যদের কাছ থেকে বহু কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ নানা ছলছাতুরিতে হাতিয়ে নিয়ে নিজেরা ধনবান হওয়াকে নিজেদের ব্যবসা মনে করে থাকে। অথচ এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট– মানবতা বিরোধী যে কোন ব্যবসা বা কর্মই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মানবতার হক পরিপন্থী; তাদের হক হরণ করার শামিল। আর এ জন্যেই যারা মানবতার বিরোধী কোন কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ঘোষণা। আল্লাহ বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ.

"কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই। উত্তম কথা তাঁরই দরবার পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এবং উত্তম কাজ তাকে তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়, আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১০)

সুদ ব্যবসা

সম্পদ বৃদ্ধির নেশায় দরিদ্র ও খেটে খাওয়া কর্মজীবি মানুষকে নানা কৌশলে তাদের বিশেষ প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতার স্থলে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেয় টাকার পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করাকে বলে সুদ। এক শ্রেণীর মানুষ ব্যবসার আদলে মুনাফার স্থলে এমনভাবে অর্থ দেয়া-নেয়ার জন্য যে পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান গড়ে নিয়েছে তাই হলো ব্যবসা অর্থাৎ সুদের ব্যবসা।

এ ব্যবসা ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়ে এক শ্রেণীর মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। আর সমাজদেহ থেকে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে গলাটিপে হত্যা করে মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। ফলে সমাজে বেড়ে যায় বিশৃঙ্খলা। একদিকে সুদের ব্যবসায়ীরা টাকার পাহাড় গড়ে, আরেক দিকে মানুষ না খেয়ে মরে, খাদ্যের যোগান দিতে না পেরে পিতা তার সন্তান হত্যা করে, সুদ নিয়ে সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারার কারণে স্ত্রীর ইজ্জত-আব্রু ভূলুণ্ঠন হওয়ায় নিজেই আত্মহত্যা করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী সূরা আল-বাকারা : ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৮০, সূরা আলে-ইমরান : ১৩০, সূরা আর-রূম : ৩৯ সহ সবগুলো আয়াতের মূল সুর একই; তা হলো সুদ হারাম। সেই সাথে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটিরও অধিক হাদীস দ্বারা সুদকে নিষিদ্ধ এবং ইজমা কিয়াস দ্বারা আলিম-উলামাগণ সুদে টাকা প্রদানকে নিরুৎসাহিত করেছেন। সুতরাং এখানে অবশ্যই বুঝতে হবে এ ব্যবসা কতটা মানবতা বিরোধী এবং জঘন্যতম। এবার তারপরও যারা এ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হবে তাদের লক্ষ্য করে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষীদ্বয় এবং সুদের হিসাব রক্ষক বা দলিল লেখককে অভিসম্পাত করেছেন। (সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২২৭৭, আ.প্র)

এরপর সুদের পাপ সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন :

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ.

সুদের গুনাহর সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ করা। (ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২২৪, আ.প্র)
আর যারা মনে করে সুদের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় তাদের ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلَى قِلَّةٍ.

যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই। (সুনান ইবন মাজাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, হা. নং-২২৭৯, আ.প্র)
অবশ্য আশার কথা হচ্ছে যারা সুদের ব্যবসা বিশেষ করে সুদী ব্যাংক-বীমাসহ এমন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে কিছুদিন আগেও বুঝাতে কষ্ট হত যে, সুদ ছাড়া ব্যাংক-বীমার ব্যবসা করা যেতে পারে কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ আজ আর কষ্ট হয় না। কারণ ইসলামী শারী'আহ মুতাবিক পরিচালিত সুদবিহীন ব্যাংক এখন তাদেরও পছন্দ আর তাই তারাও এখানে সেখানে ইসলামী শারী'আহ মুতাবিক পরিচালনার লক্ষ্যে শাখা খুলতে ব্যস্ত, মহাব্যস্ত।
সুতরাং ইসলামী শারী'আহ মুতাবিক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংক ফাউন্ডেশন এর মত কল্যাণমূলক কাজে নিজেদের সকল মূলধন ও আল্লাহর দেয়া মেধাকে নিয়োজিত করে অতীতের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করে মানবতার কল্যাণকামী ব্যবসায় সম্পৃক্ত হলে আল্লাহ অবশ্যই মাফ করে দিবেন।

মদ ও জুয়া, গাঁজা-হেরোইন এবং ইয়াবার ব্যবসা

মদ ও জুয়া, গাঁজা, হেরোইন এবং ইয়াবা মানুষের স্মৃতিশক্তি ও স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনাকে কিছুক্ষণের জন্য অস্বাভাবিক করে নানা অকল্যাণমুখী অপকর্মের দিকে মানুষকে ধাবিত করে, মানুষের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর তাই এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলুন : উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং উপকারও আছে মানুষের জন্য; তবে এদের পাপ উপকারের চেয়ে অধিক।" (সূরা আল-বাকারা, ০২ : ২১৯)
এরপরও যারা এ ধরনের পণ্যের ব্যবসা করে, এক শ্রেণীর তরুণ ও যুবকদের সুন্দর জীবনকে সাঙ্গ করে দেয়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে বড় ব্যবসায়ী হিসেবে

গড়ে তুলে দুনিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য পরিষ্কার। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পরিচয় ও তাদের সকলের প্রতি অভিসম্পাত দিয়ে বলেন :

فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُوْرَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوْعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هذَا الضَّرْبِ.

শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছে : স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত), শরাব উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভোগকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত)। (সুনান ইবন মাজাহ, পানীয় ও পানপাত্র, হা. নং-৩৩৮১, আ.প্র)

আর এরপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যবসাকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করে বলেন :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الايَاتُ مِنْ اخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হয়ে আসেন এবং শরাবের ব্যবসাও নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেন। (সুনান ইবন মাজাহ, পানীয় ও পানপাত্র, হা. নং-৩৩৮২, আ.প্র)

সুতরাং, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে এসব ব্যবসা হারাম। তারপরও যারা তা করে তারা স্পষ্ট মানবতার হক হরণ করে।

ডাক্তারের কাছে রোগীর হক

সুস্থ দেহ সুস্থ মন সকলেই চায় এবং সকলেরই তা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কাজেই যেমন মনোযোগ আসে না তেমনি সফলতাও আশা করা যায় না। এতে সুখ-শান্তি-আনন্দ তথা জীবনের গতিময়তাই যেন থমকে যায়। মানুষ হতাশায় ভুগে। তার মধ্যে যে সম্ভাবনার সুকুমার বৃত্তিগুলো আছে সেগুলো পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে না। জীবন যেন কষ্ট-বিষাদের দিকে দিন দিন এগিয়ে যেতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে নিরোগ বা সুস্থ শরীর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি বিশেষ রহমত ও নিয়ামত। কেননা শরীর সুস্থতার উপর মনের সুস্থতা নির্ভর করে। অন্যদিকে সব অসুস্থতা মিলে একটি জীবনকেই উদ্বিগ্নতায়

আচ্ছন্ন করে দিতে পারে। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেই চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছেন এবং সকল রোগেরই চিকিৎসা আছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত্ তিব, হা. নং-৫২৬৭, আ. প্র)

তবে মানুষ যেন অসুস্থ হলে একদম ভেঙে না পড়ে, মৃত্যু কামনা না করে, বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে না দেয় এবং সবশেষে নিজেকে দুর্ভাগা বা হতভাগা মনে না করে সেজন্য প্রিয়নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগের জন্য তার গুনাহ মাফের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَهَمٌّ وحَزَنٍ (حُزْنٍ) وَّلاَ اَذًى وَّلاَ غَمٌّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

আবূ সাঈদ আল খুদরী ও আবূ হুরাইরা (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বলেন, মুসলিম কোন যাতনা, রোগ-কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকের শিকার হলে, এমনকি তার দেহে কাঁটাবিদ্ধ হলেও, এর বদলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৩০, খণ্ড ৫ম, পৃষ্ঠা ২৭৩, আ.প্র)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে রোগ-যাতনা বেশি ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৩৪, আ.প্র)

বরং এ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মুমিনরা তা বুঝে এবং আল্লাহই তাদেরকে রক্ষা করে থাকেন। পক্ষান্তরে যারা বদকার তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সিদ্ধান্তই যথাযথ কার্যকর। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ

مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَاتِهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالْاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ اِذَا شَاءَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিনের উদাহরণ হলো শস্য ক্ষেত্রের কোমল চারা গাছ। তা যে কোন দিকের হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়। এভাবে ঈমানদার বালা-মুসিবত হতে রক্ষা পায়। আর বদকার হলো বিরাটকায় বৃক্ষের মতো। তা সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাসে কাত হয় না) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৩২, আ.প্র)

আবার কেউ অসুস্থ হওয়া বা রোগে আক্রান্ত হওয়া মানে গুনাহ মাফ হওয়া এমন মনে করে চিকিৎসার জন্য এগিয়ে না যাওয়া ঠিক হবে না। চিকিৎসা করতে ভাল ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যেতে হবে; পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে রোগমুক্তি কামনা করতে হবে।

সুন্দর কথা বলা হাসি-খুশি থাকা

ডাক্তার হবেন সুন্দর কথা বলার অধিকারী, তাদের কথা বলার আর্ট-ই হবে রোগীর জন্য কল্যাণকামী; রোগীর রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা; প্রাথমিক প্রতিষেধক। যদিও অনেকের মুখেই একটি কথা শুনা যায়, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তারের কথা শুনে এত ভাল লেগেছে যে অর্ধেক টেনশন বা পেরেশানী কমে গিয়েছে। আবার অপ্রিয় হলেও সত্য, এমন কথাও কোথাও কোথাও শুনা যায়, এ ডাক্তার হিসেবে ভাল কিন্তু কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও ব্যবহার চামারের আচরণকেও হার মানায়। এমন অবস্থা রোগী ও তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য কষ্টকর, অন্যদিকে ডাক্তাররা হাসি খুশি হলে রোগীও সুস্থতাবোধ করে থাকে।

ডাক্তার না হয়ে ডাক্তারী, কোন এক ক্ষেত্রে স্পেশালিস্ট হয়ে অন্য ক্ষেত্রে চিকিৎসা না করা

ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন না করে, নামের পূর্বে ডাক্তার শব্দ সংযোজন করে, কোন এক ক্ষেত্রে স্পেশালিষ্ট হয়ে অন্য ক্ষেত্রে নিজেকে চৌকস ডাক্তারের মত ভাব ধরে গ্রাম-গঞ্জে, বিভিন্ন মফস্বল শহরে বিভিন্ন ফার্মেসীতে বসে রোগীর চিকিৎসার নামে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এক শ্রেণীর চতুর মানুষ পরীক্ষামূলকভাবে বা ধারণা করে রোগীকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ দিয়ে অপচিকিৎসা করে থাকেন। এতে রোগী,

রোগীর আপনজন অন্যান্য ডাক্তার ও দেশবাসীকে অনেক ক্ষেত্রেই অপূরণীয় ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়– যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও অমার্জনীয় বৈ কি! এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَيُّمَا طَبِيْبِ تَطَبَّبَ عَلى قَوْمٍ لاَيُعْرَفُ لَه تَطَبُّبُ قَبْلَ ذلِكَ فَاَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

যে ব্যক্তি ডাক্তার না হয়ে রোগীর চিকিৎসা করে এবং তার ডাক্তার হওয়া সম্পর্কে যদি কেউ না মানে, আর তার চিকিৎসার দ্বারা কারো ক্ষতি হয়, তবে সে যিম্মাদার হবে। (আবু দাউদ, রক্তপণ, হা. নং-৪৫১৮, ই.ফা)

এমন ক্ষেত্রে যেসব অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় তার কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন :

❑ **রোগীর সমূহ ক্ষতি**

❖ যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় না করতে পারার কারণে ঔষধ সেবনে কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

❖ রোগী দীর্ঘদিন রোগে আক্রান্ত থেকে হতাশা নিরাশায় ভুগতে শুরু করবে। এতে জীবনের যে সুন্দর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তা ভ্রষ্টতার দিকে এগিয়ে যাবে।

❖ ঔষধ সেবনে অন্যান্য শারীরিক ত্রুটি দেখা দিতে পারে– যা রি-এ্যাকশন নামে পরিচিত।

❑ **রোগীর আপনজনদের জন্য**

❖ অকস্মাৎ আপনজন তথা পিতা-মাতা, সন্তান, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী যে কেউ তাদের নিকটজনকে ভুল চিকিৎসার জন্য হারিয়ে ফেলতে পারেন।

❖ আবার না হারালেও প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় হতে পারে।

❖ ভুল চিকিৎসায় রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করার ক্ষমতা হারিয়ে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন শারীরিক অক্ষমতায় ভুগতে পারে।

❑ **ডাক্তারদের জন্য**

❖ রোগী ও সাধারণ জনগণের কাছে ডাক্তারদের অবস্থান কোণঠাসা হওয়া।

❖ ডাক্তারদের সাথে হাতাহাতি, মারামারি বা মারমুখী হওয়া।

❖ দুনিয়া ও আখিরাতের আদালতে আসামী হিসেবে চিহ্নিত হওয়া।

❑ **দেশের জন্য ক্ষতি**

❖ এ রোগী এমন একজন হতে পারে যার অকাল মৃত্যুতে বা অপ্রকৃতিস্থ হওয়াতে দেশ জাতির এমন ক্ষতি হলো যা কখনো পূরণ হবার নয়।

❖ হাসপাতাল ভাঙচুর, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা।

কাজেই, ডাক্তার না হয়ে ডাক্তারী করতে যেয়ে অথবা শিশু বিশেষজ্ঞ হয়ে ক্যান্সার

রোগী, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ হয়ে পেট ও পেটের সমূহ চিকিৎসা করার নামে অপচিকিৎসা, মেডিসিন বিভাগের না হয়ে জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীকে নিজের আয়ত্তে রেখে টাকা কামানো ও নাম-যশ-খ্যাতি অর্জনের নেশায় অন্যের হক হরণ করা কখনো সমুচিত হবে না। আর তাই এ ধরনের গর্হিত অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করা

শারীরিকভাবে রোগে আক্রান্ত রোগী আর মানসিক ও আর্থিকভাবে জরাগ্রস্ত, চিন্তিত রোগীর আপনজন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী- সকলেই যখন বিষণ্ন, জরাজীর্ণ, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় মগ্ন তখন ডাক্তারই হোন রোগ নিরাময়ে দায়িত্ব পালন করে সকলের মুখে হাসি ফুটানোর উসিলা। ফলে ডাক্তারকে হওয়া চাই অত্যন্ত আন্তরিক, থাকা চাই রোগীর শারীরিক অবস্থা ও রোগীর আপনজনদের মানসিক অবস্থা হৃদয় দিয়ে নিজের মত করে উপলব্ধি করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা, সুন্দর করে কথা বলে রোগীর রোগের প্রেক্ষাপট ও কারণসহ তৎক্ষণাৎ অবস্থা জানার মন-মানসিকতা, রোগীর আপনজনকে রোগ সম্পর্কে জানানো এবং সান্ত্বনা দেয়া।

মূলতঃ রোগী ও রোগীর আপনজন ডাক্তারের কাছে রোগ মুক্তির লক্ষ্যে সুন্দর পরামর্শ, সুন্দর কথা তথা সুন্দর আচরণই প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে ডাক্তার যদি হন রুক্ষ, বদমেজাজী, কর্কশ কথা বলায় অভ্যস্থ, তাহলে রোগী ও রোগীর আপনজনদের মন খারাপ হওয়ারই কথা। সেই সাথে কোন কোন ডাক্তার যখন চলে যায় ডাক্তারী ছেড়ে অন্য পেশায়; অন্য ক্ষেত্রে, অন্য নেশায় বা রাজনীতির ছত্রছায়ায় আর ব্যস্ত হয়ে পড়েন মিছিল-মিটিং ও অন্যান্য মহড়ায় তখন রোগীর যে কী দূর্ভোগ সে কথাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে ডাক্তারদের শিক্ষা, পেশা, নেশা তথা পুরো কর্মটাই জাতির জন্য সেবা। নামের পূর্বে ডা. শব্দ সংযোজনে তাদের পরিচয়ই যেন তাদের কাছে রোগীর হকের দাবি পেশ করে। আর তাইতো ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি, ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমঅবস্থান, সমব্যবহার ও সমদৃষ্টিভঙ্গিতে এ সেবা পাওয়ার হকদার।

অন্যদিকে ডাক্তারদের একটু অসতর্কতা, অসচেতনতা, অমনোযোগিতা, পেশার প্রতি দায়িত্বহীন আচরণ, মানুষকে ঠেলে দিতে পারে অকাল মৃত্যুর মুখোমুখি অথবা করে তুলতে পারে আমৃত্যু কর্মে অক্ষম পরনির্ভরশীল একজন। অথবা

সন্তানকে করে দিতে পারে পিতা-মাতা হারা, স্বামীকে স্ত্রীহারা, স্ত্রীকে স্বামীহারা, পিতা-মাতাকে সন্তানহারা আর দেশকে করে দিতে পারে আগামীদিনের ভবিষ্যত আদর্শ মানুষ হারা।

সুতরাং আশা করব আমাদের মুহতারাম-মুহতারামা ডাক্তারগণ তাদের পেশার প্রতি মনোযোগী হবেন। আর তাহলেই যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা তথা পেটে গজ কাপড়, কাচি, ছুরি, এক চোখ অপারেশন করার বদলে অন্য ভাল চোখ অপারেশন কোনটাই রোগী ও রোগীর আপনজনদের ভাগ্যে বরণ করতে হবে না।

রোগীর আপনজনদের কাছে রোগীর হক

মানবদেহে অসংখ্য রোগের সংক্রমণ হতে পারে। পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন যার কোন রোগ নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে রোগ-যাতনা বেশি ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৩৪, আ.প্র)

প্রকৃতপক্ষে রোগ-যাতনা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈমানদারদের ঈমানের প্রখরতা পরীক্ষা করে থাকেন। সেই সাথে পরীক্ষা করে থাকেন রোগীর আপনজন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী, হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদেরকেও। কারণ যে কোন ব্যক্তির জন্য যে কোন রোগ যে কষ্টদায়ক এবং সে সময় যে অন্যদের সহযোগিতা প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন আমরা প্রায়ই একটা কথা বলে থাকি জ্বরতো কোন রোগ না। একটু শরীর গরম হওয়া এটা এমন আর কী? অথচ এ জ্বর সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহান্নামের উত্তাপ হতে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব তোমরা পানির সাহায্যে তা ঠাণ্ডা করো।[১] (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, হা. নং-৫৩০৫, আ.প্র)

---

১. বিজ্ঞানের মতে সকল তাপের উৎস সূর্য। জান্নাত-জাহান্নাম যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ-অবিরোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। কারণ, জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান থেকেই আল্লাহর কুদরতে জগতের সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নাম। জ্বরে পানি ও বরফের

তবে মানুষ যদি খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ইত্যাদি সতর্ক বা সচেতনতার সাথে শারী'আতসম্মতভাবে করে তাহলে রোগ থেকে অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ রোগের মধ্যে কিছু রোগ আছে যা মানুষের আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া ও সেবনের ফল। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِه.

"কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই।" (সূরা আন-নিসা, ০৪ : ১২৩)

প্রকৃতপক্ষে খাবার এমনভাবে খাওয়া উচিত যেন তা মানুষের অসুস্থতার কারণ না হয়। হাদীসে আছে :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُ الْمُسْلِمُ فِيْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলিম এক উদরপূর্ণ করে খায়। আর কাফের খায় সাতটি উদরপূর্ণ করে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আতয়েমা, হা. নং-৪৯৯৫, আ.প্র)

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খাবার বেশি খেলে কারোর কারোর বদ হজম হয়ে ডায়রিয়া, বমি হতে পারে, শিশুরা চকলেট বেশি খেলে দাঁতে সমস্যা হয়ে থাকে। বড়রা ধূমপান করলে ক্যান্সারসহ আরো অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সেই সাথে মাদকদ্রব্য সেবন, অনিয়ন্ত্রিত গোসল, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিও অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। তবে অসুস্থতা যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন একটি বিষয় দিবালোকের মত সত্য সেটি হলো, যিনি অসুস্থ তিনি সুস্থ নন বলেই তার স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণে অন্যকে এগিয়ে আসতে হয়। আর এ এগিয়ে আসাটাই হচ্ছে রোগীর হক বা অধিকার।

রোগীর সেবা করা

কেউ অসুস্থ হলে প্রথমেই যারা সেবায় আত্মনিয়োগ করে তারা হলেন পরিবারের সদস্যবৃন্দ। যেমন সন্তানদের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী, স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী আর একান্নবর্তী পরিবারের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব ভাই-বোন, পারস্পরিক সেবায়

ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ একটি ডাক্তারী বিধান, এমনকি অতিমাত্রায় উত্তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী তাই চিকিৎসাশাস্ত্র।

নিয়োজিত হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। তারপর এগিয়ে আসেন প্রতিবেশীসহ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, হিতাকাঙ্ক্ষী পরিচিতজন। তবে যারাই রোগীর সেবা করবে তাদের সকলের জন্যই রয়েছে আল্লাহর কাছে মহাপুরস্কার।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যখন কোন মুসলিম তার কোন রুগ্ন মুসলিম ভাইয়ের সেবা করতে থাকে তখন সে জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাড়ি ফিরে আসে। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৬৮, বিআইসি)

সুতরাং আমাদের উচিত রোগীর সাথে খারাপ আচরণ না করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সেবা করা, আর নিজেকে জান্নাতের একজন করে নিতে চেষ্টা করা। আজকাল কোথাও কোথাও দেখা যায় পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ হলে কেউ কেউ এগিয়ে আসতে চায় না- যা দুঃখজনক। অন্যদিকে আজ যারা নওজোয়ান তারাও একদিন বৃদ্ধ হবে সেই কথা মনে রেখে তাদের সাথে সকলের আচরণ করা উচিত।

রোগীকে দেখতে যাওয়া

কেউ অকস্মাৎ কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা যে কোন ক্ষেত্রে তার অসুস্থতার খবর শুনে তাকে দেখতে যাওয়া মানবতাবোধের বহিঃপ্রকাশ। রোগীর হক বা অধিকার। পরিবার ও সমাজ জীবনে পারস্পরিক ভালবাসা ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এ এক পরম ও চরম সুযোগ। যত শক্রই হোক না কেন তার অসুস্থতায় এগিয়ে যেয়ে তার সাথে দেখা করলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তার মনের অবস্থা পরিবর্তন হতে বাধ্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ.

আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীদের মুক্ত কর। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আতয়েমা, হা. নং-৪৯৭৩, আ.প্র)

রোগীর সাথে কোমল ব্যবহার করা

রোগী, রোগের ধরণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কখনও কখনও অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। তাই রোগীর আপনজনদের উচিত তা বুঝে নেয়া এবং তার সাথে কোমল ব্যবহার করা; তার গায়ে হাত রেখে তার সম্পর্কে জানতে

চাওয়া এবং সেই সাথে তাদের উপকারে আসবে এমন কিছু করা। তাছাড়া অসুস্থতার কারণে রোগীদের মন এমনিতেই দুর্বল হয়ে যায়। রোগীরা হতাশা দূরাশায় ভুগতে থাকে। এমন রোগীদের সাথে কোমল ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজন পূরণে পাশাপাশি থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রিয় হওয়ার সুযোগটি যারা ভাগ্যবান তারা কখনো হাতছাড়া করতে পারে না।

রোগীকে বেঁচে থাকায় আশান্বিত করা

রোগের সংক্রমণ বা রোগের শ্রেণীভেদে রোগীরা কখনও কখনও মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে ভেবে খুব কষ্ট পেতে থাকে। আসলে মৃত্যু আসবে এটাতো স্বাভাবিক। মৃত্যুর বিপরীত কোন চিকিৎসাও নেই তাও সত্য কিন্তু অসুস্থ হলেই যে একজন রোগী মারা যাবে ব্যাপারটাতো ঠিক এমন নাও হতে পারে। তাই রোগীর আপনজনদের উচিত রোগীকে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা বলা আর নিজেরাও আল্লাহর কাছে রোগীর সুস্থতার জন্যে দু'আ করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ اَجَلِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَيَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ.

তোমরা কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে বেঁচে থাকায় আশান্বিত করবে। তা যদিও কোন কিছুকে (তাকদীরকে) রোধ করতে পারবে না তবুও তার মনটা এতে প্রফুল্ল হবে, শান্তি পাবে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুত তিব্ব, হা. নং-২০৩৬, বিআইসি)

মৃত্যু কামনা না করা

কোথাও কোথাও শুনা যায় পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী অসুস্থ হলে আপনজনদের একটু বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয় বিধায় তারা এমন মুরব্বিদের মৃত্যু কামনা করে বসে, যা কোনভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না। বরং এ ক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হচ্ছে ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا (مَا) كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ.

আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসিবতে পড়ে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সেইরূপ কিছু করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততদিন তুমি আমাকে জিন্দা রাখ এবং যখন

মৃত্যুই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দান কর। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৬০, আ.প্র)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يُّدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىْ بِفَضْلٍ وَّرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلاَيَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَّاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ.

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির নেক 'আমল কখনও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও না? তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, আমাকেও না; যতক্ষণ না আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত আমাকে ঘিরে ফেলে। অতএব তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভাল লোক হলে আশা করা যায় বেশি বেশি নেক 'আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে (আল্লাহর কাছে) অনুশোচনা করার সুযোগ লাভ করবে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৬২, আ.প্র)

তোমাদের কেউ যেন কোন কষ্টের কারণে মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে বরং সে যেন এরূপ দু'আ করে :

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ.

হে আল্লাহ! আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন, যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় এবং আমাকে তখন মৃত্যু দান করুন, যখন তা আমার জন্য মঙ্গলময় হবে।" (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩০৯৪, ই.ফা)

রোগীর সুস্থতার জন্য দু'আ করা

কেউ অসুস্থ হলে তার সুস্থতার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করার কথা হাদীসে পাকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَتَى مَرِيْضًا اَوْ اُتِيَ بِهٖ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءًكَ لاَيُغَادِرُ سَقَمًا.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগীর নিকট গেলে কিংবা রোগীকে তাঁর নিকট আনা হলে তিনি বলতেন : হে পরওয়ারদেগার! কষ্ট দূর করে দাও, নিরাময় দান করো। তুমিই নিরাময়

দানকারী, তোমার নিরাময় দানই হলো আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময় দান করো যা কোন রোগই অবশিষ্ট রাখবে না। জারীর (র) থেকে এক সূত্রে আছে "রোগীকে নিয়ে আসার" কথা এবং অপর সূত্রে আছে "রোগীর নিকট যাওয়ার" কথা। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৬৪, আ.প্র)

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلاَّ عُوْفِيَ.

কোন ব্যক্তি যদি কোন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি; সে তার জন্যে সাতবার এই দু'আ করবে :

আমি মহান আরশের রব মহামহিম আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি তোমাকে রোগমুক্তি দান করুন, তাকে রোগমুক্ত করা হবে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুত তিব্ব, হা. নং-২০৩৩, বিআইসি)

ভিক্ষুকের হক

অর্থনৈতিক, মানসিক বা দৈহিক অক্ষমতায় দু'মুঠো অন্ন, লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য এক টুকরা বস্ত্র, মাথা গুজার জন্য একটুকু ঠাঁই বাসস্থান আর কোন রকমে রোগ শোকে কষ্ট থেকে একটু নিরাময়, মুক্তি ও শান্তি পেতে যারা ছুটে চলে সূর্য উদয়ের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পর্যন্ত মানুষের দ্বারে-দ্বারে হাত পেতে সাহায্য-সহযোগিতা পেতে তারাই ভিক্ষুক।

সংবিধান ঘোষিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম শিক্ষার কথা তারা কখনো চিন্তাও করে না। কেননা যাদের পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, মাথা গুজার ঠাঁই নেই, রোগে ঔষধ খাওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের আর শিক্ষা অর্জনের কামনা-বাসনা আসে কী করে?

তবে যে কথা না বললেই নয় সেটি হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম শ্রেষ্ঠ জীব মানুষদের একে অপরের কাছে মুখাপেক্ষী হতে নিরুৎসাহিত করেছেন। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِلاَّ اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِيْ اَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ.

অপরের কাছে হাত পাতা ক্ষতের সমতুল্য (হীন ও শ্রান্তিকর)। যাঞ্চাকারী এর দ্বারা নিজের মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত (লাঞ্ছিত) করে। কিন্তু শাসকের কাছে কিছু চাওয়া বা যার হাত পাতা ছাড়া কোন উপায় নেই তার কথা স্বতন্ত্র। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হা. নং-৬৩৩, বিআইসি)

মানবতার মূর্ত প্রতীক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান মানুষদের পরমুখাপেক্ষী না হয়ে কঠোর পরিশ্রম করার প্রতি উৎসাহিত করে তুলেন। তিনি বলেন :

لاَنْ يَّغْدُوَ اَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ رَجُلاً اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ ذلِكَ فَاِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى وَابْدَاْ بِمَن تَعُوْلُ.

তোমাদের কোন ব্যক্তি সকাল বেলা গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে বহন করে এনে তা থেকে প্রাপ্ত উপার্জন থেকে যে দান-খয়রাত করল এবং লোকদের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকল। অন্যের কাছে যাঞ্চা করার চেয়ে এটা তার জন্য উত্তম। আর অন্যের কাছে চাইলে সে তাকে দিতেও পারে নাও দিতে পারে। কেননা নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত (দান গ্রহণকারীর চেয়ে প্রদানকারী) উত্তম। নিজের পোষ্যদের থেকে (অর্থ ব্যয় ও দান-খয়রাত) শুরু কর। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, হা. নং-৬৩২, বিআইসি)

যথাসম্ভব কর্ম করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে তা করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আল-জুমুআ, ৬২ : ১০)

কিন্তু নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উৎসাহ ও আল্লাহর নির্দেশ সত্ত্বেও যারা সত্যিকার অর্থেই কর্মে অক্ষম তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা বেঁচে থাকার তাগিদে জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ্ করেছেন ধনী ও সম্পদশালীদের মাধ্যমে। তাইতো আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় ঘোষণা করেছেন :

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের হক।" (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ১৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ.

যাঞ্চাকারীর অধিকার আছে, যদিও সে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আগমন করে। (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হা. নং-১৬৬৫, ই.ফা)

কাজেই আমরা যদি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হকের ব্যাপারে সচেতন এবং একটু দায়িত্বপ্রবণ হই তাহলে কখনোই তাদের ভিক্ষাবৃত্তির মতো এমন একটি কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে জীবন ধারণ করতে হবে না। তারা নিজেরাই হবে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার।

মরণোন্মুখ ও মৃত ব্যক্তির হক

মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত; স্থান ও সময় অনিশ্চিত। মানুষের এ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়াকে মরণোন্মুখ অবস্থা বলা হয়। এ সময় মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে কী ধরনের কথা বলা উচিত সে সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِىْ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَعْقَبْنَا عُقْبِى صَالِحَةً قَالَتْ فَاَعْقَبَنِىَ اللهُ تَعَالى به مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

যখন তোমরা কোন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল কথা-বার্তা বলবে। কেননা তোমাদের কথার সমর্থনে ফিরিশতারা আমীন বলেন। এরপর আবু সালামা (রা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমি (বর্ণনাকারীনী উম্মু সালমা) বলি : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (এখন) কি বলব? তখন তিনি বলেন : তুমি বল–

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَعْقَبْنَا عُقْبِى صَالِحَةً.

হে আল্লাহ! আপনি একে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। উম্মু সালমা (রা) বলেন : আল্লাহ আমাকে এর বিনিময়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১০১, ই.ফা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

اِذَا مَاتَ الاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِه وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَّدْعُوْ لَهُ.

মানুষ মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার কাজ (করার যাবতীয় ক্ষমতা) ছিন্ন (রহিত) হয়ে যায় কিন্তু তিনটি কাজের (সাওয়াব লাভ) রহিত হয় না, (১) সাদকায়ে জারিয়া, (২) এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং (৩) এমন নেক সন্তান

যে তার জন্য দু'আ করে।[১] (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল আহ্‌কাম, হা. নং-১৩১৫, বিআইসি)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষ যখন মরে যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার থেকে সমস্ত কাজ (করার যাবতীয় ক্ষমতা) ছিন্ন (রহিত) হয়ে যায়। সে তিনটি ব্যতীত কোন 'আমলই তার কাছে পৌঁছায় না। (০১) এমন কোন সাদকার কাজ, যা সর্বদা প্রচলিত থাকে। (০২) কিংবা এমন কোন ইলম বা জ্ঞান, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং (০৩) আদর্শবান সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল অসিয়াত, হা. নং-৪০৭৬, বিআইসি)

মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তালকীন করা

মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট উপস্থিত আপনজনদের কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করা (তালকীন) মৃত ব্যক্তির হক। এ সময় মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে বসে সকলের কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ.

তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তালকীন দিবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১০৩, ই.ফা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

مَنْ كَانَ اخِرُ كَلاَمِه لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তির সর্বশেষ কালিমা (কথা) হবে– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবূ দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১০২, ই.ফা)

ঋণ বা করজ দ্রুত পরিশোধ করা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে জীবন ধারণ করতে যেয়ে একে অপরের সাথে লেনদেন করতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে একজন আরেকজনের কাছ থেকে ধার নেয়। আবার পরিশোধ করে। এভাবে একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসা ইসলাম অত্যন্ত সাওয়াবপূর্ণ কাজ মনে করে।

---

১. সাদকা জারিয়া এটা হচ্ছে যেমন জনকল্যাণমূলক কাজ, যা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত থাকে। কিন্তু যদি কোন অন্যায় কাজ প্রতিষ্ঠিত করে সেটার শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে। ইলমে নাফে যেমন কথার মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে কিংবা লেখনীর মাধ্যমে যার ইলম প্রচলিত থাকে। সুসন্তান পিতা-মাতার জন্যে দু'আ না করলেও তার নেক কাজের বদৌলতে সাওয়াব পেতে থাকে। অনুরূপ সন্তানের কুকর্মের আযাবও তাদেরকে ভোগ করতে হবে। তাই বলা হয়, সন্তান একদিকে দৌলত ও সম্পদ অপরদিকে আমানতও বটে। সুতরাং সেই সুসন্তান, যে সর্বদা তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

رَأَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لاَنَّ السَّائِلَ يَسْاَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ اِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

মিরাজের রাতে আমি জান্নাতের একটি দরজায় লেখা দেখলাম, দান-খয়রাতে দশ গুণ এবং করজে আঠারো গুণ সাওয়াব। আমি বললাম : হে জিবরাঈল! করজ দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন, ভিক্ষুক নিজের কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায় কিন্তু করজদার প্রয়োজনের তাগিদেই কর্জ চায়। (সুনান ইবন মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪৩১, আ.প্র)

উল্লেখিত হাদীস অনুসারে ঋণ বা করজ দিলে দান-খয়রাত করার চেয়েও বেশি সাওয়াব হওয়া সত্ত্বেও এ করজ দেয়ার প্রচলন মুসলিম সমাজে প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ পরিশোধ না করা বা করতে চেষ্টা না করা। অথচ ইসলাম এ ঋণ বা করজ দেয়া যেমন মানবতার হক মনে করে তেমনি তা যথাসময়ে পরিশোধ করে দেয়া বা অকস্মাৎ ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করে দেয়ার ব্যাপারে আপনজনদের নির্দেশ দেয়।

عَنْ سَعْدِ بْنِ الاَطْوَلِ اَنَّ اَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً فَاَرَدْتُّ اَنْ اُنْفِقَهَا عَلى عِيَالِه فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَدَّيْتُ عَنْهُ اِلاَّ دِيْنَارَيْنِ اِدَّعَتْهُمَا اِمْرَاةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَاَعْطِهَا فَاِنَّهَا مُحِقَّةٌ.

সা'দ ইবনুল আতওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত। তার ভাই ইন্তিকাল করেন এবং তিনশত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার ভাই দেনার কারণে আটক রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা পরিশোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দু'টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বলেন : তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে হকদার। (সুনান ইবন মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪৩৩, আ.প্র)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ اُتِيَ

بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ بِجَنَازَةٍ اُخْرى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযা পড়লেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? বলা হল, হাঁ। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গিয়েছে? তারা বলল, তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তখন তিনি তার (জানাযার) নামায পড়লেন। তারপর তৃতীয় একটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গিয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির নামায তোমরাই পড়। আবু কাতাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়লেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইজারা, হা. নং-২১২৭, আ.প্র)

نَفْسُ الْمُؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّى يُقْضى عَنْهُ.

ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুমিনের রূহ তার ঋণের সাথে বন্ধক থাকে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল জানাইয, হা. নং-১০১৬, বিআইসি)

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقُ إِلى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

কিয়ামতের দিন তোমাদের অবশ্যই নিজ নিজ পাওনাদারের প্রাপ্য আদায় করতে হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রাপ্য প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে নেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, হা. নং-৬৩৯৪, বিআইসি)

ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু আজকাল আল কুরআনুল কারীম ও আল হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা, তার চর্চা ও বাস্তবায়ন পুরোপুরি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি বলে মানুষ করজ বা ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে। আর তাই শোনা যায়, ঋণ বা করজের বিপক্ষে বিভিন্ন কথা বা শ্লোগান :

- ❖ টাকা বা ঋণ সম্পর্ক নষ্ট করে।
- ❖ টাকা যার কাছে যায় তার কথা বলে।
- ❖ কাউকে দূরে সরাতে চাইলে তাকে টাকা ধার দেবে।
- ❖ নেয় হাসিমুখে দেয়ার সময় মুখ কালো করে।
- ❖ টাকা ধার নিলে তাকে আর দেখা যায় না।
- ❖ টাকা ধার নেয়ার পর ফোন করলে ফোন রিসিভ করে না বা মোবাইল ফোনের সীম পরিবর্তন করে অন্য সীম ব্যবহার করে ইত্যাদি।

এ কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগে কিন্তু সমাজে যা রটে তার কিছু না কিছু ঘটে– এ কথা বোধহয় বলা যায় খুব সহজে।

আসলে কোন ব্যক্তি সচ্চরিত্রের অধিকারী না অসচ্চরিত্রের তা বোঝা যায় ব্যক্তির সাথে অর্থের লেনদেন করলে বা অর্থ দেখলে ব্যক্তির আচার-আচরণ দেখে। এ প্রসঙ্গে লোকমুখে শুনা যায় টাকা দেখলে নাকি কাঠের পুতুলও হা করে। আর মানুষ তো যে কোন কিছুই করতে প্রস্তুত থাকে। শুধু টাকা পয়সাকে কেন্দ্র করেই আজকের সমাজে একজন ভাইয়ের বিপদে আরেকজন ভাই এগিয়ে আসতে চায় না। তাই আজ প্রয়োজন নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, লেনদেন বা ওয়াদা সংরক্ষণে আমাদের দৃঢ়তা। নতুবা দুনিয়ার জীবনে অপমান, লাঞ্ছনা ও বেইজ্জতির মুখোমুখি যেমন হতে হবে তেমনি আল্লাহর আদালতেও মুক্তি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। অন্যদিকে যারা ঋণ গ্রহণ করে তা যথাযথ সময়ে পরিশোধ করে তারাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اِنَّ خَيْرَكُمْ (اَمْ مِنْ خَيْرِكُمْ) اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে। (সুনান ইবন মাজাহ, দান-খয়রাত, হা. নং-২৪২৩, আ.প্র)

মৃতের জন্য চিৎকার ও বিলাপ না করা

মৃত্যুর ফলে আপনজনদের হারানো আর কোনদিন দেখা সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা হবে না এমনটি মনে হওয়ায় চোখের পানি গড়িয়ে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তা যেন উচ্চ শব্দ ও বিলাপ করে না হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِه بِمَا–نِيْحَ عَلَيْهِ.

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মৃতের জন্য কাঁদার দরুন

তাকে কবরের ভেতর আযাব দেয়া হয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১২০৭, আ.প্র)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (শোকাতুর হয়ে) গাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের রীতির দিকে আহ্বান করে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১২০৯, আ.প্র)

কাজেই মৃতের জন্য চিৎকার ও কান্নাকাটি না করে মৃতের আপনজনদের উচিত আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَؤُا يس عَلى مَوْتَاكُمْ.

মাকিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির নিকট 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১০৭, ই.ফা)

মৃতের প্রশংসা করা

ভাল-মন্দ নিয়েই মানুষ। অনেক সময় শয়তানের প্ররোচনা বা নিজের অজ্ঞতা বা খেয়ালীপনায় অনেক ভাল মানুষও ভুল করে বসতে পারে। তাই তার মৃত্যুর পর এগুলো নিয়ে সমালোচনা না করাই উত্তম। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَسُبُّوا الاَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ اَفْضَوْا إِلى مَا قَدَّمُوْا.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা তারা যা কিছু করেছে তারা তার ফলাফলের মুখোমুখি পৌঁছে গিয়েছে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১৩০৩, আ.প্র)

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিদায়ই নিয়েছে তখন তার ভুল-ত্রুটির জন্য সমালোচনা না করে মূলত তার ভাল কাজগুলো স্মরণ করে তার প্রশংসা করা উচিত। কারণ ঐ মৃত ব্যক্তি এখন আর ভাল-মন্দ কোন কাজই করার ক্ষমতা রাখে না। বরং সে যা করেছে মৃত্যুতে তাই তার সাথে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ.

তিনটি জন্তু মৃত ব্যক্তির পিছু পিছু যায়, তার পরিবার-পরিজন, তার ধন-সম্পত্তি এবং তার কৃতকর্ম। অতঃপর দুইটি বস্তু ফিরে আসে তার পরিবার-পরিজন এবং তার ধন-সম্পত্তি আর অন্য বস্তুটি তার সাথেই থেকে যায় আর তা হল তার কৃতকর্ম। (সুনান নাসাঈ, জানাযা পর্ব, হা. নং-১৯৪১, ই.ফা)

অন্যত্র আমাদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম ব্যক্তির কাছে অন্য মুসলিমদের হকের কথা বলতে যেয়ে বলেন :

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ.

প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর অন্য মুমিন ভাইয়ের ছয়টি অধিকার রয়েছে।

০১. কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে;
০২. তার জানাযায় উপস্থিত হবে যখন সে মারা যাবে;
০৩. তার আতিথ্য গ্রহণ করবে যখন সে দাওয়াত করবে;
০৪. যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে;
০৫. যখন সে হাঁচি দেবে তখন তার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে এবং
০৬. তার কল্যাণ কামনা করবে সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক। (সুনানু নাসাঈ, জানাযা পর্ব, হা. নং-১৯৪২, ই.ফা)

মৃতের জন্য দু'আ করা

মৃত ব্যক্তির আপনজন যারা দুনিয়ার বুকে বেঁচে আছে তাদের কাছে মৃতের হক হলো তারা মৃত ব্যক্তির জান্নাত কামনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে। (আবূ দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১৮৫, ই.ফা)

জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ

কোন মুসলিম মারা গেলে তাকে দ্রুত দাফন এবং জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ মৃতের হক। তাই মৃতের আপনজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের

উচিত দ্রুত জড়ো হয়ে তার কাফন-দাফনের লক্ষ্যে সকল কিছু আঞ্জাম দেয়া। লোকজনদেরকে ডেকে জানাযার সালাতে শরীক করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ مَالِكِ بْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَّيِّتٍ يَّمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَالَثَةُ صُفُوْفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلُ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلثَةَ صُفُوْفٍ لِّلْحَدِيْثِ.

মালিক ইবন হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য জীবিত মুসলিমরা তিন কাতার হয়ে (তার জানাযার) নামায পড়লে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। রাবী বলেন : এজন্য মালিক (র) যখন কোন ব্যক্তির জানাযার লোক কম দেখতেন, তখন তাদের তিন কাতারে বিভক্ত করে দিতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১৫২, ই.ফা)

জানাযার নামাযে দু'আ করা প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اِذَا صَلَّى عَلى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّافَأَحْيِهِ عَلَى الاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ اَللّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে বলতেন : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদের পথভ্রষ্ট করো না। (সুনান ইবন মাজহ, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১৪৯৮, আ.প্র)

এবার যারা জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করবে তাদের উদ্দেশ্যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَه قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَه قِيْرَاطَانِ اَصْغَرُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ اَوْ اَحَدُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযার অনুগমন করে, তার সালাতুল জানাযা আদায় করে, সে এক কীরাত সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে গমন করে তার দাফনেও শরীক হয়, সে ব্যক্তি

দু'কীরাত সাওয়াব পায়। ঐ দু'কীরাতের ছোট কীরাতের পরিমাণ হল উহুদ পাহাড়ের সমান অথবা দু'কীরাতের যে কোন এক কীরাত হল উহুদ পাহাড় সমতুল্য। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩১৫৪, ই.ফা)

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَأى اَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا اَوْ تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلُ تُخَلِّفَهُ.

আমের বিন রাবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোন জানাযা যেতে দেখবে, যদি সে তার সহযাত্রী না হয় তাহলে সে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না তা চলে যায় অথবা নামিয়ে রাখা হয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১২২৩, আ.প্র)

আর জানাযার পেছনে পেছনে চলা এবং দাফন করা পর্যন্ত যারা অপেক্ষা করবে তাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى يُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে নামায পড়বে সে এক কীরাত পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত থাকবে সে দু'কীরাত পাবে। জিজ্ঞেস করা হল দু'কীরাত কী? বললেন, দু'টি বৃহৎ পর্বত সমতুল্য। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১২৩৮, আ.প্র)

আবার মৃত ব্যক্তির পরিবারের সকলের মন খারাপ হওয়ায় তাদের সকলকে প্রতিবেশির পক্ষ থেকে খাদ্য দান করা প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّه قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ.

'আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জাফরের পরিবার-পরিজনদের জন্য খাবার জিনিস তৈরি কর। কেননা তাদের উপর এমন মুসিবত নাযিল হয়েছে, যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-৩১১৮, ই.ফা)

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বুকে কেউ অমর নয়। প্রাণী মাত্রই মরণশীল। সুতরাং সকলকে এ ধ্রুব সত্যটি মাথায় রেখেই দুনিয়ার অঙ্গনে জীবন ধারণ করা উত্তম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

"আর আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে অমরত্ব দান করিনি সুতরাং আপনি যদি মারা যান, তবে কি তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে? প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আমি তোমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি মন্দ ও ভাল দিয়ে এবং আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।" (সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩৪-৩৫)

মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّه يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّه عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

"হে মানবজাতি! তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠার ব্যাপারে, তবে লক্ষ্য কর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, এরপর 'আলাক' থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড থেকে; তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য সৃষ্টি রহস্য, আর আমি স্থির রাখি মায়ের গর্ভে, যা আমি ইচ্ছা করি, এক নির্দিষ্টকালের জন্য। তারপর আমি বের করে আনি তোমাদের শিশুরূপে, যাতে তোমরা পরে উপনীত হও পরিণত বয়সে। তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌঁছানো হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত, সে সম্বন্ধে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর তুমি দেখবে জমিনকে শুষ্ক, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত হয় শস্য-শ্যামলা হয়ে এবং স্ফীত হয় ও উৎপন্ন করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এসব এজন্য যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং তিনিই জীবন দান করেন মৃতকে। আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ

অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন তাদের, যারা আছে কবরে।" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ০৫-০৭)

কাজেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে সকল মানুষকে এ কথা মনে রাখতে হবে, মৃত্যুর পরের জীবনে কোন কর্ম করার সুযোগ নেই রয়েছে কর্মফল ভোগ করার সুযোগ। দুনিয়ার জীবনে যে যা করেছে; যে যা রেখে গিয়েছে আখিরাতের জীবনে সে তার ফলই ভোগ করবে। এবার সে ফল হতে পারে সুখকর বা কষ্টকর। তবে তারা যেন সুখে থাকে সেজন্যই তাদের দেয়া শিক্ষা, দেখানো পথ, রেখে যাওয়া সম্পদ এসব কিছুর সুবাদে আজ ও আগামীর কাছে তাদের রয়েছে অনেক হক।

কবর দেখামাত্র সালাম পেশ

কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলাফেরা, কবরস্থানে প্রবেশ করা বা কবর দেখামাত্র কবরবাসীর কথা মনে করে তাদের প্রতি সালাম পেশ তথা দু'আ করা তাদের হক। প্রকৃতপক্ষে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারাতো আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনে যা করেছিল তার সুফল বা কুফল ভোগ করছে। এভাবে একদিন আমাদেরকেও সেখানে যেতে হবে। ফলে আজ আমরা যদি কবরবাসীর প্রতি সুন্দর আচরণ করি তাহলে আমাদের পরবর্তী বা আগত বংশধররাও আমাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করবে। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالاَثَرِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরস্থানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরবাসীদের দিকে মুখ করে বললেন : 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার'। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল জানায়েয, হা. নং-৯৯১, বিআইসি)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে গমন করেন। তখন তিনি বলেন : তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মুমিনদের গৃহে বসবাসকারীরা। আর অবশ্যই আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩২২৩, ই.ফা)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে কেউই আমার উপর যখন সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট আমার রুহকে ফেরত দেন এবং আমি তার জবাব প্রদান করে থাকি। (আবু দাউদ, হজ্জ-এর নিয়ম-পদ্ধতি, হা. নং-২০৩৭, ই.ফা)

লাশ দাফন শেষে ক্ষমা প্রার্থনা

কবরে লাশ দাফন করে ফিরে আসার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলে কবরবাসীর জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা এবং সকলের ভাল কাজগুলোর সাওয়াব আল্লাহ যেন বৃদ্ধি করে তাদের কবরের আযাব থেকে হিফাযত করেন সেজন্য চোখের পানি ফেলে দু'আ করা উত্তম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَه بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ اللاٰنَ يُسْئَلُ .

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর এবং সে যেন সুদৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য দু'আ কর। কেননা এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১] (আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা, হা. নং-৩২০৭, ই.ফা)

কবর পাকা ও গম্বুজ নির্মাণ না করা

আপনজনদের কবর চিহ্নিতকরণে কবর পাকা করা, কবরের উপর নাম, ঠিকানা, মৃত্যুর তারিখ লিখে রাখা, কিছু নির্মাণ বা সৌধ নির্মাণ করতে প্রিয়নাবী

---

১. মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করে জীবিত ব্যক্তির ফিরে আসার সাথে সাথেই 'মুনকির ও নাকীর' নামক দু'জন ফিরিশতা কবরে উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে তার 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আখিরাতের মঞ্জিলের এটি প্রথম ধাপ এবং খুবই মারাত্মক স্থান। কাজেই মৃত ব্যক্তি যাতে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ফিরিশতাদের প্রশ্নের জওয়াব ঠিকমত দিতে পারে, সে জন্য দু'আ করা উচিত।

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ.

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয [জানাযা], হা. নং-১৫৬২, আ.প্র)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ.

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয [জানাযা], হা. নং-১৫৬৩, আ.প্র)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبْنٰى عَلَى الْقَبْرِ.

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয [জানাযা], হা. নং-১৫৬৪, আ.প্র.)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ.

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, জানাযার বিবরণ, হা. নং-২১৭, বিআইসি)

عَنْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَاتُصَلُّوْا إِلَيْهَا.

আবু মারসাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কখনো কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামাযও পড়বে না।* (সহীহ মুসলিম, জানাযার বিবরণ, হা. নং-২১২২, বিআইসি)

---

* কবরের উপর সিজদা করা ও কবরকে সিজদা করা প্রকাশ্য শিরক। এ শিরক থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর বসতে বা একে সামনে রেখে নামায পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

এরপরও যারা কবরের উপর নির্মাণ করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভিশাপ দেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمًا اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দিয়েছেন, যারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (সুনানু নাসাঈ, জানাযা পর্ব, হা. নং-২০৫০, ই.ফা)

তবে কবরকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি পাথর বা গাছ লাগানো যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ.

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর কবর একটি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখেন। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানাযেয় [জানাযা], হা.নং-১৫৬১, আ.প্র)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কবর দু'টিতে আযাব হচ্ছে। তিনি বললেন, কবরের দু'জন অধিবাসীকেই আযাব দেয়া হচ্ছে। অবশ্য কোন বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। একজনকে এজন্য আযাব দেয়া হচ্ছে যে, সে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করত না এবং অপরজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি একটি তাজা ডাল ভাঙলেন এবং সেটা দু'টুকরা করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একখানা করে পুঁতে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কি উদ্দেশ্যে আপনি এরূপ করলেন? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ এ দু'টি শুকিয়ে না যাবে ততক্ষণ তাদের আযাব লঘু করা হবে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১২৭১, আ.প্র)

কবর যিয়ারত

যারা বেঁচে আছে তাদের কর্তব্য দাদা-দাদী, নানা-নানী ও পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন নিকটতম প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করলে তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করা। এতে যাদের জন্য দু'আ করা হচ্ছে তারা যেমনি সাওয়াব পাবে তেমনি যিনি দু'আ করছেন তিনিও খারাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়। (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১৫৬৯, আ.প্র)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন।* (সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১৫৭৫, আ.প্র)

মুসলিমদের পারস্পরিক হক

এ পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে যত ধর্ম এসেছে এগুলোর মধ্যে ইসলাম; ধর্মই সকল জাতি সত্তার হক বা অধিকার এবং তাদের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রতি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা সংরক্ষণ করে।

---

* মোল্লা আলী আল-কারী (রহ) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে সম্ভবত ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, নিত্য বহির্গমনের অভ্যাসে পরিণত না হলে নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে বাধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাওয়ার সময় একজন নারীকে কবরের নিকট কাঁদতে দেখে বলেন : আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। ইবনে হাজার (রহ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে কবরের নিকট বসতে নিষেধ করেননি। এতে তার অনুমোদন প্রকাশিত হয়। হাকেম নীশাপুরী তার আল-মুসতাদরাক-এ উল্লেখ করেছেন যে, আয়িশা (রা) তার ভাই আব্দুর রহমানের কবর যিয়ারত করতে গেলে তাকে বলা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা নিষিদ্ধ করেননি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি নিষেধ করেছিলেন, পরে তার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৭, নং-২১২৪) বলা হয়েছে : আয়িশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কবর যিয়ারত করতে গেলে কি বলবো? তিনি বলেন : তুমি বলবে, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ার মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন..." (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬০-১)। নারীদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হলে তিনি তাকে উক্ত দু'আ না শিখিয়ে বরং কবর যিয়ারতে যেতে বারণ করতেন। অতএব নারীগণ শালীনতা বজায় রেখে কবর যিয়ারত করতে যেতে পারেন। কারণ তাদেরও মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তবে সশব্দে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা নিষেধ (অনুবাদক)।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। সুতরাং মানবতার কল্যাণ এ ধর্মের মূলমন্ত্র। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলিমদের রয়েছে সব মানুষের প্রতি দায়িত্ব– যা পালন করা ইসলামের আদেশ হিসেবেই পরিগণিত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক জাতি সত্তার পরিচয়ে "হে মানবমণ্ডলী" হিসেবে সম্বোধন করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দিয়েছেন এক ও অভিন্ন সংবিধান আল কুরআনুল কারীম। প্রেরণ করেছেন সমস্ত উম্মাহর পথের দিশা দেয়ার জন্যে সর্বশেষ আদর্শবাদী নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন দায়িত্ব পালনে হকের ব্যাপারে সচেতন হতে একে অপরকে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

"প্রত্যেক মু'মিন ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه اِخْوَانًا.

"তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১০৩)

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

"তোমরা মুমিনদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল, কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৫৪)

এ নির্দেশনাগুলো দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বের সমগ্র মুসলিমদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকল প্রকার অন্যায়, অসত্য ও আল্লাহ বিরোধী কাজ-কর্মকে দূরে ঠেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথ ও মত বা বাণী অনুসারে একে অপরের প্রতি হক আদায়করণে সোচ্চার হওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। সেই সাথে এক মুসলিমের কাছে অন্য মুসলিমের হক কী-কী তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةَ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارَ الْقَسَمِ.

বারা ইবন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি (আদেশকৃত সাতটি বিষয়ের) উল্লেখ করলেন :

০১. অসুস্থ বা পীড়িতকে দেখতে যাওয়া।
০২. জানাযায় অনুগমন করা।
০৩. হাঁচিদাতার (আলহামদু লিল্লাহর) জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।
০৪. সালামের জবাব দেয়া।
০৫. মজলুমকে সাহায্য করা।
০৬. দাওয়াত কবুল করা এবং
০৭. (কসমকারীর) কসম পুরা করা। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস হা. নং-২২৬৬, আ. প্র)

অপ্রিয় হলেও সত্য আজকে আমরা মুসলিমরা আল্লাহর দেয়া বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা অপর ভাইয়ের হক বা অধিকার হরণ করে সদর্পে চলেছি, নিজেদেরকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে একজন মুসলিম হিসেবে আমারও কিছু করণীয় আছে বা আমার কাছেও অন্য মুসলিম নর-নারীর হক রয়েছে তা আমরা ভুলতেই বসেছি। যার জন্যেই আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এত অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছে। সুতরাং আমাদের উচিত একে অপরের হক পালনে তৎপর হওয়া আর তাহলেই আমরা পাব দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি।

মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা

কারো দোষ-ত্রুটি দেখে অন্যের নিকট বলে বেড়ানো ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা হওয়ার পাশাপাশি অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি বিঘ্নিত হয়। পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসা গঠন হওয়ার বিপরীতে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়ে। মানুষ হয়ে পড়ে প্রতিশোধের নেশায় পাগল। আর তাই প্রিয়নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না কিংবা (যুলুমের জন্য) তাকে যালিমের হাতে সোপর্দও করবে না (অথবা তাকে বিপদে ত্যাগ করবে না)। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কোন মুসলিমের কোন বিপদ

দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোন বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস, হা. নং-২২৬৩, আ.প্র)

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব বিপদাপদের একটি বিপদও দূর করে দেয়, আল্লাহ তার আখিরাতের বিপদাপদের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অপর ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর করে দেয়, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের অসুবিধাগুলো সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় লিপ্ত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকেন। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৮০, বিআইসি)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ رَأى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْىٰ مَوْءُوْدَةً.

যে ব্যক্তি কারো দোষ-ক্রটি দেখার পর তা গোপন রাখে, সে যেন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জীবন দান করে (অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান করা যেমন সাওয়াবের কাজ; কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখা ঐরূপ সাওয়াবের কাজ।) (আবু দাউদ, আদব, হা. নং-৪৮১১, ই.ফা)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুসলিমদেরকে সচেতন ও পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَنِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَتَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلاَتَنَابَزُوْا بِالاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولئِكَ هُمُ الظّلِمُوْنَ.

"হে ঈমানদার লোকেরা! না কোন পুরুষ অপর পুরুষের প্রতি বিদ্রূপ করবে, হতে পারে সে তাদের তুলনায় ভাল। আর না কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রীলোকের

প্রতি বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে সে তাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা পরস্পরের মাঝে দোষারোপ করো না এবং কাউকে খারাপ উপমা দিয়ে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ করা অত্যন্ত খারাপ কথা, যেসব লোক এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকবে না তারাই যালিম।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

তোমাদের কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক, হা. নং-২৪৫৫, বিআইসি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শাশ্বত, চিরন্তন। এতে সন্দেহ প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। কাজেই আমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করবো তাই পছন্দ করতে হবে অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য। হ্যাঁ রান্না ঘরে পাতিলে পাতিলে ধাক্কা লাগতে পারে, বাঁশ ঝাড়ে এক বাঁশের সাথে অন্য বাঁশ ধাক্কা বা ঘষা লাগতে পারে এটা স্বাভাবিক। তেমনি জীবনে চলার বাঁকে-বাঁকে শয়তানের প্রভাবের ফলে ছোট-ছোট দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে কখনো কারোর সাথে কথা কাটাকাটি বা মনোমালিন্য হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তাকে অপমান-অপদস্থ করা, অসম্মান দেখানো বা করানোর চেষ্টা করা ইসলাম গর্হিত আচরণ বা কাজ বলে গণ্য করে। কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখা বা জানার পর তা লোকচক্ষুর অন্তরালে একাকী সুন্দর-সাবলীল ভাষায় সহজ করে ঐ ভাইকে সংশোধনের দৃষ্টিতে বলা উত্তম। সম্ভব হলে আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী উল্লেখ করে সুন্দরভাবে তাকে সতর্ক করা যেতে পারে। এতে ঐ ভাই দোষ-ত্রুটি মুক্ত হলে তাকে সংশোধনকারীও সমান সাওয়াব পাবেন।

অন্যদিকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র যেমন : কোন ভাই বা দলের দোষ-ত্রুটির ফলে ইসলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ, কুরআনের কোন আয়াতের সাথে সংঘর্ষ এবং মুসলিম জাতি সত্তার উপর আঘাত আসতে পারে এমন কোন মারাত্মক দোষ-ত্রুটি কোথাও হতে দেখলে তা প্রকাশ করা যাবে। মানুষের জান-মাল ধ্বংসকারী কোন সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কাজের সাথে কেউ সম্পৃক্ত আছে দেখলে তা প্রকাশ করে প্রতিহত করার চেষ্টা করা ইসলামসম্মত। কেননা

ইসলাম জঙ্গী বা সন্ত্রাসী কোন কর্মকাণ্ড কখনোই সমর্থন করে না। তাই মুসলিম মাত্রই এমন কোন কিছুকে প্রতিহত করা, বাধা দেয়া তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, দেখা-সাক্ষাৎ বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ না করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

"হে ঈমানদারগণ! খুব বেশি ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারণা গুনাহ।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১২)

এ প্রসঙ্গে মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী চিরন্তন :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ.

আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ করো না (একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না)। আল্লাহর বান্দাগণ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলিমের জন্যে তাঁর ভাইকে তিন রাতের বেশি (বিরাগবশত) পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৬৩৮, আ.প্র)

মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করার তাকিদ দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ.

তোমরা পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ করো না, একে অপরকে এড়িয়ে চলো না বা ত্যাগ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। বরং আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলিমের পক্ষেই তার ভাইকে তিন দিনের অধিক ত্যাগ করে থাকা হালাল নয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৮৫, বিআইসি)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ

يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذَا وَيُعْرِضُ هذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন লোকের জন্য তার ভাইকে (মুসলিম) তিন রাতের বেশি এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাৎ হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তা) সূচনা করে। (সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, হা. নং-৫৬৩৯, আ.প্র)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تُفَتَّحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ فِيْهِمَ لِمَنْ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا اِلاَّ الْمُهْتَجِرِيْنَ يُقَالُ رُدُّوْا هذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যেসব অপরাধী আল্লাহর সাথে শরীক করেনি তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পর্কে (আল্লাহ বলেন) : এদেরকে ফিরিয়ে দাও যতক্ষণ না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৯৭২, বিআইসি)

মুসলিমের কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ না করা

বিশ্বের এ প্রান্তে আর ও প্রান্তে যেখানেই মুসলিম আছে সেখানেই ধ্বনিত হয় একই তাওহীদের বাণী। সবারই মূল ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম, আর পথপ্রদর্শক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও চেতনাবোধ থেকে মুসলিম মাত্রই একে অপরের আপন; একে অপরের ভাই; ফলে একে অপরের কাছে হকদার।

কাজেই মুসলিম মাত্রই অন্য মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ তো করতে পারার প্রশ্নই আসে না বরং পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করবে এটাই স্বাভাবিক এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশও বটে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَخُوْنُهُ وَلاَيَكْذِبُهُ وَلاَيَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوى ههُنَا بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْتَقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ.

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবনের) উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলিমের উপর হারাম। তাকওয়া এখানে (অন্তরে)। কোন ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৭৭, বিআইসি)

মুসলিমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মুসলিমের কাছে মুসলিমের দাবি হলো তারা একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। কখনই একজন ভাই আরেকজন ভাইকে তার সম্মানহানীর চেষ্টা করবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الاِيْمَانُ اِلى قَلْبِهِ لاَتُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَتُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا اِلَى الْبَيْتِ اَوْ اِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا اَعْظَمَكِ وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ.

হে ঐ জামা'আত, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান সুদৃঢ় হয়নি! তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হবে আল্লাহ তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, যদিও সে তার উটের হাওদার ভিতরেও অবস্থান গ্রহণ করে। রাবী (নাফি) বলেন একদিন ইবন 'উমার (রা) বাইতুল্লাহ বা কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তুমি কতই না ব্যাপক ও বিরাট! কিন্তু আল্লাহর কাছে মুমিন ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা তোমার চেয়েও অধিক। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৯৮১, বিআইসি)

মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা

দেশে ও বিদেশে মুসলিম যে-যেখানে সকলেই তাওহীদবাদের পরিচয়ে পরিচিত একই জাতি। ফলে বিশ্বের এক প্রান্তে মুসলিমের কিছু হলে অন্য প্রান্তের মুসলিম মাত্রই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠা স্বাভাবিক। এটাই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। আরেকটু এগিয়ে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের নমুনা। তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলিমের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ার প্রতি তাকিদ দিয়ে বলেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُه وَلاَيُسْلِمُه مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِه وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাইস্বরূপ। কাজেই কেউ যেন কারো উপর যুলুম না করে এবং কাউকে যেন বিপদের মধ্যে না ফেলে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব-অভিযোগ পূরণ করে, আল্লাহ তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গোপন রাখবেন। (আবু দাউদ, আদব, হা. নং-৪৮১৩, ই.ফা)

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি সুদৃঢ় অট্টালিকাস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৭৮, বিআইসি)

اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرَاةُ اَخِيْهِ فَاَنْ رَاى بِهِ اَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ.

তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ মুসলিম ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দাগ (ত্রুটি) লক্ষ্য করে, তবে তা যেন দূর করে দেয়। (জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল বিরর ওয়াস সিলাহ, হা. নং-১৮৭৯, বিআইসি)

অমুসলিমদের হক

যারা ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হয়নি; যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনসহ সর্বশেষ নাবী ও রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে নারাজ; যারা আল কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীসকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়নি তারাই অমুসলিম। তাদের সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বক্তব্য স্পষ্ট। আল্লাহ্ বলেন :

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

“যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার মত, যে একটি ঘর বানিয়েছে আর নিঃসন্দেহে সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম; যদি তারা জানত।” (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪১)

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيْهِ شُرَاكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ.

“আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন : একজন দাস, যার রয়েছে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কয়েকজন মালিক। আর একজন দাস, যার আছে কেবল একজন মালিক, এদের দু’জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ২৯)

সুতরাং অমুসলিম বলতে সকল অবিশ্বাসীদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এরা চার ভাগে বিভক্ত :

০১. হরবী।

০২. আশ্রয় প্রার্থী।

০৩. চুক্তিবদ্ধ ও

০৪. যিম্মী।

এখানে হরবী বলতে যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মুসলিমদের কাছে তাদের কোন হক নেই। আর আশ্রয় প্রার্থী, চুক্তিবদ্ধ ও যিম্মি অমুসলিমগণ যেহেতু মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে একই সমাজে বসবাসসহ কর্মস্থলে কর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি হক রয়েছে।

সমমৌলিক হক ভোগ করা

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যেখানে মুসলিম শাসক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সেখানেও নাগরিক শর্ত পূরণ হওয়ার ফলে সকল জনগোষ্ঠী একই ধরনের আচরণ পাওয়ার হকদার। কোনভাবেই রাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্রের নাগরিকদের

হক আদায়ে কোন রকম শ্রেণীভেদ তৈরি করতে পারবে না। মুসলিম জনগোষ্ঠী যা-যা ভোগ করতে পারে সে রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমরাও তা-তা ভোগ করতে পারবে।

ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ ও হিফাযত

বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম ইসলাম যথাযথভাবে সকল মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ ও হিফাযতের ঘোষণা দিয়েছে। আইন সঙ্গত বৈধ কারণসমূহ ব্যতীত তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মানবতার কল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এই নীতিমালা বর্ণনা করেছেন।

শুধু তাই নয়, ইসলাম মনে করে, কোন মুসলিমকে জিহ্বা বা হাত-পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমদের বেলায়ও অবৈধ। দুররুল মুখতারে উল্লেখ করা হয়েছে: তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তাদের গীবত করা মুসলিমের গীবত করার মতোই হারাম। (দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩-২৭৪)

সুবিচার প্রাপ্তি

মুসলিম অমুসলিম সকলেরই সুবিচার পাওয়ার হক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘোষণা পরিষ্কার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَلاَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَلاَّ تَعْدِلُوْا. اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى.

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর।" (সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ০৮)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাসনামলে একজন মুসলিম আরেকজন অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন :

যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই। (ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬)

'উমার (রা)-এর 'আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে। (বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান)

'আলী (রা)-এর 'আমলে জনৈক মুসলিম জনৈক অমুসলিম হত্যার দায়ে গ্রেফতার

হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বলল, "আমি মাফ করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, "ওরা বোধহয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।" সে বলল, "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না।" তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন : "আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই।" (বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮২)

এ কারণেই ফকীহগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোন অমুসলিম নাগরিক কোন মুসলিমের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোন মুসলিমের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়। (দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৩)

ফৌজদারী আইন

ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলিমকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলিম চুরি করে, কিংবা মুসলিমের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে দেয়া হবে। কারো উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলিম হোক আর অমুসলিমই হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তি মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনেও মুসলিম ও অমুসলিম সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো" মুসলিমের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয়, অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ। সাম্যের অনিবার্য দাবি অনুসারে দেওয়ানী আইনের আলোকে মুসলিমের উপর যেসব দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের উপরও তাই অর্পিত হবে।

ব্যবসায়ের যেসব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধু শূকরের ব্যবসা, খাওয়া এবং মদ বানানো, মদ পান ও ব্যবসা করতে পারবে। (আল মাবসূত, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮)

কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের মদ বা শূকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দুররুল মুখতারে আছে :

মুসলিম যদি মদ ও শূকরের ক্ষতি করে তবে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে। (দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩)

সংখ্যালঘু বলে কোণঠাসা করা

মুসলিমদের কাছে সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কোন কথা নেই। তারা সকলকেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করে। অধিকন্তু মুসলিমরা আল কুরআনুল কারীম যে শুধু তাদের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা মনে করে না। প্রিয়নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুসলিমদের নাবী, মুসলিমদের পথ প্রদর্শক হিসেবে এসেছেন, অমুসলিমরা আল-কুরআন ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ মেনে নিতে চাইলে পারবে না– এমনটি মুসলিমরা কখনোই মনে করে না। বরং এ কথা জোর দিয়েই বলা যাবে, শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর বুকে একমাত্র মুসলিমরাই অমুসলিমদের হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। মহান স্রষ্টা নিজেই এই হকের ব্যাপারে ঘোষণা করেন :

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَّهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لاَّ يَهِدِّىْ اِلاَّ اَنْ يُّهْدٰى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ. اَلاَ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنَ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ.

"বলুন : তোমরা যাদের শরীক স্থির কর, তাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে হকের দিশা দিতে পারে? বলুন : আল্লাহই সত্যের পথ প্রদর্শন করেন। যিনি সত্যের পথ প্রদর্শন করে, তিনিই আনুগত্যের অধিক হকদার না সে যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না? তোমাদের কী হয়েছে? কিরূপ ফায়সালা তোমরা করে থাক? জেনে রাখ! যারা আছে আসমানে এবং যারা জমিনে তারা তো আল্লাহরই। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের তাঁর শরীকরূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো অনুসরণ করে কেবল অনুমানের আর তারা তো লিপ্ত রয়েছে ভিত্তিহীন আলোচনায়।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৫ ও ৬৬)

মুসলিমদের কাছে কুরআনের এ বাণী থাকার পর তারা অমুসলিমদেরকে কোণঠাসা করা, তাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা জোর-জবরদস্তি করে দখল করার

প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ মুসলিমরা আল কুরআনুল কারীম ও আল হাদীসের ভিত্তিতে সকল কিছুর ফায়সালা করে। আর যদি ঘটে তাহলে বুঝতে হবে তারা মুসলিম হলেও তাদের আল কুরআনুল কারীমের জ্ঞানের অভাবে রয়েছে; নতুবা তারা দুনিয়ার লোভ-লালসায় অমানুষে পরিণত হয়েছে, নতুবা অন্য কোন আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তারা ইসলামের বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে।

অন্যদিকে ধ্রুব সত্য হলো, একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে বিশ্বের বুকে অনেক অমুসলিম দেশেই মুসলিমরা কোণঠাসা, হক বা অধিকার হারা এক রকম বাকরুদ্ধ হয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করছে– যা দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।

নিরাপদ ও সুন্দর জীবন যাপন করা

অমুসলিমরা নিরাপদ ও সুন্দর জীবন যাপন করবে, স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল কিছু করবে এটা তাদের হক। মূলতঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাদেরকে যে সীমানায় তথা যে দেশে পাঠিয়েছেন সে দেশে তাদের হক প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে। এবার মুসলিম অধ্যুষিত দেশে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তাদের প্রয়োজনমত সাহায্য-সহযোগিতা করা। এটা এজন্য যে, তারা যেন নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَه. فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ.

"যখন মুশরিকদের কেউ তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদের সাহায্য কর– যাতে তারা আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থান কোনটি তা জানিয়ে দাও!" (সূরা আত-তাওবা, ০৯ : ০৬-০৭)

অর্থাৎ তারা যতদিন চুক্তির উপর বহাল থাকবে, মুসলিমদের কোন অনিষ্ট করবে না, মুসলিমদের কাউকে হয়রানি করবে না এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবে না, ততদিন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সদাচরণ করা মুসলিমদের কর্তব্য।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও যে কোন পেশায় অংশগ্রহণ

শিক্ষা, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশায় অংশগ্রহণের সুযোগ অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলিমরা যে সুযোগ-সুবিধা

ভোগ করে থাকে, তা অমুসলিমরাও ভোগ করবে এবং মুসলিমদের উপর আরোপ করা হয় না এমন কোন বিধি নিষেধ অমুসলিমদের উপরও আরোপ করা যাবে না। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান হক থাকবে।

কথা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা

স্বাধীন রাষ্ট্রে মুসলিম অমুসলিম ভেদে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন কথা বলা ও যে কোন বিষয় সম্পর্কে লেখার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার হকদার। সেই সাথে আইনসঙ্গতভাবে তারা সরকার, সরকারি আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে। অমুসলিমরা তাদের মতের প্রচার-প্রসার করতে পারবে। আর অমুসলিমদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোন কাজ তারা তাদের বিবেকের দাবি অনুসারে করতে পারবে।

সেবা করা

ইসলাম ধর্ম মতে, রোগী মুসলিম কী অমুসলিম তা বিচার্য নয়, সে প্রতিবেশী, পাড়া বা মহল্লার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এমন ক্ষেত্রেও তাকে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেয়া, সম্ভব হলে সেবা করা, তার পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা এবং সবশেষে তার আশু রোগ মুক্তি কামনা করা মুসলিমদের কাছে তাদের হক হিসেবে গণ্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اَعْرَابِيٍّ يَّعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَّعُوْدُه فَقَالَ لَهُ لاَ بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ قُلْتُ طَهُوْرُ كَلاَّ بَلْ هِيَ (هُوَ) حُمَّى نَفُوْرُ اَوْ تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْدَهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ اِذًا.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, কোন ক্ষতি নেই, ইনশাআল্লাহ তুমি সব গুনাহ থেকে পাক হয়ে যাবে। বেদুঈন বললো, আপনি বলছেন, এটা গুনাহ থেকে পাক করে দিবে। কখনও নয় বরং এ জ্বর এক

থুড়থুড়ে বৃদ্ধের ওপর চড়াও হয়েছে। তাকে কবর যিয়ারত করিয়ে ছাড়বে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তাই হবে। (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুল মারযা, হা. নং-৫২৪৫, আ.প্র)

দান-খয়রাত করা

অমুসলিম দরিদ্র হলে তাদের দান-খয়রাত করা ইসলাম সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষ এ দাবিই ইসলামে বড়। হাদীসে উল্লেখ আছে :

عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ رَاغِبَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُّشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُّشْرِكَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِىْ اُمَّكِ.

আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন– (কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর। (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হা. নং-১৬৬৮, ই.ফা)

স্ব-স্ব ধর্ম পালনের হক

পৃথিবীতে কার কোথায় জন্ম হবে কেউ জানে না। আবার কেউ জন্মগতভাবে অমুসলিম হয়ে পৃথিবীতে আসে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهَوِّدَانِه اَوْيُنَصِّرَانِه اَوْ يُمَجِّسَانِه كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ هَلْ تَرى فِيْهَا جَدْاعَاءَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেকটি নবজাতক শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী করে গড়ে তুলে অথবা নাসারা করে গড়ে তুলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তুলে। ঠিক যেমন চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি? (সহীহ্ আল-বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হা. নং-১২৯৪, আ.প্র)

কাজেই যার জন্ম যেখানে, যে সীমানার ভূমিতে সেখানে তার হক প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে। ফলে সেখানে তাদের বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম ও কর্ম পালনে বাধা দেয়ার এখতিয়ার কারোর নেই। যদি কেউ দেয় তাহলে সে হক বা অধিকার হরণকারী হিসেবে ধিকৃত হবে।

তাছাড়া অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্য ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে বা নিজস্ব এলাকায় এটা অবাধে করতে পারবে। তবে ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে, আবার কোন ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে। বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে : "যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শূকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শঙ্খ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না। সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশি হোক না কেন। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এসব কাজ পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুমুয়া, ঈদ ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।... তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে, যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলিমদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।" (বাদায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৩)

বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সংরক্ষণে দেশবাসীর হক

বৃক্ষ বা গাছের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের জীবন; মানুষের প্রাণ। তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা যে আমাদের দায়িত্ব আমাদেরই কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বীজ থেকে চারা, দিনে দিনে ফুলে-ফলে ভরা প্রাকৃতিক এ সমারোহের সবকিছু সৃষ্টি করছেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরই সেবায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে ভূ-পৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে? নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত।" (সূরা আল হাজ্জ, ২২ : ৬৩)

এবার প্রশ্ন আসতে পারে বৃক্ষ কী কী দেয় আমাদের? মানুষ ও প্রাণীর জন্ম থেকে

মৃত্যু পর্যন্ত বৃক্ষের ব্যাপক আবশ্যকতা। বৃক্ষ মানুষের প্রতিনিয়ত কত যে উপকার করছে তা খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারলে বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সংরক্ষণে এগিয়ে আসবে সকল স্তরের জনগণ, সরকার ও প্রশাসন।

❖ বৃক্ষ মানুষকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে অক্সিজেন দেয়। আর প্রতি নিঃশ্বাসে মানুষের ত্যাগ করা বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে।

❖ বৃক্ষ প্রাণী জগতকে খাদ্য দেয়, মানুষ ও পশু-পাখি বৃক্ষের ফুল-ফল এবং পাতা-পত্র খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাই বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানো প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَيَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

যে কোন মুসলিম (ফলবান) গাছ লাগায় আর তা থেকে যা কিছু খাওয়া হবে তা তার জন্য সাদাকা, তা থেকে যা কিছু চুরি হবে তাও তার জন্য সাদাকা। চতুষ্পদ হিংস্র জানোয়ার যা খাবে তাও তার জন্য সাদাকা, পাখী যা খাবে তাও তার জন্য সাদাকা এবং যে কেউ তা থেকে কিছু নেবে সেটাও তার জন্য সাদাকা (অর্থাৎ সে দান-খয়রাতের সাওয়াব পাবে)। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাফাহ ওয়াল মুযারাআহ, [ভাগচাষ] হা. নং-৩৮২৩, বিআইসি)

❖ বৃক্ষ তাপ উৎপাদনরোধ এবং অন্যান্য জ্বালানি কাঠের যোগান দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.

"তিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপন্ন করেন, তারপর তোমরা তা থেকে আরো আগুন জ্বালাও।" (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮০)

❖ বৃক্ষ আসবাবপত্র এবং গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তথা খাট, টেবিল, সোফা, আলমিরা ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

❖ বৃক্ষ নৌকা, জাহাজ, বিভিন্ন যানবাহন ও রাস্তা, বাঁধ ও সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❖ বৃক্ষ থেকে কাগজের মণ্ড রেয়ন শিল্পের কাঁচামাল ও দিয়াশলাই তৈরি করা হয়। সেই সাথে ধুলা, রাক্ষা, গদ, কুইনাইন, কর্পুর, তারপিন তৈল ও রাবার ইত্যাদি তৈরি হয়।

❖ বৃক্ষ ও বৃহৎ পরিসরে বনভূমি দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। মোটকথা বাতাসে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে আবহাওয়াকে শীতল করে ও প্রচুর বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে।

❖ বৃক্ষ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে জমিতে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে।

❖ মাটির ভাঙ্গন ও পানি স্ফীতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে। এতে মাটির স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

❖ বৃক্ষ ও বনভূমি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন : বন্যা, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, সিডর, সুনামির হাত থেকে মানুষ ও মানুষের বাসগৃহকে রক্ষা করে।

❖ মানুষের রোগ-ব্যাধির কার্যকর ঔষধ হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং বলা যায়, যে বৃক্ষ মানুষের জীবনে এত পজিটিভ ভূমিকা পালন করে সে বৃক্ষকে ধ্বংস না করে আমাদের সকলের উচিত আজ ও আগামীর জন্য বেশি বেশি করে বৃক্ষ রোপণ, সযত্নে সংরক্ষণ করা। আর অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধন রোধ করে সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেশের সকল সড়ক পথ ও হাট-বাজারের চতুর্দিকে, পতিত জমিসহ বাড়িতে সারি সারি বৃক্ষ রোপণ করে চির সবুজ শস্য-শ্যামল এ বাংলার রূপ-বৈচিত্রকে সকল মানুষের অনুকূল করে তুলতে সকলেই এগিয়ে আসা অপরিহার্য। এটাই আজকের জনগোষ্ঠীর কাছে আগামীদের হক বলে পরিগণিত।

অন্যদিকে দেশের এ বনভূমি গড়া ও সংরক্ষণে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্থে পরিচালিত বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এ বিভাগে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের সকলের দেশবাসীর হক সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। বন রক্ষক যদি বন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে জাতি যেমন হক হরণের দায়ে তাদের অভিযুক্ত করবে তেমনি আল্লাহর আদালতেও তারা দায়গ্রস্ত হবে। সুতরাং বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটুকু তারা পালন করছে তা দেখার জন্য কর্তৃপক্ষকেও রক্ষণশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষ সংরক্ষণে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে :

عَنْ عَدِىِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ بَرِيْدًا بَرِيْدًا لاَيُخْبَطُ شَجَرَةٌ وَّلاَيُعْضَدُ اِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.

আদী ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সমস্ত গাছ, বৃক্ষরাজির হিফাযতের বন্দোবস্ত করেন। তার কোন পাতা পাড়া হতো না এবং কোন বৃক্ষ কর্তন করাও যেত না। অবশ্য ভারবাহী পশুদের খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন তা ব্যতীত। (আবু দাউদ, হাজ্জ-এর নিয়ম-পদ্ধতি, হা. নং-২০৩২, ই.ফা)

ভূমির উপরে ও নিচে প্রাকৃতিক সম্পদে দেশবাসীর হক

বাংলাদেশ এ দেশবাসীর জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অকৃপণ দান, অকৃপণ সৃষ্টি। ফলে এর প্রতি ইঞ্চি মাটি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি, বৈচিত্রের ধারক-বাহক সুন্দরবনসহ অন্যান্য বন-বনানি, বিশ্বের দীর্ঘতম সী-বিচ বঙ্গোপসাগরের তীর আর প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনসহ ফুলে-ফলে সুশোভিত পাহাড়, টিলা, নদী-নালা সবকিছুই সকলের জন্য। সকলেই প্রকৃতির এ দানের সুফল ভোগে সমান হকদার। এছাড়াও শস্য উৎপাদনের উপযোগী উর্বর ভূমি, বনজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, জলজ সম্পদ (বিদ্যুৎ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান পথ) সৌরশক্তি ইত্যাদি মাটির উপরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ হিসেবে খ্যাত। অন্যদিকে মাটির নিচের প্রাকৃতিক সম্পদ যথা কয়লা, খনিজ তৈল, চুনাপাথর, চীনা মাটি, তামা, কঠিন শিলা, সিলিকা, বালি, পারমাণবিক খনিজ পদার্থ, গন্ধক ও আবিষ্কৃত ২২টি গ্যাসক্ষেত্র সবই যেন এ সীমানায় জন্মগ্রহণকারী মানুষের ভাগ্য। ফলে এ সকল সম্পদ ভোগ করার অধিকার যেমন সবার তেমনি তার যথাযথ ব্যবহার এবং তার অপচয় ও ধ্বংসরোধ করে আজ ও আগামীদের জন্য সংরক্ষণ সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে সকলের হক

গ্যাস আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশেষ দান। এ দেশের ৫৫,৫৯৮ বর্গ কিলোমিটার সীমানার মাটির নিচে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয় এ সম্পদ এ দেশে জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের হক। তাই প্রয়োজন এ গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার। আর যেকোন ক্ষেত্রে যেকোনভাবে এর অপচয় হলে তা রোধকরণ। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, বিল দিচ্ছি বা আমি টাকার বিনিময়ে গ্যাস কিনে তা ব্যবহার করছি এতে যদি অপচয় হয় তাহলে অন্যদের কী অথবা যা অন্যদের চোখে অপচয় বলে প্রতীয়মান হয় তা তো আমার চোখে অপচয় নয়। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সকলের জন্য বুঝতে সহজ হবে।

❖ বড় বড় উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের স্বার্থে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ

ব্যবহার করা স্বাভাবিক কিন্তু যদি এ রকম হয় মেশিনে কোন কাঁচামাল নেই কিন্তু মেশিন চলছে আর গ্যাস পুড়ছে তাহলে তো ব্যাপারটা দুঃখজনক।

❖ আজকাল অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও মবিলের বিপরীতে সিএনজি বা গ্যাস দিয়ে গাড়ি চলে বলে মালিক পক্ষের অনেক অর্থ সাশ্রয় হয়। কিন্তু তাই বলে মালিক পক্ষ যদি এখন বিনা প্রয়োজনে বা ছোট-খাট প্রয়োজনে বা যা না হলেও হয় এমন প্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহার করতে থাকেন তাহলে আগামীদিনে তো প্রয়োজনেও গ্যাস পাওয়া যাবে না। এ বিষয়টি সম্মানিত গাড়ির মালিকদের একটু খেয়াল রাখা দরকার। বলতে দ্বিধা নেই ঢাকা শহরে গ্যাস দ্বারা গাড়ি চলতে শুরু করার পর যানজট আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্যাস দিয়ে গাড়ি চলায় গাড়ির ব্যবহারিক খরচ অনেক কম তাই অনেকেই গাড়ি কিনছে।

❖ রান্না ঘরে গ্যাসের চুলায় মুহতারামা গৃহিণীরা সকালে নাস্তা তৈরি করে দুপুরে রান্না করবে বা শিশুদের খাবার ও দুধ গরম করবে এজন্যে চুলা জ্বালিয়ে রাখে। এতে দীর্ঘক্ষণ চুলায় আগুন জ্বলতে থাকে। ফলে গ্যাসের অপচয় সেই সাথে যে কোনভাবে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও থাকে।

তাই, যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার করা সকলের হক। আর প্রয়োজন ব্যতিরেকে এমনিতে এমনিতে কোন কাজে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে তাই হবে অপচয়। এবার এ গ্যাস টাকা দিয়ে কেনা হোক আর যাই হোক। মনে রাখতে হবে টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপক্ষ সকলকে প্রয়োজন মত গ্যাস ব্যবহারের অনুমতি বা লাইসেন্স দিয়েছে কিন্তু গ্যাসের অপব্যবহার বা প্রয়োজন ছাড়া পোড়ানোর অনুমতি দেয়নি। যদি কেউ পোড়ায় তাকে অবশ্যই আল্লাহর দেয়া সম্পদ অপব্যবহারের দায়ে আল্লাহর আদালতে আসামী হিসেবে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

অন্যদিকে বাসা-বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু গ্যাস বিভাগের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করা হয় না এমন একটি অভিযোগও দেশে আছে। এবার সেই অভিযোগের জবাবে বলব, দেশের রাষ্ট্রপক্ষকে বিল কম দিয়ে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা মানে নিজেকেসহ নিজের পরবর্তী বংশধর এবং সমগ্র জাতিকে ফাঁকি দেয়া। কারণ এ সম্পদে এই মুহূর্তে যে নবজাতক শিশুটি এ সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করছে তারও হক রয়েছে। সুতরাং আকাশের দিকে থুথু দিলে নিজের গায়ে পড়ে

একদিন হয়তো নিজের সন্তানই এ অন্যায় কর্মের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই প্রাকৃতিক এ গ্যাসের অপচয় ও অপকর্মরোধে আমাদের সকলেরই যত্নশীল ও সচেতন হওয়া উচিত।

বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলের হক

পানি থেকে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ আজ সভ্যতার প্রধান উপকরণ, স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিত্য সঙ্গী। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের প্রাণ সত্তা। আধুনিক জীবন যাত্রা বিদ্যুতের অনুপস্থিতিতে কল্পনাই করা যায় না। তাই প্রয়োজন এর যথাযথ ব্যবহার। বড় বড় বিপণী বিতান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক ও পরিচালকগণ যদি একটু সচেতন ও যত্নশীল হন তাহলে বিদ্যুতের ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এখানে বিদ্যুতের অপব্যবহার যেমন : প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাইট জ্বালিয়ে দিনের আলোকেও হার মানানোর অপচেষ্টাসহ সাইন বোর্ডে প্রচুর লাইট সংযোজন, গভীর রাত তথা ১২ টার পর সাইনবোর্ড জ্বালিয়ে রাখা, জাতীয় দিবসগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েক দিনব্যাপী আলোকসজ্জা, বিয়ে বা সামাজিক পর্যায়ে উদযাপিত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ আলোকসজ্জাসহ সারা রাত ধরে বাসা-বাড়িতে লাইট, ফ্যান অবাধে ব্যবহার করার ফলে বিদ্যুতের অনেক অপচয় হয়ে থাকে– যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

অন্যদিকে এখানেও রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে বিল ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা যা সমগ্র দেশবাসীর হক হরণ করারই শামিল।

পানি ব্যবহারে সকলের হক

পানির এক নাম জীবন, আরেক নাম মরণ। এ পানিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অকৃত্রিম দান। তাই পান করার উপযোগী পানির অভাব, আবার চতুর্দিকে পানি আর পানি আর্তনাদ– এ দু'অবস্থাই সকলের জন্য অসহনীয়। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে ঘন বসতি হওয়ায় এখানে পান করার উপযোগী পানির অভাব লক্ষ্যণীয়।

শুধু তাই নয়, পানির অভাবে ঘুম থেকে জেগে উঠে দাঁত ব্রাশ ও সালাত আদায়ে অযুর সমস্যা থেকে শুরু করে অন্য সকল কর্মকাণ্ডও বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও শুরু হয় পানি চাই চিৎকার। সুতরাং যে পানি ছাড়া জীবন চলে না,
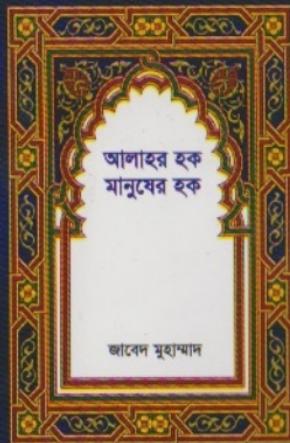
সেই পানির তো ব্যবহার হওয়া চাই যথাযথ; আর সর্বদাই শুকরিয়ায় মাথা নত করা চাই পানির ব্যবস্থাপকের কাছে। অন্যথায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর হবে না। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبِىٓ اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا.

"আর আমি উহা (সে পানি) তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই, যাতে তারা ভেবে দেখে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৫০)

তথ্যসূত্র

০১. আল কুরআনুল কারীম,
২৬তম প্রকাশ : ২০০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০২. সহীহ আল-বুখারী, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড,
আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)
৭ম প্রকাশ, ৩য় সংস্করণ : ২০০২, আধুনিক প্রকাশনী।

০৩. সহীহ মুসলিম, ১ম-৮ম খণ্ড,
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (রা)
১ম প্রকাশ : ২০০৫, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

০৪. জামে আত-তিরমিযী, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড,
ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
২য় প্রকাশ ; ২০০৪, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

০৫. আবূ দাউদ, ১ম-৫ম খণ্ড,
ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ 'আস আস-সিজিস্তানী (রা)
২য় সংস্করণ : ২০০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৬. সুনান ইবন মাজাহ, ১ম-৪র্থ খণ্ড,
ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শোয়াইব আন্-নাসাঈ (র)
১ম প্রকাশ : ২০০০, আধুনিক প্রকাশনী।

০৭. সুনানু নাসাঈ, ১ম-৫ম খণ্ড,
আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনী (র)
প্রকাশকাল : ২০০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০৮. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড,
ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)
প্রকাশকাল : মে ২০০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা